বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা

প্রথম খণ্ড

বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা

প্রথম খণ্ড

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জি. এ. ই. পাবলিশার্স
কলকাতা-৭০০ ০০৬

BANGALIR RASHTRACHINTA : Vol. I

by Sourendramohan Gangopadhyaya

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮

জি. এ. ই. পাবলিশার্স-এর পক্ষে সুনন্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে প্রকাশিত এবং দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স-এর পক্ষে শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক ৩২, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং মুখার্জী বাইন্ডিং ওয়ার্কস্-এর পক্ষে মানস মুখার্জী কর্তৃক ১২, হরচন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৫ থেকে গ্রন্থিত।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রীর
তাগিদে এই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনা বাস্তবায়িত হয়েছে, তাদের উদ্দেশে

নিবেদন

প্রথম সংস্করণ

শিক্ষা বা অন্য কোনো সূত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে বিধিবদ্ধ পাঠগ্রহণের সুযোগ বর্তমান লেখকের ঘটে নি। উক্ত বিষয়ের প্রতি লেখকের অনুরাগ শুধুমাত্রই কৌতূহলী পাঠক হিসেবে। বর্তমান গ্রন্থটিকে সেই দীর্ঘ-লালিত অনুরক্তির সামান্য নিদর্শন বলা যেতে পারে—তদতিরিক্ত কিছু নয়। জনৈক বন্ধুর মতে, কারো কোনো বিষয় পড়ে ভাল লেগে থাকলে, সে বিষয়ে নিজের মতো করে লেখার অধিকার তাঁর নিশ্চয় আছে, নাই-বা হলেন তিনি বিশেষজ্ঞ।

ভারতের একাধিক ভাষার তুলনায় বাংলায় গ্রন্থ-উৎপাদনের পরিমাণ কম; বিষয়-বৈচিত্র্যের দিক থেকে অবস্থাটা আরও নৈরাশ্যজনক। বাংলায় প্রকাশিত বইয়ের অধিকাংশই হল সাহিত্য বিষয়ক। অন্যান্য বিষয়ে প্রকাশিত বাংলা বই প্রধানত পাঠ্যপুস্তক-ঘেঁষা। আর অনেক বিষয়ের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তির উপযোগী বাংলা বইয়ের সংখ্যা নগণ্য। নিজের প্রিয় ও পঠিত এই বিষয়টিকে বাংলা ভাষায় আমারই মতো কৌতূহলী পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার লোভেই এ-বই রচিত—বিশেষজ্ঞ পাঠকের জন্য নয়। তবু এ-বইয়ের যাঁরা সম্ভাব্য পাঠক, রাষ্ট্রতত্ত্বের সঙ্গে অন্তত প্রাথমিক পরিচয় তাঁদের আছে—এটুকু আশা করা বোধহয় অন্যায় হবে না।

আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে-সব বই পড়ানো হয়ে থাকে তা প্রথমত ইংরেজি ভাষায় লিখিত, তদুপরি তাতে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র-চিন্তার আলোচনাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনের সম্যক পরিচয়-দানের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় না। মিল, বেনথাম বা গ্রীনের মতো রাষ্ট্রদার্শনিক এদেশে না জন্মালেও ভারতের বহু মনীষী যে উক্ত বিষয়ে গভীর তত্ত্বগত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা মূলত পশ্চিমী প্রভাবে বিকশিত। তাকে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলা না গেলেও, বিশ্বের বর্তমান রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ভাণ্ডারে ভারতের নিজস্ব কিছু মৌলিক অবদান যে আছে সে-কথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমেই স্বীকার্য, এ-বইয়ে ভারতের তো নয়ই, বাংলাদেশেরও সমগ্র রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যায় নি। কেবল বারো জন বাঙালি মনীষীর প্রসঙ্গ এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। উক্ত মনীষীবৃন্দের প্রত্যেকের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা এক-একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয় হওয়া সম্ভব—কাজেই এক্ষেত্রে সংক্ষেপে আলোচনা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। গ্রন্থের মুখবন্ধে ও প্রতিটি পরিচ্ছেদে প্রাসঙ্গিকভাবে দেশের রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও ঘটনার ধারা সংক্ষেপে

উল্লেখ করা হয়েছে ; বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তার ধারাবাহিক আলোচনা করা হয় নি।

বইটিতে মৌলিক বিশ্লেষণ ও গবেষণার কোনো দাবি যে নেই সে-কথা সহৃদয় পাঠককে স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি। বহু পণ্ডিত ও গবেষক এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ পূর্বেই সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু সে-সমস্ত রচনার অধিকাংশই ইংরেজিতে লিখিত এবং এক-একটি কালপর্বে সীমাবদ্ধ ; বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আজও কেউ করেন নি। বর্তমান গ্রন্থের উপযোগিতা যদি কিছু থেকে থাকে, তবে সেদিক থেকেই।

গ্রন্থ প্রণয়নকালে পূর্বসূরিদের রচনা থেকে গৃহীত সবিশেষ সাহায্যের উল্লেখ সাধ্যমতো প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে। যে-কয়েকটি বই আগাগোড়া আমার দিগ্‌দর্শিকাস্বরূপ কাজ করেছে এখানে তাদের পুনরুল্লেখ বোধ হয় বাহুল্য হবে না। বিপিনচন্দ্র পাল রচিত 'নবযুগের বাংলা', মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'সায়েন্টিফিক পলিটিক্‌স', বিশ্বনাথ বর্মার 'মডার্ন ইণ্ডিয়ান পলিটিক্যাল থট্' এবং বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত 'হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল থট্ : ফ্রম রামমোহন টু দয়ানন্দ'—এই কটি গ্রন্থের নিকট বর্তমান লেখকের ঋণ বিশেষভাবে স্বীকার্য।

গ্রন্থটি রচনার সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র ও তাঁর দীর্ঘকালের সহচর শ্রীজ্ঞানাঞ্জন পাল এবং সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ পরামর্শ দান করেন। নিজের নানা অসুবিধা উপেক্ষা করে বইটির সুনিপুণ সম্পাদনা ও সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠবসাধনে সহায়তা করেছেন শ্রীবিমান সিংহ। শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার বইটি প্রকাশের ঝুঁকি নেবার অনেক আগে থেকেই বিষয়টির পরিকল্পনায় সাহায্য করেন। তাঁর পুরাতন পুস্তক বিভাগ থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ও পত্রিকাদি অবাধে ব্যবহারেরও সুযোগ পাওয়া গেছে। তাঁর সহকর্মী শ্রীঅজিতকুমার দাশ ব্যবস্থাপনায় বিশেষ সাহায্য করেছেন। পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনায় সহায়তা করেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীকৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থপঞ্জি ও নির্ঘণ্ট সংকলন করে দিয়েছেন নিউ আলিপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীসুচিত্রা ঘোষ।

এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

রাজনীতি বিষয়টি কারো-কারো কাছে অরুচিকর বলে বিবেচিত হয়। তাঁদের দৃষ্টিতে রাজনীতি নিছক দলাদলি ও নির্বাচনের রেষারেষি ছাড়া আর কিছু নয়, কাজেই তা দুর্নীতি, মিথ্যাচার প্রভৃতি নোংরামিতে ভরা। একদেশদর্শী এই দৃষ্টির প্রধান কারণ হল যথার্থ রাজনীতি সম্পর্কে লোকের সুস্পষ্ট চেতনার অভাব; দ্বিতীয়ত যাঁরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত তাঁদের মধ্যে আদর্শ ও ব্যবহারিকতার অসংগতি সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়টিকে হেয় করে তুলেছে। আশু কার্যকরতার তাগিদে রাজনীতিকেরা প্রায়শই সত্য ও মিথ্যার মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করেন। যুক্তি ও নৈতিকতা থেকে বিচ্যুতি ঘটায় রাজনীতি মানুষের হৃদয়ে তার আপন স্থান হতে বঞ্চিত।

বস্তুত রাজনীতি বিষয়টি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সংগে অচ্ছেদ্যবন্ধনে যুক্ত। কারণ রাজনীতির কাজ হল রাষ্ট্রের রীতিনীতি ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ; সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগে জীবনের সংগতিসাধনই তার লক্ষ্য। রাষ্ট্র সমাজের অংগ; সমাজেই মানুষ বাস করে। সমাজ ছাড়া সভ্য মানুষের জীবন অচল। রাষ্ট্রীয় কর্মপরিধির ক্রমবিস্তার ও জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার নিবিড় অনুপ্রবেশ ঘটেছে। সেজন্যে বিষয়টির প্রতি নিস্পৃহ ও চেতনা-বিরহিত মনোভাব পরিণামে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই পক্ষে ক্ষতিকর। পেরিক্লেসের কথায়:

> We alone regard a man who takes no interest in public affairs, not as a harmless, but as a useless character, and if few of us are originators, we are all sound judges of a policy.

রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও চেতনার সাহায্যেই উক্ত বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের ভীতি ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান হওয়া সম্ভব।

রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি কথাগুলি সমার্থেই ব্যবহৃত হয়; বিষয়টি সমাজবিজ্ঞানের অংগ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্যান্য প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগোত্রীয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কারণ যূথবদ্ধ মানুষের আচরণ বা সমাজের সমস্যাদি প্রায় গাণিতিক সূত্রে বিশ্লেষণ করা যায়, যেটা বিজ্ঞানের লক্ষণ। মানুষের আচরণ ও সমাজমনেরও কতকগুলি ধ্রুবক (constant) থাকে যার ভিত্তিতে সমাজতত্ত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে বিবেচনার দাবি রাখে। প্রকৃতিবিজ্ঞানের সংগে যেহেতু সমাজজীবনের সম্পর্ক নিবিড় সেই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংগে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অনস্বীকার্য।

এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই যে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের পরিপূরক। বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ের সমন্বিত রূপই হল দর্শন। ব্যক্তি ও সমাজের গতি ও

প্রকৃতির সঠিক পথনির্দেশনাস্বরূপ দর্শন মৌল জীবনাচারের সংহিতা মাত্র। সাধারণ দর্শন যেমন যাবতীয় বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে, তেমনি রাষ্ট্রদর্শন সমাজের বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত জ্ঞানের সংগতি সাধন করে।

বিজ্ঞানের কাজ সব কিছুর বাস্তবানুগ বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করা—যার সাহায্যে ও সমন্বয়ে দর্শন অর্থ নির্ণয় করে। বিজ্ঞান একটি বিষয়ের খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত করে—দর্শন সেই খণ্ডগুলিকে যুক্ত করে সমগ্রের মৌল মূল্যবত্তা, আদর্শ পরিণতি ইত্যাদির এক চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ তাৎপর্য নির্দেশ করে। বিজ্ঞান পথ ও প্রণালী দেখায় আর দর্শন জানায় লক্ষ্য ও পরিণতির নিশানা। বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্বের তখনই সার্থকতা যখন তার সাহায্যে মানবিক মঙ্গল সাধিত হয়। দর্শনবিচ্যুত বিজ্ঞান, তথা জীবন-ও মনুষ্যত্ব-নিরপেক্ষ জ্ঞানের উপকরণ মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিজ্ঞাননির্ভর সত্যের উপাদানে দর্শন প্রাণের প্রতিষ্ঠা করে; জীবনকে করে তোলে অর্থপূর্ণ ও আনন্দদায়ক।

উইল ডুরান্ট (১৮৮৫-১৯৮১) কৃত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী দর্শনের অঙ্গ হল পাঁচটি: যুক্তিবিদ্যা, কান্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, রাষ্ট্রবিদ্যা এবং অধিবিদ্যা। রাষ্ট্রবিদ্যা অর্থাৎ রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হল সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, গতি ও পরিণতির সামগ্রিক বিচারে অনুসরণীয় পথের নির্দেশনা ও তার মূল্যায়ন। ইতিহাস, বিশ্বতত্ত্ব, ইত্যাদি স্বভাবতই তার আলোচনার আনুষঙ্গিক বিষয়। রাষ্ট্রদর্শনের ব্যবহারিক প্রয়োগ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতির কাজ। সেজন্য অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষাচিন্তা, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অন্তর্গত।

বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রতত্ত্ব বিভিন্ন হয়ে থাকে। জ্ঞাতা বিশ্বতত্ত্ব ও ইতিহাসচিন্তার প্রকারভেদে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য ভিন্নরূপে দেখেন। কালের গতিতে মানুষের মননশক্তি ও জ্ঞানের সীমানা নিয়তই প্রসারিত হচ্ছে। জ্ঞান ও দর্শনের কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। সেজন্যে মানুষের মনের ও সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে রাষ্ট্রচিন্তারও নিরন্তর পরিমার্জনা ও পুনর্গঠন হওয়া স্বাভাবিক।

সমাজ ও সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে। প্রাচীন গ্রীসকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদি জন্মভূমি বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ভারতেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটেছিল; অবশ্য স্বতন্ত্র রূপে ও ধারায়। ঠিক আধুনিক অর্থে প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে কিছু না থাকলেও সমাজবদ্ধ জীবনে পালনীয় নানা রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার পরিচয় বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাচীন

কৃষিনির্ভর সমাজ চতুর্বর্ণে বিভক্ত ছিল। ছোট ছোট গোষ্ঠীর অধিপতি বা রাজার রাজধর্মে ব্রাহ্মণপুরোহিতেরা সাহায্য করতেন। বৈদিক গ্রন্থাদিতে 'সভা' ও 'সমিতি' কথার উল্লেখ আছে। পরবর্তী পৌরাণিক যুগে বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে মহাভারতের শান্তিপর্বে আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ উন্নততর রাষ্ট্রচিন্তার সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। কালক্রমে জনজীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের রীতিনীতি আরও সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিস্তার এবং ভারতে গ্রীক অভিযান দেশের রাজনৈতিক চিন্তায় উৎকর্ষসাধন করে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ৩৪৫-৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এবং মনুসংহিতা (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২০০-২০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বৌদ্ধ যুগে সাধারণতন্ত্র অর্থে 'গণ' কথাটির প্রচলন ছিল। গুপ্তযুগের শেষভাগে প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-চিন্তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন কামন্দকীয় নীতিসার (ষষ্ঠ শতক ?) রচিত হয়েছিল। অগ্নিপুরাণও (নবম শতাব্দী) উৎকৃষ্ট রাষ্ট্রচিন্তার সাক্ষ্য বহন করে। তৎকালীন রাষ্ট্রচিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক শুক্রনীতিসার গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে মতদ্বৈধ আছে। অনেকের মতে ত্রয়োদশ শতকে গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। মুসলমান আমলে পূর্বতন হিন্দু রাষ্ট্রনীতি ইসলামি চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নবরূপ লাভ করে। আকবরের অন্যতম পার্ষদ আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী (ষোড়শ শতক) গ্রন্থ ভারতের রাষ্ট্রীয় চিন্তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

আধুনিক অর্থে সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়েছিল গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তায়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্রমে সেই চিন্তা কালের যাত্রায় প্রসারিত হয়ে মেকিয়াভেলি, রুসো, হবস, লক, মিল, বেনথাম, কান্ট, হেগেল, মার্কস প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের রচনায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্তরালে একদল দেখেছেন ঐশ অভিপ্রায় এবং অপর দল মানুষকেই করেছেন সমাজের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। একদল ব্যক্তিকেই করেছেন যাবতীয় সামাজিক বিধিবিধানের মাপকাঠি ; অপরদলের দৃষ্টিতে মানুষ যূথবদ্ধ জীবনের অধীন ; যৌথ কল্যাণেই ব্যক্তিমানুষের কল্যাণ ; যৌথ স্বার্থে আত্মস্বাতন্ত্র্য মিলিয়ে দিলে সকলের মঙ্গল সাধিত হবে। ইতিহাস ও সমাজের অন্তরালে একদল মিলন ও সমন্বয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন; অপরদলের চোখে ইতিহাস দ্বন্দ্বসংঘর্ষে মুখর। উদারতন্ত্রীরা ব্যক্তিমানুষের মুক্তি ও স্বাধীন বিকাশকে বড় করে দেখেছেন ; আবার যূথবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীবিশেষের অগ্রাধিকারে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে উপেক্ষা করে মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ত জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

ভারতে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির

প্রভাবেই হয়েছিল। রামমোহন এদেশে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা করেন। তাঁরই চিন্তার সূত্র ধরে দেশের পরবর্তীকালের চিন্তানায়কেরা পশ্চাৎপদ ভারতকে বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এদেশে ইংরেজ শাসনের সুফল এই যে শতধা বিভক্ত সংস্কারাচ্ছন্ন একটি মধ্যযুগীয় দেশকে তারা আধুনিক প্রশাসনে শুধু যুক্তই করে নি, উপরন্তু এদেশবাসীর মনে পরোক্ষে ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চারেও সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু বিদেশী শাসনের বিরোধিতা ক্রমে পাশ্চাত্য বিদ্বেষ ও আধুনিকতার প্রতি অনাস্থা সৃষ্টি করে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের তাৎপর্য কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য ও অর্থনৈতিক শোষণেই সীমিত নয়, তাদের আবির্ভাবে দুটি ভিন্ন সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ধারার মিলন ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। নবাগত ধারা ছিল প্রাণরসে সজীব ও গতিশীল। অপরদিকে এদেশের ভাবধারা তখন নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল। পশ্চিমী প্রভাবে এদেশের প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ভারতীয় জীবনের রূপান্তর দেখা দেয়। সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে। আধুনিক শিক্ষা, শিল্প, পরিবহণ ও পরিশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনে দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন এক বিচিত্র সন্ধিস্থলে উপস্থিত হয়। নবাগত নবীন ধারাকে দেশের একদল অভ্যর্থনা জানায়, বৃহত্তর অন্যদল সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়।

উনিশ শতকে বাঙালির মনন ও সমাজচিত্র বৈচিত্র্যময়। কুসংস্কার, প্রথাপীড়ন ও সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে মুক্তির তাগিদে পশ্চিমী যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শে অনুপ্রাণিত একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রমুখ সমাজ সংস্কারককে তৎপর থাকতে দেখা যায়। ধর্ম ও সমাজের নব রূপায়ণকল্পে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে ডিরোজিওর অনুগামী ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রভাবে স্বাধীন চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, যুক্তিবাদী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈপ্লবিক ধারা সূচিত হয়। তাঁদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, প্রগতিশীল জীবনদর্শন ও দেশানুরাগ সরকারি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমাজপতিদেরও বিরাগ সৃষ্টি করে। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁদের মনোভাব ছিল প্রবল। ডিরোজিও গোষ্ঠীর উগ্র আচরণ এবং রামমোহন প্রভাবিত তদানীন্তন মডারেটদের মধ্যপন্থী মনোভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ রক্ষণশীল তৃতীয় একটি শক্তি মাথা চাড়া দেয়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার সঙ্গে বাঙালির মধ্যযুগীয় মনোভাবের এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরোধ ক্রমশ

বৃদ্ধি পায়। হিন্দু অতীত ও স্বাজাত্যবোধে দৃপ্ত এই রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিদেশী মূল্যবোধকেও বর্জন করে; দেশের প্রথানুসারী সকল বিষয়কে নির্বিচারে মেনে নেয়। বিদেশের ঠাকুরের চাইতে স্বদেশের কুকুরও বরং ভাল এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়ে ওঠে। এই হিন্দু পুনর্জাগরণকে পরোক্ষে ইন্ধন যুগিয়েছিল এদেশে আগত বিদেশী মিশনারিদের প্রচারতৎপরতা।

ভারতের জাতীয়তাবোধ দুটি সমান্তরাল ধারায় গড়ে ওঠে। প্রথমে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এবং পরে ইংরেজের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত আধা-রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ক্রমে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মের সংমিশ্রণ তার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। রামমোহন থেকে গান্ধী অবধি অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের চিন্তা ও সাধনায় রাজনীতি ধর্মের দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়েছে। প্রাচীন ধর্মের গরিমায় জাতীয়তাবোধ উদ্দীপিত হয়। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের ধর্মচিন্তা ছিল উদার ও সার্বজনীন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে চারটি ধারা লক্ষিত হয়: ১. পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শে দেশোন্নয়নের প্রয়াস; ২. গঠনমূলক ও প্রগতিশীল সংস্কার আন্দোলন; ৩. হিন্দু অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস; ৪. ভিন্ন আদর্শে ও প্রেরণায় ইসলামি সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রয়াস।

অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিকের মতে ভারতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্যে কোম্পানির আমল থেকে চার্চিলের সময় অবধি ইংরেজের প্রশাসনিক অভিসন্ধিই মূলত দায়ী। এ-বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার প্রয়োজন আছে। ভারতের সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ইংরেজ যে ব্যবহার করেছিল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু ইংরেজ শাসননীতিই তার একমাত্র উৎস বলে মনে করা একদেশদর্শিতা। বিগত কয়েক শো বছরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচারবিচার ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির যথোচিত উৎস নির্ণীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদেশী শাসনের গ্লানি ও পরাভব থেকে মুক্তির তাগিদেই আত্মশক্তি ও মর্যাদা অর্জনকল্পে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী প্রেরণার উৎসস্বরূপ হিন্দু অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল। কিন্তু কেন তাঁরা প্রেরণার আশায় প্রাচীন হিন্দুত্বকে ফিরে পেতে চান এবং ক্রমে কেনই বা হিন্দুত্বের চেতনা রাজনীতিতে প্রবল হয়ে ওঠে, সে-প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। ইংরেজ কেবল হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকেই কাজে লাগায় নি; রাজন্যবর্গের ও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বিভেদেও ইন্ধন যুগিয়েছিল; ভাষাঘটিত কলহকেও বাদ দেয় নি। কিন্তু কেবল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধই পরিণামে সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পর তখনকার সংস্কারকদের যাবতীয় প্রয়াস প্রধানত ধর্ম ও সমাজের পুনর্গঠনে নিবদ্ধ ছিল। নতুন আইনকানুনের সাহায্যে সামাজিক সংস্কারসূত্রেই সংস্কারকদের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক দেখা দেয়। পাশ্চমী চিন্তার প্রভাবে তাঁরা রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন স্পষ্টই বলেছিলেন যে অধিকতর রাজনৈতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধার জন্যে প্রথমে ধর্মের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। দেশে নবাগত যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জনচিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজেরই প্রভাবে; কিন্তু রাজনৈতিক বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তারে উদ্যত হয় নি। পরবর্তীকালে অনুরূপ ভূমিকা দেখা যায় রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মতৎপরতায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দুটি প্রতিষ্ঠানকে হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনে তৎপর হতে দেখা যায়। একটি দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্যসমাজ' (১৮৭৫) এবং অপরটি মাদাম ব্লাভাৎস্কির 'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি' (১৮৭৬)। হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনে বাংলাদেশে জাতীয়তার অন্যতম পুরোধা রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং কিছুটা বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ অংশ নিয়েছিলেন; এই ভাবধারারই পরিবর্ধন ঘটে জাতীয়তাবাদী দল নামে অভিহিত চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের চিন্তায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ফলে অহিন্দু সমাজ বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় সচকিত হয়ে ওঠে। তারাও প্রেরণার স্বতন্ত্র উৎসের সন্ধানী হয়। ইসলামি সংস্কৃতি, ভারতে মুসলমান আমলের ঐতিহ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি থেকে তারা স্বাজাত্যবোধ ও আত্মগৌরবের নিজস্ব উপাদান খুঁজে পায়। মুসলমান শাসনকালে সরকারি উচ্চপদ, সেনাবাহিনী, বিচার ও প্রশাসনে মুসলমানদেরই ছিল একাধিপত্য। ইংরেজ শাসনে তাদের সেই আধিপত্য চলে যায়। নতুন ভাষা, সংস্কৃতি ও শাসন বিধিকে তারা মেনে নিতে পারে নি। নবাগত পাশ্চমী ধারাকে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সাদরে গ্রহণ করেছিল। পাশ্চমী সংস্কৃতির বিরোধী ফরায়েজি আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহের পশ্চাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের ফলে তাদের প্রতি ইংরেজের মন সংশয়িত হয়ে ওঠে। মুসলমানেরা দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসন ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। তাদের এই পশ্চাৎপদতা উপলব্ধি করে স্যর সৈয়দ আহমেদ খাঁ (১৮১৮-১৯০৮) মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র চেতনায় ইংরেজের শিক্ষা ও শাসনের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁরই নেতৃত্বে আলিগড় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন ও হিন্দু নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেস থেকেও

তিনি মুসলমানদের দূরে রাখার প্রয়াসী হন। কংগ্রেস বিরোধী একাধিক সংগঠনও তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। আমির আলি, নবাব সলিমুল্লা প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর সহায়ক হন। গো-রক্ষা আন্দোলন, হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলন মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধকে খুঁচিয়ে তোলে। হিন্দু আধিপত্যের ফলে তারা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করে নি।

অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে যে-শ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ও উদারনৈতিক আদর্শ বিস্তার লাভ করেছিল, সে-শ্রেণী ছিল সেখানকার নবোদ্ভূত শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায়। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অনাচারের বিকল্প হিসাবে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী এক উন্নত সমাজব্যবস্থার সূত্রপাত করেছিল; নতুন ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত এই শ্রেণীর নেতৃত্বেই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সার্থক হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারনীতির পরিপোষক হলেও এই শ্রেণীর মনে বিশ্বজনীনতার পরিবর্তে জাতীয়তাবাদই প্রাধান্য লাভ করে। তাদের জাতীয়তাবাদী প্রবণতা ক্রমে উদারনীতির পরিপন্থী-স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র ধারণ করে।

ভারতে ইংরেজ বণিক শ্রেণীর আবির্ভাবে এদেশে এক নতুন বণিক শ্রেণী দেখা দেয়। শেষোক্ত শ্রেণীর নেতৃত্বে এদেশেও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। বাধা পড়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যনীতির প্রবর্তনে, ফলে এদেশের বণিক শ্রেণীর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। নবোদ্ভূত দেশীয় বণিক শ্রেণীর মোটা অংশ জমিদার শ্রেণীতে পরিণত হয়; কারণ সে-সময়ে জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করাই ছিল নির্ঝঞ্ঝাট অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ উপায়। শিল্পবাণিজ্যে পুঁজি নিয়োগের পরিবর্তে কোম্পানির কাগজ কিংবা সুদি কারবারই বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। তাই সে সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক যুগান্তরের সম্ভাবনা বহুকালের মতো পেছিয়ে যায়। রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে দেশের নবজাগরণে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা শিক্ষিত পুঁজিবাদী ইংরেজের আনুকূল্যেই এদেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব চেয়েছিলেন।

ইউরোপে বণিক শ্রেণীর নেতৃত্বে উদ্ভূত যুগান্তকারী ভাবধারা ইংরেজ শাসনসূত্রে এদেশে সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই ভাবধারা বহনের ভূমিকা এদেশের যেশ্রেণী গ্রহণ করেছিল, তারা দেশীয় বণিক শ্রেণী না—ইংরেজ শাসন পুষ্ট এক অভিনব মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। শহরবাসী জমিদার, ইংরেজ প্রশাসনযন্ত্রে প্রভুত ভারতীয় আমলাবর্গ, বিচার ও শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে এক ভদ্রলোক সম্প্রদায় হিসাবে এই অভিনব মধ্যবিত্ত শ্রেণী দানা বাঁধে। তাঁরাই পশ্চিমী সংস্কৃতির বাহক ও পরিপোষক হয়ে দাঁড়ান। তাঁদের সঙ্গে অর্থনৈতিক

উৎপাদন ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক ছিল না। নতুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তিতে দেশকে নতুন দৃষ্টিতে গড়ে তোলার ক্ষমতা ও চেতনা তাঁদের ছিল না। বিদেশী শাসনের পক্ষপুটেই তাঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে মেকলের স্বপ্নকেই তাঁরা সফল করে তোলেন, অর্থাৎ জাতে ভারতীয় হয়েও তারা সংস্কৃতিতে হবে পশ্চিমী মনোভাবাপন্ন, যাতে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা নির্বাধে চলতে পারে। অভিনব এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সঙ্গে দেশের মাটি ও মানুষের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ; পক্ষান্তরে বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে দেশের সামাজিক বিপ্লবসাধনেও তাঁদের চেতনা ও সামর্থ ছিল না। ফরায়েজি আন্দোলন, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহি বিদ্রোহ ইত্যাদির চরিত্র যাই হোক না কেন, সেগুলিকে প্রগতিশীল নেতৃত্বে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের দেখা যায় নি। নীলকর ও জমিদার শ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের প্রতিবাদ বৃহত্তর শিক্ষিত শ্রেণীর সমর্থনের অভাবেই নিষ্ফল হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে উনিশ শতকের ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রকৃতিগত পার্থক্য তাই সুপরিস্ফুট। এদেশীয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর চরিত্রে অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনার অভাব ও ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি ছিল প্রবল। পাশ্চাত্যে মধ্যবিত্তশ্রেণী সামন্ততন্ত্রী অচলায়তন ভেঙে নতুন সমাজ সৃষ্টিতে অগ্রণী হয়েছিল। রাজশক্তি ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ আনুগত্য ও মধ্যযুগীয় প্রথাপীড়নের বিরুদ্ধে তারা যুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পন্থা গ্রহণ করে। সেখানকার সামন্তশক্তি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরোধ ছিল স্পষ্ট। এদেশে জমি ও শিল্পের মালিকানা বহুলাংশে একই শ্রেণীর হাতে থাকায় উভয় শ্রেণীর স্বার্থবিরোধ দেখা দেয় নি। এদেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরবর্তীকালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যতটা সংগ্রামী হয়ে ওঠে, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সে-পরিমাণে উৎসাহ দেখায় নি।

একথাও স্মর্তব্য যে নবাগত ভাবধারার সার্থক গ্রহণ ও প্রয়োগে সেদিন উপযুক্ত শ্রেণী গড়ে না ওঠার মূলে অবশ্য ইংরেজ শাসন ও শোষণই ছিল প্রধান কারণ। ভারতীয় নবজাগরণের ভগীরথ ইংরেজই তার শাসন ও শোষণে সেই নবধারাকে রুদ্ধ করে দেয়।

উপরিবর্ণিত শ্রেণীর আশ্রয়েই এদেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধে। দলীয় রাজনীতিরও সূত্রপাত হয়। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। রামমোহনকেই মডারেট নামে পরিচিত ধারার প্রবর্তক বলা যায়, যার আধিপত্য বিশ শতকে প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধোত্তর কাল অবধি বিস্তৃত। মডারেটদের মধ্যে দুটি মনোভাব দেখা যায়; একটি

রক্ষণশীল, অপরটি উদারতন্ত্রী। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাঁরা সাম্য, সুবিচার ও স্বায়ত্তশাসন চাইতেন। ইংরেজের যুক্তিবাদী, উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রচিন্তার তাঁরা গুণগ্রাহী ছিলেন। রামমোহনের আদর্শে তাঁরা এই মনোভাব পোষণ করতেন যে ইংরেজ শাসনের মধ্যে দিয়েই এদেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন ঘটুক। কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক চেতনা ও ঐতিহ্য বলে কিছু নেই। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে শাসকদের কাছ থেকে তাঁরা দেশের নানা সুযোগসুবিধা আশা করতেন। এবং দেশবাসীকে সেই দৃষ্টিতেই উৎসাহিত করেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপে ভারতীয় মডারেটদের দৃষ্টিভঙ্গি হেয় প্রতিপন্ন হত, আবার ব্রিটেনের উদারনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিষ্ক্রিয় আচরণে তাঁদের উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ত। ইংরেজের দুর্নীতি ও অবিচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় মডারেটরা যতই সোচ্চার হয়ে থাকুন না কেন, উগ্র জাতীয়তাবাদীদের প্রচারে তাঁরা দেশবাসীর চোখে বিদেশী প্রভুভক্তরূপে পরিগণিত হতেন। আপাতদৃষ্টিতে চরমপন্থীদের সঙ্গে মডারেটদের বিরোধ থাকলেও মূলত কোনো প্রভেদ ছিল না। উভয় গোষ্ঠীই চাইতেন ব্রিটেনের আদর্শে এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। মডারেট ধারার প্রতিপক্ষরূপে বিবেচিত অনেক নেতাই ক্রমে তাতে উৎসাহিত হন। তাঁদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন এবং পরবর্তীকালে গান্ধীর মনোভাবকেও এই ধারার অনুবর্তী হতে দেখা যায়। ভারতীয় মডারেটরা স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্রতত্ত্বের উদ্ভাবনায় সচেষ্ট হন নি। এদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা এবং স্বাধীনতার পর সংসদীয় রাষ্ট্রকাঠামো গঠনের পিছনে সেদিনের মডারেট নেতৃবৃন্দের প্রভাব অনস্বীকার্য। মডারেটদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও ত্রুটিপূর্ণ কর্মপদ্ধতির ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিশেষ যোগসূত্র ছিল না; ফলে তাঁরা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে ক্রমে বিদায় নেন। কংগ্রেস দলের প্রথম ত্রিশ বছরের নেতৃত্বে মডারেটদেরই ছিল আধিপত্য।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাবের পর ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের মোড় ফিরে যায়। আবেগ ও উচ্ছ্বাসসর্বস্ব আধ্যাত্মিকতার উদ্দামতায় তাঁরা পশ্চিমী প্রভাব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করেন। চরমপন্থী ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে তাঁদের প্রভাবে রাজনীতির মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে।

জাতীয়তাবাদ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান অঙ্গ। এবিষয়ে পাশ্চাত্য রাষ্ট্র-দার্শনিকদের বিশেষ প্রভাব আছে। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মোটামুটি তিনটি ধারা লক্ষণীয়:

১. মডারেটদের অর্থনৈতিক বিচারভঙ্গি;

২. চরমপন্থীদের মাতৃত্ব ও হিন্দুত্ব প্রত্যয়ে দেশাত্মবোধ ;
৩. কিছু সংখ্যক হিন্দু ও অধিকাংশ মুসলমান নেতার চিন্তায় দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রাবল্য।

নরম ও চরমপন্থী কোনো দলেই আকৃষ্ট হতে না পেরে পরবর্তীকালে যাঁরা স্বতন্ত্র তৃতীয় পথের সন্ধান করেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বাহ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের নিষ্ফলতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জনচেতনা সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বিদেশী প্রশাসনব্যবস্থার সমান্তরাল ধারায় স্বয়ংনির্ভর সামাজিক কাঠামোর সাহায্যে সরকারি ব্যবস্থাকে শক্তিহীন করে তোলার এক বৈপ্লবিক কর্মসূচি তুলে ধরেন। ধর্মবিদ্বেষ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধেরও তিনি নিন্দা করেন। যুক্তি, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও মানবতার আদর্শে তাঁর বিশ্বজনীন রাষ্ট্রদর্শন রচিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। নরম-পন্থীরা তখন বিলীয়মান আর চরমপন্থী দলও ছত্রভঙ্গ। অতঃপর চরকা, খিলাফৎ, অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য মন্ত্রের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী ক্রমে ভারতীয় রাজনীতির অধিনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। দেশের জনজাগরণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য; দেশবাসীর মনে তাঁর প্রভাব ছিল অসীম। চরিত্রে তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ। কিন্তু দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ, অসংবদ্ধ কর্মপন্থা ও যুক্তিবিরোধী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি দেশের রাজনীতিকে করে তুললেন জটিল ও নিশ্চল। ইহবিমুখ জীবনবোধ ও বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তার ফলে তাঁর শত সদিচ্ছা ও প্রভাব সত্ত্বেও তিনি দেশের অনভিপ্রেত গতিকে রোধ করতে পারেন নি। তাঁর অনিচ্ছা উপেক্ষা করে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তাহলেও তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে অহিংস সত্যাগ্রহের কর্মপন্থা, লক্ষ্য ও প্রণালীর সামঞ্জস্যচিন্তা, বিকেন্দ্রিত প্রশাসন ও পার্টিবিহীন রাজনীতির প্রত্যয় সমসাময়িক বিশ্বচিন্তার ভাণ্ডারে এক বিশেষ অবদান।

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তায় এদেশের মনীষীরা সবাই পশ্চিমী ভাবধারায় অবগাহন করেন। বেনথাম, মঁতেসকিয়ো প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের চিন্তায় রামমোহন প্রভাবিত হয়েছিলেন। পেইন, গিবন, হিউম-এর চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায় নব্যবঙ্গদলের মনে। বার্ক ও গ্ল্যাডস্টোনের সঙ্গে মাৎসিনিকেও সুরেন্দ্রনাথ আদর্শ জ্ঞান করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র একসময়ে মিল ও কোঁতের চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেগেল ও নীটশের প্রভাব দেখা যায় অরবিন্দের চিন্তায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ইউরোপের বহু মনীষীর অল্পবিস্তর প্রভাব ছিল। চিত্তরঞ্জনকে অনেকে আইরিশ জননেতা পার্নেলের সঙ্গে তুলনা করেন। হেগেল ও মার্কসের দর্শনে সুভাষচন্দ্র অনুপ্রাণিত হন, লেনিন ও মুসোলিনিকে

তিনি আদর্শ করেছিলেন। মূলত মার্কসের দর্শনে প্রভাবিত হলেও ইউরোপের বহু চিন্তানায়কের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাঙ্গীকরণ ঘটে মানবেন্দ্রনাথের মনে। রামমোহনের আমল থেকে মানবেন্দ্রনাথের সময় অবধি ইতালি, আমেরিকা, আয়ার্ল্যান্ড প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিপ্লব এদেশের চিন্তাশীল মানুষকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বর্তমান শতকের বিশের কোঠায় ইউরোপের দুটি মতবাদ ভারতে প্রভাব বিস্তার করে: একটি কমিউনিজম এবং অপরটি ফ্যাসিজম। রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের কর্মসূচি অনুযায়ী মস্কো থেকে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে কমিউনিজম প্রচারের সূত্রপাত করেন। দ্বিতীয় মতবাদ ফ্যাসিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের সমন্বয়ে তৃতীয় একটি মতবাদ উদ্ভাবন করেন।

রামমোহনের আমল থেকে পরবর্তী দেড় শতাধিক বছরের মধ্যে দিয়ে এদেশের আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা নানা ভাব ও আদর্শে পরিপুষ্ট হয়েছে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও চিন্তা ও আদর্শের বিচিত্র ধারায় বহু রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন, যুগান্তকারী বিপ্লব এবং বিজ্ঞানের আনুকূল্যে বিশ্বের জনমানসে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ইউরোপে দীর্ঘকালের সাধনায় রাজনীতি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও মৌলিক বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তত্ত্বগতভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পশ্চিমী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হলেও অধুনাকালে ভারতেও এবিষয়ে কিছু মৌলিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি সংযোজিত হয়েছে।

ভারতীয় চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ধর্ম, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চিন্তায় ও গবেষণায় তাঁরা রাজনীতিকে একক ও স্বতন্ত্রভাবে বিচার করেন নি, যেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখা যায়। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ মনীষীর মতে রাজনীতিকে সমাজের অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা যায় না, সকল বিষয়ই ঘনিষ্ঠসূত্রে সম্পৃক্ত। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় যে রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মতৎপরতার সূত্রেই এদেশের রাষ্ট্র-দার্শনিকেরা উক্ত বিষয়ে চর্চা করেছেন। দল ও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও রাজনীতিকে স্বাধীন 'অ্যাকাডেমিক' দৃষ্টিতে বিচার ও গবেষণা করার নজির এদেশে খুব অল্পই পাওয়া যায়।

এক বিশেষ পরিস্থিতিতে এদেশে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত ও বিস্তার হয়েছিল। বিদেশী শাসন এবং দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির অবক্ষয় থেকে পরিত্রাণের আশায় এদেশের চিন্তানায়কেরা জাতীয় জীবনকে সর্ববিষয়ে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রয়াসী হন। প্রেরণার জন্যে কেউ তাকিয়েছিলেন

অতীতের দিকে, আবার কেউ বা আধুনিক ধারায় দেশ গড়তে চেয়েছেন। সেজন্যে এদেশের রাষ্ট্রচিন্তা যে-পরিমাণে তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে প্রাচীন ধারার রোমন্থন ও প্রচারধর্মী। সুদূরপ্রসারী প্রণালীবদ্ধ তাত্ত্বিক উদ্ভাবনার অবকাশ ছিল নিতান্তই সীমিত। আশু প্রয়োজন ও কার্যকারিতার দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক পুনর্গঠনের তাগিদে ধর্ম, দর্শন, সমাজ ইত্যাদির আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে রাজনীতি বিবেচিত হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাচীন গ্রীক আমল থেকেই মোটামুটি একটা আমূল ধারাবাহিকতা লক্ষিত হয়। তাতে তত্ত্ব ও পদ্ধতির বিস্তার ও প্রভেদ ঘটে থাকলেও গ্রীক রাষ্ট্রদর্শনই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য চিন্তার উৎস। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পারম্পর্য নেই। একটি সাদৃশ্য যা আছে তা হল সবাই প্রধানত ভারতের সমস্যাকে সামনে রেখেই চিন্তা-ভাবনা করেছেন। ইংরেজের দুশো বছরের ভারত শাসনকালে নানাবিধ প্রশাসনিক সংস্কার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মপন্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আধুনিক ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা বিকশিত হয়েছে। তাহলেও বিশ্বের রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে এদেশের তিনটি মৌলিক অবদান অস্বীকার করা যায় না:

১ গান্ধীর সর্বোদয় দর্শন ; আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে মানুষের বিবেক ও নৈতিকতার আশ্রয়ে যাবতীয় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ পদ্ধতি।

২. অরবিন্দের ‘অতিমানস’ প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্রের পরিকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ধর্মী আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন মৈত্রীর আদর্শ।

৩. বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের সাহায্যে যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ দর্শন।

কেশবচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ প্রমুখ বাঙালি চিন্তানায়কের মনে সাম্য ও সমাজতন্ত্রের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেলেও আধুনিক দৃষ্টিতে এদেশে সমাজতন্ত্রী মনোভাব প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর থেকেই ক্রমশ নানা ধারায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী দৃষ্টিতে গান্ধী বিকেন্দ্রিত প্রশাসনব্যবস্থা ও গ্রামনির্ভর উন্নয়নের ভিত্তিতে এক সমাজবাদী আদর্শ তুলে ধরেন। জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, জয়প্রকাশ প্রমুখ সমাজতন্ত্রীরা যতটা না মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা ও অর্থনৈতিক সাফল্যে উৎসাহিত হন। ভারতীয় কমিউনিস্টরাও ক্রমে সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধি লাভ করেছে ; কিন্তু তাঁরা দেশবাসীর বস্তুবাদী চেতনা সৃষ্টির পরিবর্তে মানুষের সাময়িক অভাব ও অসন্তোষগুলিকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

ভারতে দীর্ঘকালীন জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী আন্দোলন পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও জনজীবনের যে তিনটি মুখ্য দুর্বলতা আজ প্রকট হয়ে উঠেছে সেগুলি হল—

১. যথার্থ 'সেকিউলার' মানসিকতার অভাব ;

২. সর্বভারতীয় একাত্মবোধ তথা জাতীয় সংহতির বিষয়ে অর্ধমনস্কতা ;

৩. সুষ্ঠু রাজনৈতিক সংস্কৃতির (পলিটিক্যাল কালচার) বিকাশে প্রতিবন্ধকতা।

পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত উল্লিখিত তিনটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। 'সেকউলারিজম' শব্দটা এদেশে বিকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় রাজনৈতিক পরিভাষায় 'সেকিউলার' বলতে ধর্মনিরপেক্ষতা বোঝানো হয়। অর্থাৎ সব ধর্মকেই সমান মর্যাদা দেওয়াই হল এদেশে 'সেকিউলারিজম' শব্দটির অর্থ। শব্দটি সম্পর্কে এই ধারণা ভুল। সব ধর্মই সমান সত্য একথা 'সেকিউলার' চিন্তার পরিপন্থী। শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল সব ধর্মই অসত্য ; অর্থাৎ মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি. একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইহজগৎ ও জীবনই হল সত্য। পরকাল, ঐশশক্তি বলে কিছু নেই। রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে 'সেকিউলার' চিন্তার সূত্রপাত ঘটেছিল। এদেশে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনে সব ধর্মকেই সমান স্থান দেওয়া কর্তব্য—সব ধর্মেরই পূজাপার্বণে ছুটি থাকা চাই—এটা 'সেকিউলার' দর্শনের বিপরীত। আমাদের প্রাত্যহিক সমাজজীবনের সঙ্গে এক একটি ধর্মীয় অনুশাসন অচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। বিধর্মীর সঙ্গে খানাপিনা বিবাহ কিংবা স্বধর্মেই সমাজের গঠন, পরিবার, বিবাহ উত্তরাধিকার, ব্যক্তিগত আইনকানুন ইত্যাদি সবই সেইসব ধর্মীয় অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই কেবল আমরা সর্বধর্মের সমন্বয় চাই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিসে চলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ; রাজনীতির মধ্যেও এক একটি ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। প্রাত্যহিক সমাজজীবনের আচরণ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সর্বধর্ম সমন্বয় আদর্শের এই গোঁজামিলের ফলে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব নিত্যই লেগে আছে। যথার্থ 'সেকিউলার' রাষ্ট্রের আগে চাই ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত যথার্থ 'সেকিউলার' সমাজ। ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার ; তাকে প্রকাশ্য স্থানে টেনে আনা যে বিপজ্জনক সে কথা ধর্মের ভিত্তিতেই দেশবিভাগে প্রমাণিত। খলিস্তানের দাবি সেই একই গোত্রের।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশটা দ্বি-খণ্ডিত হয়েছিল। তার চার দশক পরে ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে যে সব আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী

আন্দোলন দেখা দিয়েছে, সেই নিরিখে আজ প্রশ্ন উঠেছে যে ভারত আদৌ একটি নেশন কিনা। ইংরেজের সাম্রাজ্যবিস্তারী অভিযান ও শাসনব্যবস্থায় হরেক ভাষা, সংস্কৃতি, জাতি ও ধর্মের অন্তর্গত মানুষে অধ্যুষিত এক-একটি অঞ্চল বা প্রদেশ 'ইন্ডিয়া' নামে এক অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তায় সংযুক্ত হয়েছিল। ইংরেজের শাসন ও শোষণতন্ত্র থেকে মুক্তির তাগিদে যে-ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেটা নেতিবাচক ও বিদ্বেষমূলক এক নেশনের ভাবাবেগে দেশটাকে ঐক্যবদ্ধ করে। দেশকে দ্বিখণ্ডিত করে ইংরেজ চলে যাবার পর সেই ঐক্যের বন্ধন ক্রমেই শিথিল হয়ে এসেছে। সেই ঐক্যের মধ্যে "মানস পদার্থ" অর্থাৎ যেটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নেশনের মূল উপাদান তার অভাব আজ সুস্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে যাঁরা ধর্মকে নেশনের মূল উপাদান বলে মনে করেছেন তাঁদের স্বপ্নও আজ ধূলিসাৎ। ভাষা, বর্ণ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যেই আঞ্চলিকতা কিংবা বিচ্ছিন্নতাবাদ আজ প্রবল। নেশন কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ রবীন্দ্রনাথের মতে "মহাজাতি," যেখানে অনেক জাতি যুক্ত। তাঁর মতে "জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন-নামক মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে।" তাঁর দৃষ্টিতে অতীতের সুখদুঃখের স্মৃতিসম্পদ এবং পরস্পরের সম্মতিসাপেক্ষ একত্রে বাস করার ইচ্ছাই হল নেশনের মুখ্য দুটি উপাদান।

দুটি উপাদানই ভারতে আছে যথেষ্ট। সে-দুটির প্রতিবন্ধকতাকে যুক্তিগ্রাহ্য উপায়ে জানা ও প্রতিকারের পথ খোঁজা দরকার। অতুলপ্রসাদের লেখা "নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান" গানটির দৃঢ়মূল বাস্তব সঙ্গতি আছে। বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতের মিলনের সুরকে বজায় রাখতে হলে দেশের সমস্ত অঞ্চলের সকল ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির সেন্টিমেন্টকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। কারো উপর কোনো কিছু জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। সমস্ত জনজাতি গোষ্ঠীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বাতন্ত্র্যকে বুঝতে হবে, মানতে হবে। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে একটি ভাষাভাষী অঞ্চলে অপর কোনো ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস ও জীবিকার সুযোগ পাবে না।

জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে প্রথমত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও বিকেন্দ্রিত প্রশাসনের অবকাশ থাকা চাই। কেন্দ্রানুগ জবরদস্ত শাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্যে নিছক দমনমূলক ব্যবস্থা সমাধানের পথ নয়; পরিণামে সেটা হয় স্বৈরতন্ত্রের উৎস। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো ও তার জন্যে

সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব বিবেচিত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার যথার্থ বিকেন্দ্রীকরণ ও নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের প্রশ্নে গুরুত্ব দান সবচেয়ে জরুরি বিষয়। সমাধানের তৃতীয় পথ দীর্ঘমেয়াদী, কিন্তু আমূল পরিবর্তনের পক্ষে বেশি কার্যকর, অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে যথোচিত সমতা, সম্প্রীতি ও একাত্মবোধ সঞ্চারের উপযোগী বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষার বিস্তার হওয়া দরকার।

সাম্য, মৈত্রী, গণতন্ত্র প্রভৃতি মূল্যবোধগুলি পাশ্চাত্যে জনজীবনের অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠে কয়েকশ' বছরের চিন্তাভাবনা, অনুশীলন, উদ্যম, সংগ্রাম, বিপ্লব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। ভারতে বিচার, প্রশাসন, আইন, শিক্ষা প্রভৃতি বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঐসব মূল্যবোধ সঞ্চারের অভিপ্রায় ফলপ্রসূ না হবার প্রধান কারণ হল স্বাধীনতার আগে ও পরে ব্রিটেনের ধাঁচে যাবতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে, অনেকটা সমাজদেহে সেগুলি জুড়ে দেওয়ার মতো —যার সঙ্গে ভারতীয় জনজীবন অর্থাৎ সামাজিক ধারা, সংস্কৃতি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু বিগত পৌনে দুশো বছরে রামমোহন, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নিত্য পূজিত মনীষীরা স্বদেশের আপামর মানুষকে মানসিক উৎকর্ষতাবিধানে অশেষ শ্রমদান করেন। তাঁদেরও প্রয়াস আজ নিষ্ফল মনে হয় যখন দেখা যায় নিম্নবর্গ মানুষের প্রতি নির্বিবেক আচরণ, নারী নির্যাতন হরিজন নিধন, জাতপাতের রাজনীতি, সর্বস্তরে দুর্নীতি ও দ্রুতবিস্তারী মূল্যবোধ বর্জন।

রাজনৈতিক বিষয়ে সচরাচর যে উৎসাহ চোখে পড়ে তার পিছনে যুক্তিবাদী স্বাধীন চিন্তা অপেক্ষা গালভরা আদর্শের বুলি আর গঠনমূলক প্রয়াসের পরিবর্তে বাহ্য-আন্দোলন সর্বস্ব বাক্যের উত্তাপই বেশি। দেশে একটি সুস্থ রাষ্ট্রসংস্কৃতি অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন 'পলিটিক্যাল কালচার' গড়ে ওঠে নি। মানুষের যথার্থ কল্যাণসাধনের পরিবর্তে দলীয় স্বার্থসন্ধানী মনোভাব এবং দলের মধ্যে আদর্শ অপেক্ষা ব্যক্তিস্বার্থের লড়াই বড় হয়ে উঠেছে। মানুষ আজ দলীয় রাজনীতি ও নেতৃত্বের খেলার বস্তু। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন আজ দুর্বিষহ। তাদের কাছে তাই রাজনীতি বিষয়টি অরুচিকর হওয়াই স্বাভাবিক। সেজন্যে প্রতিটি মানুষকে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন দল ও নেতাদের ভরসায় না থেকে নিজের স্বাধীন চিন্তা, বস্তুনিষ্ঠ বিচারশক্তি ও বিবেকের সাহায্যে রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

১ বঙ্গে নবজাগরণ ও রাষ্ট্রচিন্তার আদিপর্ব

পরিপ্রেক্ষিত

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আঠারো শতককে বিপ্লবের শতক বলা যায়। পূর্ববর্তী কয়েক শ' বছরের রেনেসাঁসের সূত্র ধরে আঠারো শতকে ইউরোপে দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজচিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ধর্মীয় অনুশাসন থেকে ক্রমে ইহজীবনবোধে উত্তরণ এবং যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয় সমকালীন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের লেখনীতে। সে-বিদ্রোহ ছিল যুক্তিবাদ, স্বাধীনতা ও মানবতন্ত্রের। যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও উদারতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়। শতকের মধ্যবর্তীকালে বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের ফলে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয়। রেনেসাঁসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে-আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়েছিল তাতে গতি সংযোগ করেছিল এই শিল্পবিপ্লব। শতকের শেষ চতুর্থাংশে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ইউরোপে ফরাসি বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সূচিত করে।

সমসাময়িক কালে ভারতের পরিস্থিতি ছিল বিপরীত। কেন্দ্রীয় মোগল রাজশক্তির তখন ভগ্নদশা। দেশের বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক রাজশক্তির আধিপত্য চলেছে। সেগুলির পারস্পরিক বিরোধ ও দেশব্যাপী সার্বিক বিশৃংখল পরিস্থিতির সুযোগে সাম্রাজ্যবিস্তারী বিদেশি শক্তি ক্রমে এদেশে শাসনক্ষমতা দখল করে। সর্বোপরি সাধারণ মানুষ ছিল অশিক্ষা, জড়তা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধে আবদ্ধ মানুষের জীবনে বিরাজ করত অদৃষ্টবাদ ও ইহজীবনবিমুখ মনোভাব। অন্ধবিশ্বাস, প্রথাপীড়ন ও জাতিভেদে জীর্ণ মানুষের না ছিল মনের স্বাধীনতা, না কোনো উদ্যম ও উদ্ভাবন প্রয়াস। মুষ্টিমেয় মানুষের মননশীলতা যথার্থ বুদ্ধির চর্চার পরিবর্তে শাস্ত্রীয় ও প্রথাগত বিষয়াদির ব্যাখ্যা অথবা ভাষ্য রচনায় সীমিত থাকত। বহির্জগতের সঙ্গে কারো সংযোগ বিশেষ ছিল না।

বস্তুত প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন বস্তুবাদী দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে যে-বৈপ্লবিক ধারা দেখা দিয়েছিল, সেটা পরবর্তী পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মায়াবাদী আধ্যাত্মিক প্রতিবন্ধকতায় রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে যে-ইসলাম একদিন এক মস্ত প্রগতির ভূমিকা নিয়েছিল, চিন্তাবিপ্লবের ব্যাপারে ভারতের মাটিতে তা আদৌ কার্যকর হয় নি। ভারতের মতো ইউরোপেও যুগ যুগ ধরে ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের বুদ্ধির চর্চা ও মুক্তির আবেগকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। সেই তমসা ও নিশ্চলতা থেকে ইউরোপ বেরিয়ে আসতে পারে কয়েক শতকের রেনেসাঁস ও আঠারো শতকের বুদ্ধি-বিভাসিত আন্দোলনের (এনলাইটেনমেন্ট) ফলে।

আঠারো শতকে ইংরেজ যখন বঙ্গদেশে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম করে তোলে তখন থেকে ভারতের জনজীবনে ভালমন্দ নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। গ্রামকেন্দ্রিক সমাজে ভাঙন ধরে, উদ্ভব হয় নতুন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর; ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারতের লাঙল বিলেতের কলকারখানার চাকায় বাঁধা পড়ে। এদেশের পণ্য ও সম্পদ যে বিপুল পরিমাণে ইংল্যান্ডে চলে যেতে শুরু করে, তাতে ভারত প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক কালান্তরে উভয় দিকই থাকে। অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে নবাগত আধুনিক প্রশাসন, শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রবর্তন তথা ইউরোপের সমকালীন বৈপ্লবিক মননশীলতার প্রভাবে এদেশের নিশ্চল ও মান্ধাতা আমলের জীবনধারায় এক বিরাট ধাক্কা লাগে। লোকের ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশের অবকাশ দেখা দেয়।

বিলেত থেকে এদেশে দলে দলে যেমন অর্থলোলুপ বণিক এবং অত্যাচারী সরকারি ও সামরিক কর্মচারীদের আগমন ঘটে, তেমনি আবার সেই ধারায় আসতে দেখা যায় অনেক বিদ্বান ও বুদ্ধিজীবীকে—পেশায় যাঁরা ছিলেন আইনজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাদ্রী, প্রশাসক, শিল্পী, সাংবাদিক ইত্যাদি। শেষোক্ত ধারায় যাঁরা আসেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন ইউরোপের রেনেসাঁস ও পরবর্তী বুদ্ধি-বিভাসিত আন্দোলনের ঐতিহ্যে পুষ্ট। তাঁদের সান্নিধ্য ও প্রভাবে এদেশের উচ্চবিত্ত ও শিক্ষিত কিছু মানুষের মনে বিজ্ঞানাশ্রয়ী চিন্তাভাবনা, যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, উদারনৈতিক ও বিশ্বজনীন মনোভঙ্গি সঞ্চারিত হয়। ইংরেজ শাসনের মূলে একদিকে ছিল অর্থনৈতিক শোষণ, অন্যদিকে এদেশে সেইসূত্রে প্রবর্তিত হয়েছিল পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। নবীন ভাবধারায় স্নাত এদেশের শিক্ষিত কিছু মননশীল মানুষের মধ্যে ধর্মবিচার, বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদির সঙ্গে দেখা দেয় সামাজিক প্রথানুসারী নিয়মনিগড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ. অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সমালোচনা। আধুনিক জীবনচেতনা ও রাজনৈতিক ভাবনাচিন্তা ক্রমে দানা বাঁধে। নবাগত সেই ভাবধারার উপাদান সমূহকে আয়ত্ত ও বিতরণের মধ্যে দিয়ে যেসব বিদ্বজ্জন সেদিন তৎপর হয়েছিলেন তাঁরা বঙ্গীয় রেনেসাঁস তথা দেশের নবজাগরণের বোধন করেন। বহুমুখী মনীষা ও প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী রামমোহন রায় ছিলেন এই নবজাগরণের প্রথম ও প্রধান নায়ক।

রামমোহন রায় ॥ ১৭৭৪—১৮৩৩

রামমোহন ও জার্মান দার্শনিক হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৯) অনতিকাল পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। ইউরোপে হেগেল এবং ভারতে রামমোহন থেকে সর্বাধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা শুরু হয়।

ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে লেখা এক পত্রে[১] সংক্ষেপে নিজের জীবনকথা প্রসঙ্গে রামমোহন লিখেছিলেন যে ষোল বছর বয়সে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক ('হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী') রচনা করায় পিতা ও আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ ঘটে; ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে দেশপর্যটনে বহির্গত হন। তার আগে বারো বছর বয়সকালে আরবি ও ফারসি শেখার জন্যে তাঁকে পাটনায় পাঠানো হয়। সেখানে আরবি ভাষায় তিনি ইউক্লিড ও অ্যারিস্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন এবং আরবিতে কোরান ও সুফি দার্শনিক কবিদের গ্রন্থ পাঠেরও সুযোগ ঘটে। এরপর হিন্দুশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়নের জন্যে তাঁকে তাঁর পিতা বারাণসীতে পাঠান। সেখান থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মন সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন থাকত। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচার সম্পর্কে তাঁর মনে তীব্র সংশয় উপস্থিত হয়। প্রথমে ইসলামের একেশ্বরবাদ এবং পরে হিন্দুধর্মের ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মনকে ভিন্ন পথে চালিত করে।

স্বগৃহে ফিরে আসার পর তিনি প্রাচীন শাস্ত্রচর্চায় রত হন। কিন্তু কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় তিনি গৃহ হতে বিতাড়িত হন। জীবিকার্জনের জন্যে তিনি রংপুরে কালেক্টর জন ডিগবির অধীনে সেরেস্তাদারের চাকরিতে যোগ দেন। পরে তিনি দেওয়ানীর পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রংপুরে অবস্থান (১৮০৯-১৮১৪) তাঁর জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পরস্পরের সাহায্যে উভয়ে একত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানবিদ্যা অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। বাইশ বছর বয়স থেকে রামমোহন ইংরেজি শিখতে শুরু করেন। কার্যোপলক্ষে রামমোহন রংপুর, ভাগলপুর, রামগড় প্রভৃতি স্থানে বসবাস করেন। রংপুরে অবস্থানকালে তিনি ইসলাম, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এ সময়ে তিনি নানা বিষয় ও শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বিতর্কে যোগদান করতেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সহায়তায় তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে গভীর অধ্যয়ন করেন।

ডিগবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকার ফলে একদিকে রামমোহনের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ঘটে ও সেইসঙ্গে তাঁর মনে রাষ্ট্রচিন্তার সূত্রপাত হয়। ডিগবির কাছে বিলেত থেকে বিস্তর পত্রপত্রিকা আসত। সেগুলি থেকে রামমোহন ইউরোপীয় রাজনীতির

খবরাখবর সাগ্রহে পাঠ করতেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসি বিপ্লবের সংবাদই তাঁর কাছে তখন সবচেয়ে ঔৎসুক্যের বিষয় ছিল।[২]

ইতঃপূর্বে ফারসিতে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' (A gift to Deists) প্রকাশিত হয় (১৮০৩-৪)। বইটিতে তিনি পৌত্তলিকতা ও বিভিন্ন ধর্মের প্রচলিত নানাবিধ মিথ্যাচার ও ভ্রান্তির কুফল দেখিয়েছেন। তাঁর সার্বভৌম ধর্মচিন্তাও এই সময় অঙ্কুরিত হয়। ১৮১৪ সালে কোম্পানির চাকরি ছেড়ে রামমোহন কলকাতায় চলে আসেন। পরের বছর তিনি 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন; উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিকতার চর্চা ও আলাপ-আলোচনা। আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তাঁকে ঘিরে দেশের গুণী-জ্ঞানীর এক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। যুগপৎ শক্তিশালী একটি বিরুদ্ধ পক্ষও যে গড়ে উঠেছিল সেকথাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

একেশ্বরবাদের প্রচারে রামমোহনের নেতৃত্ব দেশের বিদ্বৎসমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কেও তাঁর একটি বিতর্কমূলক গ্রন্থ চাঞ্চল্যের সূত্রপাত করে। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারি মার্শম্যান এবং পরে ডঃ টাইটলারের সঙ্গে তাঁর পত্রপত্রিকার মাধ্যমে প্রচণ্ড মসীযুদ্ধ লেগে যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রচলিত ত্রিত্ববাদ (Trinitarianism), খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, খ্রীষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি সম্পর্কে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাঁর বিতণ্ডা চলে। ঐসব তর্কযুদ্ধ রামমোহনের অনুকূল হয়। পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডাম নিজ মত পরিত্যাগ করে রামমোহনের সঙ্গে যুক্ত হন। অ্যাডামকে তাঁর 'ইউনিটারিয়ান মিশন' স্থাপনে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেন। খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্গত ইউনিটারিয়ানিজম পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমন্বয়ে ঈশ্বরের ত্রিত্ববাদী (Trinity) প্রত্যয়ের বিরোধী। তার মূলকথা হল ঈশ্বরের একতত্ত্ববাদ। ইউনিটারিয়ানদের মতে যীশু ছিলেন অন্যান্য মহান মানুষের মতো একজন। তাঁরা ঈশ্বরে ব্যক্তিত্ব আরোপের পরিবর্তে নৈতিক দৃষ্টিতে ধর্মে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সঞ্চারে বিশ্বাসী। ইংল্যাণ্ডে এঁরা চার্চের মণ্ডলীতে স্থান পেতেন না। আমেরিকায় তাঁরা অবশ্য স্বাধীন। এমার্সন, লংফেলো প্রমুখ অনেকেই এই মতাবলম্বী ছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইহবিমুখ এবং অযৌক্তিক আচারসর্বস্ব ধর্মের পরিবর্তে তাঁরা যুক্তিবোধ ও উদারনৈতিক আদর্শকে মানতেন। তাঁরা চাইতেন সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি নিপীড়িতদের মানব অধিকার অর্জন ও জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং সমাজসেবার সঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য ধর্মের সংযোগ। স্বভাবতই রামমোহন এই ধর্মীয় আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। তারই রেশ বজায় রেখে পরিশেষে তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন (আগস্ট ১৮২৮)।

রামমোহনকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়ে থাকে। বস্তুত তিনি ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মধর্ম নামে এক নতুন ধর্ম বা ব্রাহ্মসমাজ নামে নতুন একটা সম্প্রদায় গড়ে তোলার তাঁর কোনো অভিপ্রায় ছিল না।[৩] উক্ত সভার উপাস্য কি? উপাসক কে? এবং উপাসনার প্রণালী কি—এই সম্পর্কে সভার 'ট্রাস্ট ডীড' থেকেই সব কিছু পরিষ্কার জানা যায়। উপাস্য হলেন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা,

অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয় পরমেশ্বর। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যে-কোনো মানুষ সেখানে উপাসনার অধিকারী। উপাসনাপ্রণালী সম্পর্কে 'ডীড'-এ বলা হয়েছে যে কোনো প্রকার ছবি, প্রতিমূর্তি তথায় ব্যবহৃত হবে না ; নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোনো সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হবে না ; আহারপানাদি হবে না ; কোনো জীব, পদার্থ, মানুষ বা সম্প্রদায়ের উপাস্যকে বক্তৃতা বা সংগীতে শ্রদ্ধা, ঘৃণা বা উল্লেখ করা চলবে না। প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতিকল্পে এবং সর্বসম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্যে উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা, সংগীত ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। এক কথায় সভার উদ্দেশ্য সার্বভৌমিক উপাসনা।[৪]

সমাজসংস্কারকর্মে রামমোহনের ভূমিকা সুবিদিত। এদেশে নারীসম্প্রদায়কে সামাজিক নিষ্পেষণ থেকে তিনি মুক্ত করার প্রয়াসী হন। স্ত্রী-শিক্ষার সুযোগদানের বিষয়ে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। পৈতৃক সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁকে যথেষ্টই যত্নবান হতে দেখা গেছে। সহমরণ প্রথা রদের জন্যে রামমোহনের প্রয়াস ও আন্দোলনের নেতৃত্বে তিনি ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়েছেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন। তবে বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানা যায় না।

এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তারে রামমোহনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনাবশ্যক গুরুত্ব দেবার বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্স্টের নিকট লিখিত তাঁর পত্রটি ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল। শিক্ষাবিস্তারের তাগিদে তিনি নানাবিধ গ্রন্থের মধ্যে একটি ভূগোল ও একটি ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। বাংলা গদ্যরচনায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ মনে করা হয়। নানাধরনের কর্মতৎপরতার সুবিধার্থে রামমোহন চতুর্বিধ উপায় অবলম্বন করেন : ১. আলোচনা ও বিতর্কের আয়োজন ; ২. বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য পন্থায় শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা ; ৩. গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ ; ৪. সভা প্রতিষ্ঠা।[৫]

১৮২১ সালে রামমোহন 'সম্বাদকৌমুদী' ও *Brahmunical Magazine* নামে দুটি পত্রিকার প্রকাশন শুরু করেন। পরের বছর ফারসি ভাষায় 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার' নামে আর একটি পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকা দুটির সাহায্যে তিনি সহমরণ-প্রথা ও অন্যান্য কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালান। ১৮২৩ সালে জন অ্যাডাম নামক জনৈক সিভিলিয়ান অস্থায়ীভাবে গবর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। সমকালীন দেশি ও বিদেশিদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রে সরকারি ক্রিয়া-কলাপের সমালোচনা থাকত বলে জন্ অ্যাডাম সাধারণের অজ্ঞাতসারে একটি অর্ডিনান্স জারি করেন। সংবাদপত্রের এরূপ স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। কোনো ফল না হওয়ায় বিলেতে সম্রাটের কাছেও এর বিরুদ্ধে এক গণস্বাক্ষর সমন্বিত প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন।[৬] এবং প্রতিবাদ

হিসাবেই তিনি তাঁর 'মীরাৎ'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। ১৮৩৫ সালে মেকলের সাহায্যে লর্ড মেটকাফ ঐ প্রেস-আইন উঠিয়ে দিয়ে জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হন।

বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে নেতৃত্বদানই রামমোহনের একমাত্র পরিচয় নয়। তাঁর প্রতিটি তৎপরতার পিছনে থাকত সুস্পষ্ট দার্শনিক সমর্থন। বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ে তিনি কুপ্রথা ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেন। পাশ্চাত্ত্য সমাজদর্শন ও বিজ্ঞান তিনি নিষ্ঠাসহকারে পড়েছিলেন। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ চিন্তা এবং মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বৈশিষ্ট্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

স্বনামে ও বেনামে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় রচিত রামমোহনের মোট গ্রন্থসংখ্যার সঠিক হিসাব পাওয়া দুষ্কর। কমপক্ষে আশিটি গ্রন্থের মধ্যে ৩১টি বাংলা ও ৪৬টি ইংরেজি। তার মধ্যে বেশ কয়েকটি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রকাশিত। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা যে-সব গ্রন্থ অথবা পুস্তিকায় পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৮টি।*

ইউরোপ ভ্রমণের তাঁর এক দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল। এ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> এই সময়ে ইউরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। যাহা হউক যে পর্য্যন্ত না আমার মতাবলম্বী বন্ধুগণের দল বৃদ্ধি হয় সে পর্য্যন্ত আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে ক্ষান্ত থাকিলাম।

সম্ভবত ইউনিটারিয়ানদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করাই তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এই সমুদ্রযাত্রাই সেদিন ছিল এক মস্ত বৈপ্লবিক কাজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে আধুনিক কালে তিনি এক সাংস্কৃতিক সেতু নির্মাণ করেন।

দিল্লির মোগল সম্রাট শাহ আলমের দৌত্যকর্মে তাঁর ইউরোপ যাবার সুযোগ ঘটে। নইলে সুযোগ আর হয়ত পেতেন না, কারণ ইদানীং আর্থিক অবস্থা তাঁর বিশেষ অনুকূল ছিল না। বিলেত যাত্রার কারণ হিসাবে তিনি বলেন—

> পরিশেষে আমার আশা পূর্ণ হইল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নূতন সনন্দ

* 1. Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance (1822); 2. Petitions against the Press Regulation to the Supreme Court and to the King in Council (1823); 3. A Letter to Lord Amherst on English Education (1823); 4. Final Appeal to the Christian Public (1823); 5. Brief Sketch of the Ancient and Modern Boundaries and History of India (1832); 6. Questions and Answers on the Judicial and Revenue Systems of India .. (1332); 7. Remarks on Settlement in India by Europeans (1831); 8. Speeches and Letters.

বিষয়ে বিচারদ্বারা ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবর্ষবাসীগণের প্রতি গবর্নমেন্টের ব্যবহার বহুকালের জন্য স্থিরীকৃত হইবে ও সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল শুনা হইবে বলিয়া আমি ১৮৩০ সালে নবেম্বর মাসে ইংলন্ডে যাত্রা করিলাম। এতদ্ভিন্ন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাটকে কয়েকবিষয়ে অধিকারচ্যুত করাতে ইংলন্ডের রাজকর্ম্মচারী-দিগের নিকট আবেদন করিবার জন্য তিনি আমার প্রতি ভারার্পণ করেন।[৭]

বিলেত যাবার আগেই রামমোহনের নাম ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। বিলেতে পেঁছনর পর তিনি সেখানকার বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সংবর্ধনা লাভ করেন। উইলিয়াম রস্কো, জেরেমি বেনথাম প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। বিভিন্ন বিষয়ে সেইসব চিন্তানায়কদের সঙ্গে তিনি গভীর আলোচনা ও বিতর্কে যোগ দিতেন। সমাজতন্ত্রবাদের আদিগুরুরূপে অভিহিত রবার্ট ওয়েনের নিরীশ্বরবাদী চিন্তার জন্যে উভয়ের মধ্যে এক বিতর্ক হয়। ঐসময় রামমোহনের সম্মানার্থে লন্ডনের ইউনিটারিয়ানরা এক মহাসভার আয়োজন করেন। লিভারপুল ও লন্ডনে তাঁকে জনসংবর্ধনা জানানো হয়।

হাউস অব কমন্স নিয়োজিত এক কমিটির কাছে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা ও রাজস্ব সম্পর্কে তিনি তিনটি স্মারকপত্র পেশ করেন। চতুর্থ উইলিয়ামের অভিষেক অনুষ্ঠানে রামমোহনকে বৈদেশিক রাজদূতের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু বক্তৃতা ও বিবৃতিদান করেন। সহমরণ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে আনীত একটি আবেদন তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে পার্লামেন্টে নাকচ হয়ে যায়। কোম্পানির আসন্ন নতুন সনদে রামমোহন ভারতীয়দের সুবিধার্থে যে-সব সুপারিশ করেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই অনুমোদন লাভ করে।

ইতিমধ্যে তিনি বিপ্লবের পুণ্যপীঠ ফরাসিদেশ পর্যটনে যান। সেখানে তিনি যথেষ্ট সংবর্ধনা ও রাজসম্মান অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর সেখানকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রামমোহনকে পার্লামেন্টের নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু সে-অনুরোধ রক্ষার আগেই ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ধর্মচিন্তা

সুফি ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে রামমোহন পাটনায় আরবি ও ফারসি শিক্ষাকালে ইসলামী ভাবধারায় অবগাহন করেন। মূল কোরান থেকে শুরু করে ইসলাম ধর্মের আচার-বিচার সম্পর্কিত যাবতীয় গ্রন্থ তথা অন্যূন ৬৩টি মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শে জ্ঞানসঞ্চয় করেন। মনে করা হয় যে এই সময়ে মুসলমান ইউনিটারিয়ান চিন্তার প্রভাবেই উত্তরকালে তাঁর মনে একেশ্বরবাদের আদর্শ ঘনীভূত হয়। ইসলামের

মূল ধর্মাদর্শচ্যুতি এবং পরবর্তী কালে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণা ও কুপ্রথা নিপুণভাবে দেখানোর ফলে তাঁকে 'জবরদস্ত মৌলবী' আখ্যা দেওয়া হয়।

এরপর বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকালে তিনি হিন্দুশাস্ত্রসমূহ মন্থন করেন এবং বিশেষ করে স্মৃতি ও উপনিষদ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। উপনিষদ একেশ্বরবাদ তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। পরে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের নিষ্কর্ষও তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে।

কর্মজীবনে তিনি খ্রীষ্টধর্ম অধ্যয়নের এক বিরাট সুযোগ পান। হিব্রু ও গ্রীক ভাষায় সমগ্র বাইবেল ছাড়াও ইহুদি ও পার্শি ধর্মশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলি পাঠ তথা সেমিটিক সংস্কৃতিধারার সম্যক পরিচয় লাভ করেন। খ্রীষ্টধর্মের মূলশাস্ত্র বহির্ভূত আচার, অনুষ্ঠান ও চিন্তা সম্পর্কে সমালোচনা করায় তাঁর সঙ্গে পাদ্রীদের বিরোধ দেখা দেয়। এরপর তিনি তুলনামূলক ধর্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। পশ্চিমী সংস্কৃতির অগ্রগতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও শিল্পোন্নয়ন এবং যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি শুধুমাত্র ধর্মদর্শনের বাতবিতণ্ডায় আবদ্ধ না থেকে সামাজিক আচারানুষ্ঠানের বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও সংস্কারকর্মে মনোনিবেশ করেন। আইন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্বে গভীর অধ্যয়ন তাঁকে সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার তুলনামূলক বিচারে উদ্বুদ্ধ করে। বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন—

> 'জীবনকে সতেজ, কর্মকে সার্থক এবং ধর্মকে ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার আর অন্যদিকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৮]

তাঁর কাছে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না; দুটিকেই তিনি মনুষ্যজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে জ্ঞান করতেন। তাঁর কথায়—

> ....the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling.......It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.[৯]

তুহফাৎ পুস্তিকাটিতে রামমোহনের যুক্তিবাদী মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে। ইসলামের যুক্তিবাদী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তিনি সার্বভৌম একেশ্বরবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছন। শাস্ত্রপ্রমাণ তার কাছে বাতিল হয়ে যায়। প্রচলিত কোনো ধর্ম, শাস্ত্র বা ধর্মগুরুকে তিনি অভ্রান্ত বলে মেনে নেন নি। বরং

প্রত্যেক ধর্মের মূল তত্ত্বের সঙ্গে কালপর্যায়ে বহু কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অলৌকিক উপাখ্যান ও যাজকতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটায় বিশ্বাসীরা প্রবঞ্চিত হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখিয়েছেন যে তুহফাৎ-এর উপসংহারে রামমোহন অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস সম্পর্কে মানুষকে চারটি দিক থেকে বিচার করেছেন : ১. প্রতারক ; ২. প্রতারিত ; ৩. প্রতারক ও প্রতারিত , এবং ৪. প্রতারকও নয়, প্রতারিতও নয়। কুসংস্কারের ঐতিহাসিক কারণের পরিবর্তে তিনি মনস্তাত্ত্বিক কারণ দর্শিয়েছেন। তবে সকল কিছুর মধ্যে তিনি সৃষ্টিকর্তা মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। তাঁর মতে সকল ধর্মেরই মূলে সেই জগৎকর্তার অবস্থিতি স্বীকৃত।[১০] উত্তরকালে শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বদলায়। তিনি বলেন যে ধর্মের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে শাস্ত্রীয় সত্য ও যুক্তি— দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। বিতর্কে উভয়কেই তিনি সমান গুরুত্ব দেন।

রামমোহন বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসার গ্রন্থের এবং তলবকার (কেন), ঈশা, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য— এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচার করেন। এই প্রচেষ্টার সম্ভাব্য উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন যে দেশের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই রাজা ঐকাজে উদ্যোগী হন ; ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠা করাই রাজার শাস্ত্রপ্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

দার্শনিক সিদ্ধান্তে রামমোহন শংকরের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদী চিন্তায় অংশত প্রভাবিত হন। বেদান্তের শাংকর-ভাষ্যের সাহায্যে তিনি বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদের পরিপোষক অসম্প্রদায়গত একতত্ত্ববাদ ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তনের পথ খুঁজে পান। রামমোহনকেও তাই মায়াবাদী প্রত্যয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে দেখা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ রামমোহনের কাছে জগৎসংসারের গুরুত্ব কম ছিল না। বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রের সাহায্যে রামমোহন মায়াবাদের সঙ্গে সামাজিক প্রগতির সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসী হন। শংকরের অদ্বৈত বেদান্তসম্মত মায়াবাদের সঙ্গে তন্ত্রব্যাখ্যাত মায়াবাদের পার্থক্য মৌলিক। তন্ত্রে মায়াপ্রসূত জগৎ নিত্য ও সত্য এবং তাতে জীবন অস্বীকৃত নয়।[১১]

ধ্যান ও উপাসনায় গুরুত্ব দিলেও মোক্ষলাভের পূর্বে নিষ্কাম কর্মকেও রামমোহন সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রহ্মজ্ঞাতার কাছে নিষ্কাম কর্ম ও অকর্ম, আশ্রম ও অনাশ্রম উভয় পথই তিনি দেখিয়েছেন। জীবাত্মা ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পরিমিশ্রণ লক্ষণীয়।[১২]

হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টধর্মের যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করে রামমোহন এক সমন্বয়কারী ঐকমত্যের সন্ধান পান। সকল ধর্মেরই মূল আদর্শ মানবপ্রীতি, সত্যের সন্ধান, সদাচার ও জগৎকর্তার উপাসনা। কিন্তু ভৌগোলিক, নৃতাত্ত্বিক ও জলবায়ু-সম্পৃক্ত কারণে তাদের আচার ও অনুষ্ঠান, প্রতীক ও পদ্ধতি ভিন্ন। এবং মূল ধর্মাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে সবাই পরবর্তী কালে নানা সংস্কার ও ভ্রান্ত বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

রামমোহন সর্বধর্মমতাবলম্বীদের মৈত্রীবন্ধনে আবন্ধ করার প্রয়াসী হন। প্রচার করেন তাঁর সার্বভৌমিক ধর্মীয় মতবাদ। কিন্তু কোনো ধর্মের বৈশিষ্ট্যকেই তিনি আঘাত করতে চান নি। কিংবা বিভিন্ন ধর্মের অবলুপ্তি বা তাদের একীভূত করতে চান নি। ফলে দেশের সকল পাদ্রী, পণ্ডিত ও মৌলবীরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তখন তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামিকে খর্ব করার জন্যে সেইসব ধর্মের মূল আদর্শ সমূহ তুলে ধরা। সে বিষয়ে তিনি তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন—

১. বিভিন্ন ধর্মের মূল আদর্শের বিচ্যুতি ঘটায় উদ্ভূত কুসংস্কার ও কুপ্রথা এবং ধর্মীয় বিদ্বেষ, সংঘাত ও বৈরিতার নিরসন।
২. বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্বীয় মত ও পথে জীবন নির্বাহ করবেন। সেগুলির অবলুপ্তি বা পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তি ঘটবে না। কিন্তু তাঁরা পারস্পরিক সংযোগ, একাত্মবোধ, সহিষ্ণুতা ও সাহচর্যের মধ্যে দিয়ে বিকশিত হয়ে এক মহামানবজাতি গঠনে সহায়ক হবেন।
৩. ধর্মীয় 'অথরিটি' যেক্ষেত্রে মানুষের আহারবিহার, বিবাহ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে অহেতুক উৎপীড়নের কারণ হিসাবে বিবেচিত সেখানে মানুষকে 'greatest good of the greatest number'-এর নীতিতে মুক্তি দিতে হবে। প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী মানুষকে দিতে হবে চিন্তার পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা। সার্বজনীন মঙ্গলের দৃষ্টিতে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে ধর্মই সামঞ্জস্য বজায় রাখবে। সমাজ ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে অভিব্যক্ত দিব্য সত্য ও স্বীয় ধর্মমত বজায়ের অধিকার সাপেক্ষ হিন্দুর 'স্মৃতিশাস্ত্র', ইসলামের 'শরিয়ৎ' ও খ্রীষ্টধর্মের 'ক্যানন'-গুলির সমন্বয়ে সর্ববাদীসম্মত এক সার্বভৌম বিধিব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।[১৬]

রা ষ্ট্র দ র্শ ন

রামমোহনকে আধুনিক ভারতের প্রথম রাষ্ট্রদার্শনিক বলা যায়। শুধু আধুনিক যুগই বা কেন—মধ্যযুগেও যখন ভারতে দর্শনচিন্তার উৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায় তখনও রাষ্ট্রদর্শন বা তত্ত্বে বিশেষ আগ্রহ লক্ষিত হত না। কারণ সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রাত্যহিক ও প্রত্যক্ষ কোনো সংবাদ ছিল না; ব্যক্তিস্বাধীনতা বা পরিশীলিত জনমতেরও কোনো প্রশ্ন ও প্রয়োজন ছিল না—রাষ্ট্রনীতি ছিল শাসনকর্তাদেরই একচেটিয়া বিষয়। জনজীবনে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজেরই ছিল প্রাধান্য। ছোট ছোট জনপদগুলির অস্তিত্ব ছিল স্বায়ত্তশাসিত ও পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ার পর চরম বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়। দেশের মানুষ তাই নিষ্কুণ্ঠচিত্তে ইংরেজদের স্বাগত জানিয়েছিল। ইংরেজরা এখানে যতই শোষণ ও অত্যাচার করে থাকুক না কেন

তারা দেশটিকে ভগ্নদশা থেকে উদ্ধার করে সুশৃংখলার মধ্যে দিয়ে সুসংবদ্ধ করে তোলে। ক্রমে জাতীয়তাবাদের ভূমিকে তারাই করে তোলে উর্বর। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের গতিহীন ধারার সঙ্গে স্রোতস্বিনী আধুনিকতার সংযোগ সাধন করে। প্রসঙ্গত মার্কসের একটি উক্তি স্মর্তব্য —

> England, it is true, is causing a social revolution in Hindostan, was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crimes of England she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution.[১৪]

রামমোহনের রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রণালী ছিল আরোহী (Inductive)—অর্থাৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর ভিত্তি করে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিষ্ঠিত; সাধারণভাবে পূর্বচিন্তিত সিদ্ধান্ত এবং জ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে অবরোহী (deductive) পদ্ধতিতে সুসংবদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ব তিনি রচনা করেন নি। নানা সূত্রে লিখিত প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, স্মারকলিপি অথবা বক্তৃতায় তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ ব্যক্ত করেছেন।[১৫]

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদার্শনিকদের মধ্যে বেনথাম ও মঁতেসকিয়োর চিন্তাই তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করে। মঁতেসকিয়োর প্রভাবেই শাসন ক্ষমতার পৃথকীকরণ (Separation of Powers) এবং আইনের শাসন (Rule of Law) সম্পর্কিত ধারণা তাঁর বহু লেখায় পাওয়া যায়। বেনথামের প্রভাবেই তিনি প্রকৃতিদত্ত অধিকার প্রত্যয় মানতেন না। এবং সেই প্রভাবেই তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন। তিনি সামাজিক ও ফৌজদারি আইনকানুন প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন এবং স্বীয় নীতি বিবৃত করেন। তাঁর সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টায় বেনথামের হিতবাদী (Utilitarian) প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে বেনথামের সঙ্গে একটা বিষয়ে তাঁর পার্থক্য ছিল এই যে বেনথাম মনে করতেন যে দুনিয়ার সব জাতই দেশ, কাল, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্বিশেষে মূলত একই ধারায় গঠিত—যে-কোনো দেশের মানুষকেই একই আইন দ্বারা চালিত করা যায়। পক্ষান্তরে রামমোহন বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বের সকল মানুষের জীবন একই ধাঁচের আইনে চলতে পারে না; প্রত্যেক দেশেরই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে আইন কানুন রচিত হওয়া উচিত। আইনের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি বিরোধী মত আছে। একদল মনে করেন ধর্ম ও সমাজের ক্রমবিবর্তনে আইন স্বাভাবিকভাবে ও স্বতঃই প্রচলিত হয়। এই দলের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্যাভিগ্নি ও মেইন। পক্ষান্তরে অন্যদল মনে করেন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশে বিচার বা ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে আইন উদ্ভূত হয়।

এদলের প্রধান সমর্থক ছিলেন অস্টিন। প্রথমোক্ত দল শেষোক্ত মতকে অস্বীকার করেন নি। তবে তাঁরা মনে করতেন যে প্রচলিত রীতিনীতি বা আইনকানুনকে সার্বভৌম শক্তি বা সংস্থা অনুমোদন বা পরিমার্জন করে থাকেন। তবে সব সময়েই তা মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। রামমোহন প্রথমোক্ত প্রতীতির সমর্থক—

In every country, rules determining the rights of succession to and alienation of property first originated in the conventional choice of the people, or in the discretion of the highest authority, secular or spiritual, and those rules have been subsequently established by the common usage of the country, and confirmed by judicial proceedings.[১৬]

সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীনের আইন প্রণয়নের অধিকারকে রামমোহনও অস্বীকার করেন নি। তবে মানুষের দীর্ঘদিনের প্রচলিত কোনো বিধিব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করে স্মৃতিকার বা আইনসভার কোনো কিছু করা অনুচিত বলে তিনি মনে করতেন। যুক্তিনির্ভর চিন্তা ও জনকল্যাণকর দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি আইনের মানদণ্ড করেন। সেজন্যে তিনি একথাও বলছেন—

But I am satisfied that an unjust precedent and practice, even of longer standing, cannot be considered as the standard of justice by an enlightened government.[১৭]

আগেই বলা হয়েছে যে রামমোহন নীতি (morality) ও আইনকে পৃথকভাবে দেখেন। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে আইন বহু ক্ষেত্রেই নীতিমুখী হয় না[১৮] এবং স্থান, কাল, অবস্থা, প্রয়োজন ও কার্যকারিতার দিক থেকে সম্ভবও নয়। কথাটা উঠেছিল বাংলাদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ' প্রথার নৈতিক উপযোগিতা প্রসঙ্গে। প্রস্তাব উঠেছিল যে ঐ-প্রথা অনুযায়ী সন্তান-সন্ততিদের বঞ্চিত করে পিতার সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করার অধিকারকে নৈতিক দিক থেকে বেআইনী করা হোক। রামমোহন তখন নজির দেখিয়ে বলেন যে অকল্যাণকর অনেক আইন যেখানে যেকারণে বলবৎ আছে ঠিক সেইদিক থেকেই 'দায়ভাগ' প্রথা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। এখানে রামমোহনের সঙ্গে হিতবাদী বেনথামের মতভেদ সুপরিস্ফুট।

ভারতের সাংবিধানিক ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। আইন ও সংবিধান সম্পর্কে তিনি গভীর অধ্যয়ন করেন। ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন সংবিধান বিশেষজ্ঞ উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোনের চিন্তা তাঁকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে।[১৯]

ভারতের প্রশাসন সম্পর্কে দুটি মত ছিল। একদল বলতেন যে ভারতীয় প্রশাসন ভারতে অবস্থিত একটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাহ হওয়া ভাল। অপরদলের অভিমত ছিল যে ভারতের প্রশাসন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনেই অধিক কল্যাণকর হবে। রামমোহন শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অবশ্য তাঁর চিন্তা ও যুক্তি অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।[২০]

রামমোহন বেনথামের প্রভাবেই এই মত পোষণ করতেন যে আইন ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সার্বভৌম শক্তির উপর বর্তায়। ভারতে গবর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা সীমিত। রাজা ও পার্লামেন্টের ক্ষমতাই চূড়ান্ত। তাই তিনি সরাসরি পার্লামেন্টের অধীনে থাকা পছন্দ করতেন। তার সমর্থনে অনেক যুক্তিই তিনি দেখিয়েছিলেন। পার্লামেন্ট ইংল্যান্ডের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, সেখানকায় জনসাধারণের মনে ভারতের প্রতি দরদ পার্লামেন্টেই প্রতিফলিত হতে পারে। এছাড়া আইন প্রণয়নকারী (legislative) এবং আইন প্রয়োগকারী (executive) পৃথক থাকা কাম্য।[২১] সেজন্যে আইন প্রয়োগকারী ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ আমলাদের উপর আইন রচনার ক্ষমতাদান পরিণামে ক্ষতিকর হবে বলে তিনি মনে করতেন। এদেশে প্রেরিত আমলাদের ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও আক্রোশ আইন রচনার মধ্যে দিয়ে ফুটে বেরুবেই। যেমন, অ্যাডামের প্রেস অর্ডিনান্স। কাজেই আইন প্রণয়নের দায়িত্ব ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের উপরই ন্যস্ত থাকা সমীচীন। ভারতে কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব এবং শাসনও অবশ্য তিনি চান নি। তবে প্রশাসনের সুবিধার্থে তত্ত্বাবধান ও ভারসাম্য বজায় রাখার রাখার জন্যে কোর্ট অব ডিরেক্টর্স ও বোর্ড অব কন্ট্রোলের যুগপৎ অস্তিত্বের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন—যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও স্বৈরাচার না ঘটে। এ কথা রামমোহন অনুভব করতেন যে সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ভারতের প্রশাসনে প্রত্যক্ষ সংযোগের অভাবহেতু নানা অসুবিধা দেখা দেবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের জন্যে আইন রচনা সম্পর্কে তিনি তিনটি অভিমত জানিয়েছিলেন—

১. সংবাদপত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা চাই। দেশোপযোগী কল্যাণকর আইন প্রবর্তনের সুবিধার্থে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকারিতার দিক থেকে তিনি চারটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন :

ক. দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে জনসাধারণের মতামত সরকারের নিকট গোচরীভূত করার সুবিধা এবং সরকারের দিক থেকেও জনমত নির্ণয় করার পক্ষে সংবাদপত্রই শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে জনমত সুস্পষ্টরূপে জানা যায় না।

খ. জনসাধারণ তাদের অসন্তোষ সংবাদপত্রের সাহায্যে ব্যক্ত করে তার প্রতিকার চাইবে। কিন্তু অসন্তোষ প্রকাশের কোনো মাধ্যম না থাকলে সেগুলির সুরাহা হবে না। ফলে বিক্ষোভ দেখা দেবে।

গ. ভারতে সরকার জনসাধারণের উপর কোনো উৎপীড়ন সৃষ্টি করলে এখানকার অধিবাসীরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে তা অনায়াসেই ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের গোচরীভূত করতে সক্ষম হবে।

ঘ. কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের পক্ষেও এক মস্ত সুবিধা থাকবে যে তাঁরাও আইনকানুন ও বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে ভারতীয় জনমনের প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন।

২. দ্বিতীয় পন্থা স্বরূপ রামমোহন বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কমিটি বা কমিশন গঠনের সুপারিশ করেন। কমিটি বা কমিশনের সাহায্যে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের অভিমত দ্রুত ও প্রত্যক্ষভাবে জানতে পারবেন। এর সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা সরকারের উদ্যোগে সংবাদপত্র প্রকাশন। শেষেরটিকে রামমোহন গুরুত্ব দেন, কারণ তাতে জটিলতা ও ব্যয়বাহুল্য কম।

৩. ভারতের জন্যে পার্লামেন্টের কল্যাণকর আইন প্রস্তুতির প্রয়োজনে জনমত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তৃতীয় যে পন্থাটি তিনি সুপারিশ করেছিলেন সেটি হল বিত্তবানদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মতামত জানার ব্যবস্থা। রামমোহন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে সরকারকে প্রশাসন সম্পর্কে তাঁদের পরামর্শ নিতে সুপারিশ করেন। ঐসব ব্যক্তির মতামতসহ খসড়া-আইন পার্লামেন্টের অনুমোদনের জন্যে ভারত সরকারের প্রেরণ করা উচিত।[২২]

রামমোহনের এইসব মতামত ও সুপারিশ প্রকারান্তরে দাঁড়ায় যে আইনের খসড়া তৈরি করবেন ভারত সরকার; সেগুলি সম্পর্কে মতামত জানানো ও সমালোচনার অধিকারই কেবল ভারতীয়দের থাকবে; আইনকে চূড়ান্তভাবে বিধিবদ্ধ করবেন বিলেতের পার্লামেন্ট। রামমোহনের এই মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল। বস্তুত তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। নইলে যে-মানুষ অন্যান্য দেশের নিয়মতান্ত্রিক উন্নতি দেখলে উল্লসিত হতেন, তিনি কি স্বদেশের জন্যে তা চাইতেন না? বাস্তব দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেন যে এদেশের জনগণ অশিক্ষায় আচ্ছন্ন, দেশাত্মবোধের চিহ্ন অপরিস্ফুট; দেশ বিদেশিদের করতলগত; এমতাবস্থায় সরকারি আমলাদের উপর নিয়মতন্ত্রের ভাগ্যভবিষ্যৎ ন্যস্ত থাকলে স্বেচ্ছাতন্ত্রেরই হবে আধিপত্য। তাতে মনোনীত মুষ্টিমেয় ভারতীয় প্রতিনিধিরা হবেন ঠুঁটো জগন্নাথ। সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকাই তাঁর কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়েছিল।

১৮৩৩ সালে কমন্স সভায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদেয় চার্টার সংশোধিত ও গৃহীত হয়। তার আগে ভারতীয় প্রশাসনের আনুপূর্বিক পর্যালোচনার সময় সিলেক্ট কমিটি প্রশাসন, রাজস্ব, বিচারব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে রামমোহনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। রামমোহনের আশংকা ছিল যে এদেশে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল গঠিত হলে আমলাতান্ত্রিক বিচার বিভাগ তার উপর খবরদারি করবে। তাই তিনি আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসনকে পৃথক করতে চান।

অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রশাসনে নিয়োগের তিনি তীব্র আপত্তি জানান এবং চুক্তিবদ্ধ চাকরিতে অনূন বাইশ বছর বয়সের লোকদের নিয়োগ করাই ছিল তাঁর অভিমত।[২৩] কমিটিতে একটি কথায় তিনি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন যে বিচারকালে ব্যবহৃত ভাষা বিচারাধীন ব্যক্তিদের নিকট অবোধ্য হওয়াটা অবিচারের নামান্তর। আদালতের খবর প্রকাশের উপযুক্ত কোনো সংবাদপত্রও নেই। বরঞ্চ পঞ্চায়েতের সাহায্যে জুরিগণের দ্বারা বিচারকার্য পরিচালন সাধারণের

পক্ষে অনেকাংশে উপযোগী। অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও উকিলদের নিয়ে জুরি গঠন করা উচিত। ভারতের মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানকার ফৌজদারি আইন পৃথকভাবে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং সেটা হওয়া দরকার সরল, সোজা ও সহজবোধ্য। শাসক ও শাসিতদের সুবিধার্থে তিনি বিচার পদ্ধতির সংস্কার দাবি করেন। ১৮২৬ সালের মে মাসে প্রবর্তিত জুরি আইনে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য ফুটে ওঠে। তাতে কোনো খ্রীষ্টানকে হিন্দু, মুসলমান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী জুরি বিচার করতে পারতেন না। ১৮২৬ সালের নভেম্বরে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পার্লামেন্টের নিকট একটি স্মারকপত্র পাঠানো হয়। রামমোহন ছিলেন সেই আন্দোলনকারীদের প্রধান প্রবক্তা।

মুক্তির প্রত্যয়

মানুষের সহজাত অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় রামমোহন বিশ্বাস করতেন। তাঁর অধিকারতত্ত্ব ভারতীয় ভাবধারার সামাজিক ও সার্বজনীন কল্যাণ-প্রত্যয়েই দানা বাঁধে। অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সহজাত অধিকারের সমর্থনের সঙ্গেই তিনি সমাজসংস্কার ও শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রচেষ্টার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃতিগত অধিকারের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক মানবিক কল্যাণই ছিল তাঁর কাম্য, মূলত তিনি ছিলেন মুক্তির সাধক। তিনি লিখেছেন—

> If mankind are brought into existence, and by nature formed to enjoy the comforts of society and the pleasure of an improved mind, they may be justified in opposing any system, religious, domestic or political, which inimical to the happiness of society or calculated to debase the human intellect.[২৪]

সৃজনী সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশ ও মুক্তির তিনি সমর্থক ছিলেন ; সকলকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় অর্জনে উৎসাহ দিতেন। অযৌক্তিকতা ও কুসংস্কারের মূলে তিনি নিয়তই আঘাত করেন। ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তির সঙ্গেই জাতীয় মুক্তির চেতনাও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক বাকিংহামকে লিখিত এক পত্রে তিনি ইউরোপীয় ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তির অনিবার্যতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন। গ্রীক ও নিয়পলিটানদের মুক্তি সংগ্রামকে তিনি অভিনন্দিত করেন। ১৮২১ সালে নেপল্‌সে স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংবাদে তিনি বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। স্পেনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর রামমোহন কলকাতায় এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ফরাসি বিপ্লবেরও তিনি ছিলেন অত্যন্ত অনুরাগী।

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন রামমোহনের আমলে অচিন্তনীয় ছিল।

রাজনৈতিক বিষয়ে সাধারণ মানুষ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নিস্পৃহ। শিক্ষিত ও সচেতন সম্প্রদায়ও তখন দানা বাঁধে নি। লোকের মনে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার বিভীষিকা বিরাজ করত। তাদের তখন একমাত্র কাম্য ছিল সুবিচার এবং জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। ইংরেজদের আসার পর থেকেই লোকে এই নিরাপত্তার আস্বাদ পায়। তাই মানুষ নির্বিশেষে সবার কাছেই ইংরেজরা ছিল শান্তির দূত। মুক্তি অর্থে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বিপাক এবং নানাবিধ উৎপীড়ন থেকে নিস্তার। রামমোহনের কাছে মুক্তির প্রত্যয় ছিল তদুপরি আরও গভীর ও ব্যাপক। সে-চিন্তায় জাতি, সম্প্রদায় ও দেশের কোনো সীমানা ছিল না। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি সকল দেশের বিভিন্ন চরিত্রের মুক্তিসংগ্রামকে তিনি শুভেচ্ছা জানাতেন। পশ্চিমী দেশগুলির গণতান্ত্রিক মুক্তি একদিন ভারতের শৃঙ্খলমোচন করবে বলে তাঁর আশা ছিল। আন্তর্জাতিকতা ও জাতিসংঘের চিন্তাও রামমোহনের মনে অঙ্কুরিত হয়।

দেশ যেখানে পরাধীন সেখানে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রত্যাশা অলীক। দেশের চরম দুর্গতি ও অরাজকতা দৃষ্টে রামমোহন ইংরেজদের আগমনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ভারত বেশ কিছু লাভ করেছে—বিশেষ করে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। শিবপ্রসাদ শর্মার ছদ্মনামে লেখা প্রবন্ধেও তিনি ঐ কথা বলেন। পরমেশ্বরকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান এই বলে—

> ....for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former rulers and placed it under the Government of the English, a nation who not only are blessed with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves in promoting liberty and social happiness, as well as free enquiry into liberty and religious subjects, among those nations to which that influence extends...[২৫]

রামমোহন বিলেতে সম্রাটের কাছে এক আর্জিতে বলেছিলেন যে মোগলযুগে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানরা যেসব সুযোগসুবিধা ও অধিকার পেত তা যেন ইংরেজ আমলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেজন্যে তিনি বেশ কিছু সুপারিশও করেছিলেন। যে-মানুষকে নবভারতের পথপ্রদর্শক বলা হয় এবং যিনি অন্যান্য দেশের মুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন—সেই মানুষই যখন এদেশে ইংরেজ-শাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন তখন কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রামমোহন দেশকে ভালবাসতেন। নবীন ভারতের তিনি প্রথম স্থপতি। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতার দিক থেকে তাঁকে পুরোধারূপে স্বীকৃতি দিতে অনেকেই নারাজ। তাঁদের মতে—শিখ, মারাঠা প্রভৃতি জাতি যখন ইংরেজদের বিতাড়নে কৃতসংকল্প সে-সময়ে তিনি ইংরেজদের আবাহন জানিয়েছেন।

রামমোহনের সমর্থনে ঐ সময়ের রাজনীতি ও সমাজচিত্রের সঠিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিখ ও মারাঠাদের সংগ্রাম ভারতের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক শক্তি ও আধিপত্যের শেষ বিস্তার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়—মরিয়া হয়ে তারা অস্তিত্ব ও আত্মরক্ষার চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তির শেষ পরাজয় ঘটে সিপাহি বিদ্রোহে (১৮৫৭)। তার মধ্যে না ছিল জাতীয় আবেগ, না কোনো গণমুক্তির আদর্শ।[২৬] ইতিহাসের কষ্টিপাথরে প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু সেই সামন্ততান্ত্রিক শক্তির মাথা চাড়া দিয়ে ওঠাকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী রামমোহন যে সমর্থন করবেন না সেকথা সহজেই অনুমেয়। জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে যে প্রস্তুতির প্রয়োজন থাকে তার কোনো পরিচয় বা অনুকূল পরিবেশ ছিল না। রামমোহন চেয়েছিলেন অন্ধকারে নিমজ্জিত মুমূর্ষু জনমনকে উদ্ভাসিত করতে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশের পুনরুজ্জীবনের তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন—সেদিক থেকে তাঁকে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক মডারেট বলা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক দেশগুলির স্বাধীনতা যে একদিন আসবে সে বিশ্বাস তাঁর ছিল। দেশের গঠনমূলক অভ্যুন্নতির সুবিধার্থেই তিনি ইংরেজদের আবাহন জানান। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তীব্র সমালোচনা করতে তিনি পিছপা হন নি। তিনি এদেশে অত্যাচারী ইংরেজের পরিবর্তে সদয়, শিক্ষিত ও ধনী ইংরেজদের বসবাস চেয়েছিলেন—যাতে প্রয়োজনীয় মূলধন বিনিয়োগের দ্বারা এদেশে শিল্পবিপ্লব সাধিত হতে পারে। কিন্তু এদেশ থেকে মুনাফা চালান দেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। ইংরেজদের Benevolent Despotism-এর প্রথম কথাটিকে তিনি আবাহন জানান।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকারকে রামমোহন যে-গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ১৮২৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের নিকট লিখিত এক আর্জিতে দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও চন্দ্রকুমার ঠাকুরের যুক্ত স্বাক্ষরসহ রামমোহন মুদ্রণের স্বাধীনতা দাবি করেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক আর্জিপত্রটিকে অনেকে মিলটনের 'অ্যারিও-প্যাজিটিকা'-র সঙ্গে তুলনা করেন। মিলটন আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে মনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অর্থাৎ মতামত প্রকাশের সর্ববিধ মাধ্যমের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। সেদিক থেকে রামমোহনের দাবি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়েই সীমাবদ্ধ। ঘটনাটির উৎপত্তি ১৮২৩ সালে অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল জন অ্যাডামের সংবাদ-পত্রের Licensing System প্রবর্তনেই দেখা দেয়। তৎপূর্বে ভারতের অন্যত্রও মুদ্রণ-স্বাধীনতাকে ইংরেজরা খর্ব করে।

উক্ত পত্রের মর্ম ছিল যে মনুষ্যপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ স্বাধীন চিন্তা ও মতামত

প্রকাশের মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে। সে-স্বাধীনতা রোধ কোনো আদর্শ সরকারেরই করা অনুচিত। সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত অপকার তো করেই না, বরং সেই অধিকার অবদমনেই অপকার সাধিত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সরকারকে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য অর্জনে সহায়তা করে।

ঐ আর্জি নাকচ হয়ে যাওয়ায় তিনি ইংল্যাণ্ডে সম্রাটের কাছে আপিল করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টর্সের সঙ্গে তাঁর এ বিষয়ে দীর্ঘ বাদানুবাদ চলে। এমন-কি বেন্টিংক, যিনি সহমরণ প্রথা রহিত করেছিলেন, তিনিও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থাকে শিথিল করেন নি। সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য সার চার্লস মেটকাফ অস্থায়ী গবর্নর-জেনারেল হয়ে এ-নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করেন (১৮৩৫)।

বি শ্ব জ নী ন মা ন ব তা

যুক্তি ও মুক্তির অনুরাগী রামমোহন ছিলেন বিশ্বজনীন মানবতন্ত্রে বিশ্বাসী। সহিষ্ণুতা, সাহচর্য ও সৌহার্দের বন্ধনে তিনি বিশ্বমানবের সমন্বয় চেয়েছিলেন। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ও জড়তা থেকে মন ও আত্মার মুক্তিসাধন করে একদিকে তিনি যেমন নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি স্বাধীন অথচ সুসংবদ্ধ বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রচার করেন।

তুলনামূলক অধ্যাত্মবাদের চিন্তা তাঁর মনে বিশ্বধর্মের বিশ্বাস সঞ্চারিত করে। পরব্রহ্মের উপলব্ধিস্বরূপ সকল আধ্যাত্মিক মতের মৌল আদর্শের সমন্বয়ে একেশ্বরবাদকে তিনি সর্ববাদীসম্মতরূপে কল্পনা করেন। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে দাদু, কবীর, নানক, তুকারামের ভাবধারার উত্তরসাধক বলা যায়।

সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী রামমোহন ছিলেন সর্বপ্রকার জাত্যভিমানের ঊর্ধ্বে; তাই তাঁর অন্তরে বিশ্বজনীন ভাবাবেগ বিরাজ করত। তাঁর চোখে সমগ্র মানবজাতি একই সমাজভুক্ত— বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়কে তিনি সেই সমাজের শাখা মনে করতেন। ১৮৩২ সালে তিনি ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রীকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি বিভিন্ন দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিবাদের নিষ্পত্তিকল্পে একটি বিশ্বকংগ্রেস গঠনের সুপারিশ করেন।[২৭] ঐ সময়ে ইউরোপে চারটি রাষ্ট্র ধর্ম, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে যে সংঘ গঠন করেছিল তিনি তার সম্প্রসারণ কামনা করেন। রামমোহনের মানবতন্ত্রী ও বিশ্বজনীন হৃদয়াবেগ অনেকটা ডেভিড হিউমের আদর্শের সঙ্গে তুলনীয়।

শি ক্ষা চি ন্তা

এদেশে ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পরে শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে শাসকবর্গের অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত মক্তব-মাদ্রাসা ও টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রাখা।

সেই অনুযায়ী সরকারি আনুকূল্যে কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮২) ও বেনারস হিন্দু কলেজ (১৭৯১) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানির নবীকৃত চার্টার অ্যাক্টে দেশীয় শিক্ষাধারার উন্নয়ন ও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসারকল্পে নিয়মিত আর্থিক অনুদানের জন্যে অর্থবরাদ্দ শুরু হয়। রামমোহন প্রাচ্য শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে দেশের পশ্চাৎপদ জনমনের সঙ্গে মানব প্রগতির সংযোগ ঘটে। তাই কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে সংস্কৃত কলেজ খোলার (১৯২৪) আগে যখন জল্পনা-কল্পনা চলেছিল তখন তিনি এক পত্রে (১৯২৩) গবর্নর জেনারেল আমহার্স্টকে এই মর্মে বলেন যে টোল-চতুষ্পাঠীতে প্রচলিত শিক্ষার জন্যে সরকারি অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই। আধুনিক যুগোপযোগী জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ছাড়া দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। নিজে তিনি মায়াবাদী বেদান্তে বিশ্বাসী হলেও এবং পরে নিজেই একটি বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন (১৮২৫) করলেও ব্যাবহারিক জীবনে বেদান্ত শিক্ষা যে অর্থহীন সেকথা উপলব্ধি করে তিনি আমহার্স্টকে ঐ পত্রে লেখেন –

Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines, which teach them to believe that all visible things have no real existence...

আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর পত্র দেশের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তাতে তিনি শিক্ষায় বেকনের আদর্শ সমর্থন করে বলেন—

If it had been intended to keep the British Nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences [১৮]

রামমোহন অবাধ অধিকার (laissez-faire) তত্ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন না— বিশেষ করে একটি ক্ষেত্রে, সেটি হল শিক্ষা। জনশিক্ষাবিস্তারে তিনি সরকারি প্রচেষ্টার সুপারিশ করেন। তিনি মনে করতেন যে দেশবাসীর নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বোধ ও চেতনার বিকাশ ও উন্মেষের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষার আশু প্রয়োজন এবং সে-বিষয়ে সরকারি প্রচেষ্টাই সর্বাপেক্ষা কার্যকর।

আর্থনীতিক চিন্তা

রাষ্ট্রনীতির ন্যায় অর্থনীতির ক্ষেত্রেও রামমোহনের চিন্তা বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন রচনায় ছড়ানো চিন্তাগুলির সমন্বয়ে তাঁর তাত্ত্বিক মনোভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁর চিন্তাকে যেমন সমাজতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা যায় না, তেমনি পুরোপুরি অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতীও তাঁকে বলা যায় না। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানায় তাঁর বিশ্বাস থাকলেও মনোভাব তাঁর সর্বাংশে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ঝোঁকে নি। কারণ অসহায় ও দুঃস্থ মানুষকে রক্ষার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তায় বলে তিনি মনে করতেন।

পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ যে অন্যায় সেকথা তিনি তাঁর 'Rights of Hindoos over Ancestral Property' নিবন্ধে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন দায়ভাগ আইনের সমর্থক।

কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় রামমোহন সে-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ভূস্বামীদের সুবিধার্থে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করা ভুল। জনকল্যাণ-চিন্তাই তাঁর মানসপটে ক্রিয়াশীল থাকত। তিনি সাধারণ মানুষকে জমিদারদের দাপট থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কৃষক ও খেতমজুররা যাতে বঞ্চিত না হয় সে-বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভূমিব্যবস্থার প্রশাসনে সরকারের সরাসরি অনুপ্রবেশ তিনি পছন্দ করতেন না; কারণ তাতে অনুমিত উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত অধিক রাজস্ব আদায় হওয়াটা অনিশ্চিত। খাস জমিই সরকারি অব্যবস্থার পরিচায়ক। তাই তিনি বলেছেন—

> every man is entitled by law and reason to enjoy the fruits of his honest labour and good management.[২৯]

মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থাকে তিনি সমর্থন করতেন—তাতে রায়ত-ওয়ারী প্রথার পরিবর্তে জমিদারি প্রথার প্রতিই তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। অবশ্য জমিদারদের অত্যাচার থেকে নিরীহ প্রজাদের রক্ষার বিষয়ে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

চাষীর দুঃসহ দারিদ্র্যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন। তাই তিনি জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধির অধিকারকে সমর্থন করেন নি এবং জমিদারদের উপর আরোপিত করের হ্রাস হওয়া প্রয়োজন বোধ করতেন। উদ্দেশ্য, যাতে অনুপাতে সাধারণ প্রজারা উপকৃত হয়। তাতে সরকারের আয় কমে যাওয়ার আশংকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

১. বিলাস দ্রব্যের উপর এবং অত্যাবশ্যকীয় নয় যেসব বস্তু সেগুলির উপর অধিক কর আরোপ।[৩০]

২. রাজস্ব বিভাগের ব্যয়-সংকোচন। হাজার, দেড় হাজার টাকার বেতনের ইউরোপীয় কালেক্টরের পরিবর্তে তিন চারশো টাকার বেতনে ভারতীয় কালেক্টর নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রজাদের খাজনা কমে গেলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। ফলে সরকারের প্রশাসনিক নৈপুণ্য দৃঢ় হবে।[৩১]

৩. স্থায়ী সেনাবাহিনীর পরিবর্তে স্থানিক রক্ষীদলের ব্যবস্থা হলে ব্যয়-সংকোচ ছাড়াও জনসাধারণের সাহচর্য ও আনুগত্য বৃদ্ধি পাবে।[৩২]

বিলেতে সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান কালে (১৮৩১) রামমোহন এদেশ থেকে কি বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে নিঃসারিত হয়ে যায় তার একটা তথ্য-সমন্বিত চিত্র তুলে ধরেন। 'On Colonial policy as Applicable to the Government of India' নিবন্ধে তাঁর সেই বক্তব্যটি পাওয়া যায়। বিকল্প পন্থা হিসাবে তিনি এদেশে ইংরেজদের বসবাসের সুপারিশ করেন;[৩৩] যাতে ঐ-অর্থ আর দেশের বাইরে চলে না যায়। বিষয়টি তখন খুবই বিতর্কমূলক ছিল। এ-সম্পর্কে ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ সভায় ইংরেজদের ভারতে বসবাসের প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে রামমোহন বলেছিলেন—

I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European Gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs.[৩৪]

ফলে রামমোহনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা শুরু হয়। বস্তুত রামমোহন বিলেতের চাষী ও শ্রমিকদের এদেশে আসার আহ্বান জানান নি। তিনি চেয়েছিলেন সেখানকার শিল্পনিপুণতা ও মূলধনের আমদানি। উচ্চজ্ঞানসম্পন্ন ইংরেজদের আগমনে এদেশের শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত হবে। ইংরেজরা এদেশের কৃষিপদ্ধতির উন্নতি এবং যন্ত্রশিল্পের বিস্তার সাধন করবে। তাছাড়া তাদের সান্নিধ্যে এদেশের অধিবাসীরা রাজনৈতিক অধিকার ও চেতনা লাভে সমর্থ হবে এবং তাদের মারফত ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ ও অসন্তোষগুলি সহজে বিলেতের কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হবে।[৩৫]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছিল। কৃষির ক্ষেত্রে তাদের আংশিক ভাগিদার ছিল এদেশের জমিদাররা। উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর আঁতাত। উভয়ের এই একচেটিয়া স্বত্ব নষ্ট করে দেবার একমাত্র ক্ষমতা ছিল অন্যান্য ইংরেজ বণিকদের। তাদের সাহায্যেই বাংলা তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ছিল ইতিহাসের নির্দেশ। রামমোহন সেই নির্দেশ অনুভব করতে সক্ষম হন।[৩৬]

সমসাময়িক কালে নীলকরদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল। জমিদাররা নীলকরদের অত্যাচারকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরে নিজেদের দুষ্কৃতি ঢাকবার চেষ্টা করত। নীলকরদের মধ্যে যেটুকু ঔদার্য ছিল তার একটুও এদেশের জমিদার শ্রেণীর মধ্যে দেখা যেত না। নীলকররা মানুষকে খাটালে মজুরি দিত —যেটা জমিদারদের ছিল চক্ষুশূল। ইংরেজদের আগমন ও বসবাস বৃদ্ধি পেলে কায়েমী স্বার্থে ঘা পড়বে এই আশংকায় জমিদাররা রামমোহনের প্রস্তাবকে নিন্দা করে। রামমোহন কোম্পানি ও জমিদারদের একচেটিয়া স্বত্বে কুঠারাঘাত করে

অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন সুপারিশ করেন। কোম্পানি অন্যান্য ইংরেজদের অনুপ্রবেশের বিরোধী ছিল।

বাংলা দেশে নীলচাষের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ফরাসি বিপ্লবের পর সেন্ট ডোমিনিগো থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যাবার ফলে। খরচখরচা বাদ দিয়ে নীলচাষ থেকে বছরে ৩৬ লক্ষ পাউন্ডের মতো বৈদেশিক অর্থাগম হত। কিন্তু যেসব ইউরোপীয়ান ঐ সময় নীলচাষ করতে আসত তারা কোনো মূলধন আনত না। তারা ভারতীয় অথবা কোম্পানির চাকুরে কিংবা স্থানীয় অন্যান্য ঋণদানকারী এজেন্টদের কাছ থেকে মূলধন কর্জ করে কারখানা স্থাপন করত।[৩৭] রামমোহন চেয়েছিলেন যে যেসব ইউরোপীয়ানের শিক্ষা, উন্নত চরিত্র ও মূলধন আছে তাদেরই শুধু এদেশে বসবাসের অনুমতি দেওয়া দরকার।

লন্ডনের এক পত্রিকায় প্রকাশিত রামমোহনের একটি প্রবন্ধে এদেশে ইংরেজদের বসবাসের ভাল ও মন্দ উভয় দিকই দর্শানো হয়। তিনি বলেন যে প্রস্তাবটিকে সাবধানতার সঙ্গে বিচার করে দেখা উচিত। ইংরেজদের সহযোগিতায় রামমোহন এদেশে যে অবাধ বাণিজ্য ও শিল্পবিপ্লবের পত্তনে অগ্রণী হন তাকে এখানকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সূত্রপাত বলে মনে করা যায়।[৩৮]

উপসংহার

ইংরেজরা আসার পর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে ভারতীয় সমাজের বহু শতকের নিশ্চলতায় গতি সঞ্চারিত হয়েছিল। পশ্চিমী উদারতন্ত্রী আদর্শ ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের নিষ্প্রাণ সমাজ ও মননজীবনকে উজ্জীবিত করে তোলে। তারই ফলে দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণ।

রাজা রামমোহন ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎরূপে অভিহিত। পশ্চিমী সংস্কৃতিকে তিনি আবাহন জানিয়েছিলেন, ইতিহাস-ভূগোলের গণ্ডিকে বিশেষ প্রাধান্য দেন নি। কিন্তু একাধারেই তিনি যুক্তির অনুসারী ও ভক্তির সাধক ছিলেন। সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি যুক্তি ও উদারতন্ত্রী মনোভাব পোষণ করতেন। সেইসঙ্গে প্রাচীন ধর্মাদর্শের যুক্তিসম্মত সংস্কারও ছিল তাঁর কাম্য। ফলে তাঁর ভূমিকা হয়ে পড়ে দ্বিধারায় বিভক্ত। যুক্তিবাদী ও উদারতন্ত্রী রামমোহন বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতার প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন ; যার মূলে রয়েছে অতিপ্রাকৃত ও বিশ্বাতীত পরম সত্তা এবং যেখানে বিশ্বাসের বেদীমূলে যুক্তি উৎসর্গীকৃত। বৈদান্তিক চিন্তায় মানবিকতার স্থান গৌণ, জাগতিক সবকিছুর অস্তিত্বই অকিঞ্চিৎকর।

প্রাচীন ভারতে বৈদিক চিন্তার সমান্তরাল ধারায় বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী আদর্শেরও বিশেষ অবস্থান ছিল ; যার পরিণতি ঘটে বৌদ্ধ ভাববিপ্লবে। আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা নৈতিকতাই ছিল বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ; প্রগতির বাহক বণিকশ্রেণীর প্রতি ছিল তাঁর সহৃদয় মনোভাব। কিন্তু যুক্তি ও ঐহিক প্রত্যয়ের সঙ্গে বৌদ্ধদের নির্বাণতত্ত্ব

সঙ্গতিহীন। এই অন্তর্বিরোধ ও তার সুযোগে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণীর পুনরাধিপত্যে বৌদ্ধধর্ম খর্ব হয়ে পড়ে। ইউরোপেও একসময় খ্রীষ্টান চার্চের আধিপত্যে যুক্তিবাদী-মানবতন্ত্রী প্রাচীন গ্রীক জীবনাদর্শ চাপা পড়ে গিয়েছিল। প্রায় সহস্র-বছরকাল পর বিশেষ করে চতুর্দশ শতকে আরবের একদল পণ্ডিত লুপ্ত গ্রীক আদর্শকে পরিপুষ্ট করে ইউরোপে পৌঁছিয়ে দেন। অনেকটা তারই প্রভাব ও প্রেরণায় ইউরোপের মননজীবন সর্বক্ষেত্রেই নবীনতার স্পর্শ লাভ করে। যুক্তিনিষ্ঠ স্বাধীন চিন্তা ও নতুন চেতনায় সেখানকার সৃষ্টিশক্তি জেগে ওঠে। প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষের সার্বভৌমিতা, যাকে এককথায় রেনেসাঁস বলা হয়ে থাকে। পরে খ্রীষ্টধর্মের সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে 'রিফর্মেশন'-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল; তাতে রেনেসাঁসধর্মী আদর্শ খর্ব হয়ে পড়ে। রিফর্মেশন-আন্দোলনের ব্যর্থতায় যুক্তিবাদী-মানবতন্ত্রী আদর্শ আবার নতুন প্রাণবেগ লাভ করে। বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমপ্রসারে ঈশ্বরের স্থান হয় অবনমিত।

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণও ইউরোপীয় রিফর্মেশন আন্দোলনের সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়। রামমোহনের ভূমিকা লুথার ও কালভিনের সঙ্গে তুলনীয়। ভারতে নবাগত পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি নিষ্ফল হয়ে যায় দেশের তৎকালীন চিন্তানায়কদের স্ববিরোধের ফলে। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ যুক্তিবাদী হয়েও বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করতে পারেন নি। মধ্যযুগের 'ক্যাথলিক' ইউরোপ 'প্রটেস্টান্ট' রিফর্মেশনে পরিশোধিত হয়।[৩৯]

রামমোহনোত্তর ভারতে রেনেসাঁসের যে-অবিমিশ্র লক্ষণ দেখা দেয় তা হয়েছিল স্বল্পকালস্থায়ী। ভারতের সমাজ ও মননজীবনে পশ্চিমী সংস্কৃতির সংঘাত সঞ্জাত তরঙ্গ এদেশের সংস্কারাচ্ছন্ন উপকূলে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে যায়। এর কারণ অবশ্য সবটাই বিদেশাগত আদর্শের সঙ্গে এদেশের আদর্শগত সংঘাত নয়। নবীনাদর্শে উদ্বুদ্ধ নব্যশিক্ষিতদের স্বদেশি ঐতিহ্যের উপর অস্ত্রোপচারও তার অন্যতম কারণ। তাঁদের উগ্র বিজাতীয় মনোভাব এবং খ্রীষ্টান পাদরি ও বিদেশি শাসকদের অবজ্ঞার আচরণ এদেশের আত্মাভিমানে আঘাত করে। তাই রামমোহন থেকে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পর্যন্ত সবাই দেশগৌরববোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বদেশের প্রাচীন ভাবভাণ্ডার থেকে উপকরণ আহরণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চিন্তানায়করা যে সবাই সর্বাংশে নাস্তিক ছিলেন তা নয়। তবে তাঁরা মানুষকেই দিয়েছিলেন প্রাধান্য। সেখানেও অধ্যাত্মবাদী জীবনবিমুখ চিন্তার সঙ্গে ইহলৌকিক মানবতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গির টানাপড়েন চলেছিল কয়েকশো বছর ধরে। ইউরোপের পাঁচশো বছরের অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানরাশি ভারতভূমিতে হঠাৎ এসে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যাবারই কথা; বিশেষ করে একটা সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে বেশ পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণে ইহবিমুখ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে ইহমুখী বস্তুবাদী মানবতাবাদের দোটানা দেখা যায়।

রামমোহন শাস্ত্র মানতেন। সেইসঙ্গেই অবশ্য একথাও বলতেন যে শাস্ত্রার্থ নির্ধারণে বিচারের অধিকার আছে। তিনি নিজে কোনো ধর্মের প্রবর্তন করেন নি। প্রাচীন ধর্মাদর্শের যুক্তিসম্মত সংস্কার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। সত্য নির্ণয়ে ইউরোপীয় যুক্তিবাদের আদর্শে পুরোপুরি নিজ অভিমতের উপর নির্ভর কিংবা আর্যসমাজীদের মতো বেদকেই একমাত্র প্রামাণিক শাস্ত্র বলে গ্রহণ করেন নি। তন্ত্র, পুরাণ এবং ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থকেও প্রামাণ্যের মর্যাদা দেন। যুক্তির সাহায্যেই হিন্দুধর্মকে বাহ্য আচার ও অনুষ্ঠান-সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে ব্যক্তিমনের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠাদানই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। এই যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে মিলিত হয় তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ। হিন্দুধর্মের পরিমার্জনা যেমন তাঁর কাম্য ছিল, তেমনি জীবনের অনুধ্যান ছিল বাহ্য আচারানুষ্ঠানমুক্ত সকল ধর্মের বিশ্বজনীন অন্তর্মাধুর্যের ভিত্তিতে বৈশ্বিক মানব-ধর্মের (Universal Religion) প্রবর্তন। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে বিশ্বজনীন মানবতার পরিমিশ্রণ ঘটে।

আধুনিক ভারতের অন্যতম রূপকার রামমোহন ছিলেন প্রাচীন ও নবীন ধারার সেতুবন্ধস্বরূপ। যুগ যুগ ধরে ভারতের মাটিতে বহু জাতির পদার্পণ ঘটেছে। উদ্ভব হয়েছে নানা ভাব, ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির—দেখা দিয়েছে তাদের ঐক্য-বিধানের সমস্যা। নানক, কবীর, দাদু প্রমুখ সাধকেরা এই বিচিত্রধারার সমন্বয় সাধনে ব্রত হন। ইংরেজরা এদেশে আসার পর অনুরূপ এক সাংস্কৃতিক জটিলতা দেখা দেয়। রামমোহন তার সামঞ্জস্য বিধান করে নবাগত জীবনাদর্শকে আবাহন করেন। তমসাচ্ছন্ন দেশকে অজ্ঞতা, প্রথাপীড়ন ও অবক্ষয় থেকে তিনি উদ্ধারের প্রয়াসী হন। জনমনে ধর্মভাব ও নব্যসংস্কৃতির সুর সংযোজন করে তিনি এক নতুন ঐকতান সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে উদারতন্ত্রী ভাবধারা যে-শ্রেণীর নেতৃত্বে ছড়িয়ে পড়ে সে-শ্রেণী ছিল নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণী। ক্ষয়িষ্ণু অনাচারাচ্ছন্ন মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থাকে এই নবোদ্ভূত শ্রেণী নতুন চেতনায় উদ্দীপিত করে। উৎপীড়িত মানুষকে তারা মুক্তি ও নতুন সমাজব্যবস্থার নিশানা দেখায়। ব্রিটিশ বণিকদের আবির্ভাবে এদেশেও অনুরূপ একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। রামমোহন ছিলেন অনেকটা সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাঁর আমলে অবশ্য নগরকেন্দ্রিক ও বাণিজ্য-স্বার্থান্বিত সংকীর্ণ ঐ-শ্রেণী সুস্পষ্ট সামাজিক শ্রেণীর (Social Class) রূপ নেয় নি। তাঁদের গোষ্ঠীচেতনাও ছিল অবিকশিত। রামমোহন ও তাঁর অনুগামীরা অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মক্ষেত্রেও যেমন, অর্থনীতিক্ষেত্রেও তেমনি তাঁরা ব্যক্তিস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জীবনাবিমুখ সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের সমর্থন করতেন না। তিনি ও তাঁর সহযোগীদের বিলাস ও ভোগের জীবন পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমগোত্রীয়। তাঁদের ভোগবিলাস অবশ্য সময়, শ্রম, অর্থ ও বস্তুর পরিমিত ব্যবহারসাপেক্ষ ছিল—

রাজারাজড়াদের সীমাহীন অমিতব্যয়িতার মতো নয়। নানাবিধ উৎসবানুষ্ঠানে অর্থ, সময় ও শ্রমের অপচয় নিবারণার্থে তাই তাঁরা ধর্মসাধনাকেও করে তোলেন ব্যক্তিগত ও পরিমিত সময়নির্দিষ্ট।[৪০]

রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি এদেশে আধুনিকতার সূত্রপাত করেন সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে সেখানকার রাষ্ট্রচিন্তারও তিনি সমধিক গুণগ্রাহী ছিলেন। নিজস্ব কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ব তিনি উদ্ভাবন করেন নি। ইউরোপীয় লিবার‍্যাল আদর্শ তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত হয়। ভারতের উত্তর-কালীন সংসদীয় গণতন্ত্রের বীজ তাঁর মনেই প্রথম উপ্ত হয়েছিল। দেশের মডারেট রাজনীতির তিনিই ছিলেন পুরোগামী।

সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও রাজনীতি তাঁর মনের বিচরণক্ষেত্র ছিল না। রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রথম ও প্রধান উপাদান সাংস্কৃতিক বিপ্লবেই তাঁর অধিক প্রবণতা দেখা যায়। সাধারণতন্ত্রী আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও রাজতন্ত্রেও তাঁর সানুরাগ আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসাবে বিবেচিত রবার্ট ওয়েনের সান্নিধ্যে তিনি এসেছিলেন; কিন্তু তাতে তিনি বিশেষ প্রভাবিত হন নি। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সামাজিক গণতন্ত্রেরও যে প্রয়োজন আছে সে-বিষয়ে তিনি যথোচিত সচেতন ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন তাঁর মনে প্রচ্ছন্নভাবে থাকলেও সে-সম্পর্কে সুস্পষ্ট চেতনা বা সক্রিয় ভূমিকা কিছু ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রসমূহ স্বাধীনতা অর্জন করলে তবেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সহজ ও সম্ভব হবে। এবং তখনই সারা বিশ্বের স্বাধীন জাতিসমূহ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কেবল পঞ্চায়েতী স্বয়ংসম্পূর্ণতা কিংবা দেশগত আত্মনির্ভরতাই নয়, ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধতার চিন্তাও তাঁর মনে উদিত হয়। তাঁর সময়ে দলীয় রাজনীতি তো দূরের কথা জাতীয় চেতনাও দেখা দেয় নি। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার উন্নয়ন, মুদ্রণ-স্বাধীনতা অর্জন, নারীর সামাজিক মুক্তিসাধন, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি প্রচেষ্টা তাঁর প্রদীপ জ্বালার আগে সলতে পাকানোর মতো। কার্যত তাঁরই ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ দেশের পরবর্তী কালের চিন্তানায়কেরা একক ও সংঘবদ্ধভাবে দেশের সামাজিক চেতনার পরিপুষ্টি সাধন ও রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতায় গতি সংযোজন করেন।[৪১]

উ ৎ স নি র্দে শ

১. S. D. Collet. *The life and letters of Raja Rammohun Roy*. 1962, Appendix VIII.

২. Brajendranath Seal. *Rammohun Roy : The Universal Man*. p. 6.

৩. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আত্মজীবনী', ১৯৬২, পৃ. ৩১১-৩১৮।
বিপিনচন্দ্র পাল : 'চরিত-চিত্র', ১৯৫৮, পৃ. ৫০।

৪. Collet. *op. cit.* Appendix IV.

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'রামমোহন রায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১৬, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫৩।

৬. *The English Works of Raja Rammohun Roy*. ed. by Jogendra Chandra Ghose. 1901, Part I, p. 287.

৭. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত', ১৮৮১, পৃ. ১২৯।
(তৎসহ ইংরেজি রচনাবলীর ১ম খণ্ডে *Preliminary Remarks* দ্রষ্টব্য)

৮. বিপিনচন্দ্র পাল : 'চরিত-চিত্র', ১৯৫৮, পৃ. ৫১।

৯. Collet. *op. cit.* p. 213

১০. Brajendranath Seal. *Rammohun Roy : The Universal Man*. pp. 11-12.

১১. দিলীপকুমার বিশ্বাস : রামমোহন-সমীক্ষা, ১৯৮৩, পৃ. ১৩০।

১২. Seal. *op. cit.* pp. 12-13.

১৩. *Ibid.* pp. 18-21.

১৪. Karl Marx. 'The British Rule in India'. *Selected Works of Marx and Engels*. Vol. I, p. 317.

১৫. Bimanbehari Majumdar. *History of Political Thought : From Rammohun to Dayananda (1821-84)* 1934, Vol. I, p. 10.

১৬. *The English Works of Raja Rammohun Roy*. Part I, p. 221. ('Rights of Hindoos over Ancestral Property')

১৭. *Ibid.* p. 84 ('A Paper on Revenue System of India')

১৮. *Ibid.* pp. 242-244 ('Rights of Hindoos over Ancestral Property')

১৯. *Ibid.* p 99 ('Appendix to the Judicial and Revenue System of India')

২০. *Ibid.* p. 310 ('An Appeal to the King in Council')

২১. *Ibid.* pp. 32-33 ('Judicial System of India')
২২. *Ibid.* pp. 303-305 ('An Appeal to the King in Council')
২৩. *Ibid.* pp. 47-48 ('Judicial System of India)
২৪. Quoted in : Bimanbeharl Majumdar. *History of Political Thought*. p. 18.
২৫. *The English Works of Raja Rammohun Roy.* Part III, p. 105. ('Final Appeal to the Christian Public')
২৬. M. N. Roy. *India in Transition*. Bombay, 1971. p. 20.
২৭. Collet. *op. cit.* Appendix IX.
২৮. *Ibid.* Appendix II.
২৯. Quoted in : Susobhan Chandra Sarker, ed. *Rammohun Roy on Indian Economy*. 1965, p. 23.
৩০. *Ibid.* p. 25.
৩১. *Ibid.* pp. 25-27.
৩২ *The English Works of Raja Rammohun Roy.* Part I, p. 103. ('Appendix to the Condition of India')
৩৩. *Ibid.* p. 77 ('Ans. to Q. 52 on Revenue System of India')
৩৪. Jatindra Kumar Majumder. ed. *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements of India.* 1941, pp. 439-49.
৩৫. *Ibid.* pp. 113-120.
৩৬. সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন', ১৯৬৩, পৃ. ২৪।
৩৭. R. C. Dutt. *Economic History of India*. 1960, Vol. I, pp. 199-200.
৩৮. Susobhan Chandra Sarker, *op. cit.* pp. 84-89.
৩৯. Niranjan Dhar. *Vedanta and the Bengal Renaissance.* Calcutta, 1977, pp. 166-8.
৪০. সম্পা. বিনয় ঘোষ : 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র', ১৯৬৩, ২য় খণ্ড, পৃ. ২।
৪১. Pattabhi Sitaramyya. *History of Indian National Congress* (1885-1935), 1935, p. 17.

অক্ষয়কুমার দত্ত ॥ ১৮২০—১৮৮৬

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন যে বাংলার যুবমানসে পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্তক হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।[১] তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি ছিলেন নিখাদ বস্তুবাদী। রামমোহন যখন বিলেত যাত্রা করেন তখন অক্ষয়কুমারের বয়স দশ। রামমোহনোত্তর বাংলার দার্শনিক বিপ্লবীদের (Philosophical Radicals) মধ্যে অক্ষয়কুমার অগ্রগণ্য। তিনিই রামমোহনের শ্রেষ্ঠ ও সার্থক উত্তরসাধক। রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শ দুটি ধারায় প্রবহমান ছিল। এর ভক্তিবাদী দিকটির প্রধান পথিক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আর যুক্তিবাদী পথে অগ্রসর হয়েছিলেন অক্ষয়কুমার।

নবদ্বীপ থেকে মাইল চারেক দূরে চুপী গ্রামে অক্ষয়কুমারের জন্ম। ঐ বছর আর-একজন স্মরণীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন; তিনি অক্ষয়কুমারেরই পরবর্তী জীবনের বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দশ বছর বয়সে কলকাতায় আসার পর অক্ষয়কুমারের ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। উনিশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে অর্থাভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা এত অধিক ছিল যে', পরিণত বয়সে 'তিনি ছাত্রদের সহিত একত্রে মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে রসায়ন ও ২য় বর্ষে উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। তাহার পর তিনি জর্মনভাষা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার অনুশীলন করেন'।[২]

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্র অক্ষয়কুমারকে সংবাদ প্রভাকরের লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং তিনিই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের সংযোগ ঘটিয়ে দেন। অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী-সভার সদস্য মনোনীত হন (১৮৩৯) এবং পরের বছর তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি পড়াতেন ভূগোল আর পদার্থবিদ্যা। ঐ-দুই বিষয়ে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা হুগলি জেলার বাঁশবেড়েতে স্থানান্তরিত হলে অক্ষয়কুমার ঐ কাজে ইস্তফা দিয়ে বন্ধু প্রসন্নকুমার ঘোষের সঙ্গে 'বিদ্যাদর্শন' (১৮৪২) নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি মাস ছয়েক বেরিয়েছিল। ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশের প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ পাঁচজন সদস্যকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। অক্ষয়কুমার তার অন্যতম সহ-সচিব হন। লিখিতভাবে ১৮৪৬ সাল থেকে ঐ-পত্রিকার সম্পাদক হলেও বস্তুত গোড়া থেকেই তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। তত্ত্ববোধিনীর উদ্দেশ্য ছিল : 'পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত, ধর্ম্মনীতি,

স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থা, জ্যোতিষ, শারীরস্থান, শারীরবিধান'[৩] প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা। সমকালীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব প্রথম বারো বছর (১৮৪৩-৫৫) অক্ষয়কুমারের উপর ন্যস্ত ছিল। ঐ পত্রিকাতে অক্ষয়কুমারের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছাড়াও বহু মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অবাধ জ্ঞানার্জনস্পৃহা, দেশের প্রতি, বিশেষত দারিদ্র্যক্লিষ্ট কৃষকদের প্রতি দরদী মনোভাব এবং দেশবাসীর দুঃখমোচনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ঐসব রচনাগুলিতে পাওয়া যায়। সমাজকে তিনি বিচার করতেন জৈব (organic) প্রত্যয়ে। শিক্ষা ও রাষ্ট্রপরিচালনার বিষয়ে তিনি গ্রীক দার্শনিকদের অনুগামী ছিলেন। লকের 'সামাজিক-চুক্তি-তত্ত্ব' তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করে এবং ম্যালথাসের জনসংখ্যানিয়ন্ত্রণ-তত্ত্বেরও তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বেদবেদান্ত ও পরব্রহ্মবিষয়ক তত্ত্বাদি আলোচিত হলেও অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। এ-কথা দেবেন্দ্রনাথেরই উক্তিতে জানা যায়।[৪] অক্ষয়কুমারের কাছে ধর্মের অর্থ ছিল প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণ। এতদ্‌বিষয়ক চিন্তার পরিচয় তাঁর দু-খণ্ডে প্রকাশিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' গ্রন্থটি বহন করে। জর্জ কুম্ব-এর 'কন্‌সটিটিউশন অব ম্যান' অবলম্বনে অক্ষয়কুমারের উক্ত গ্রন্থ রচিত।

প্রথম দিকে অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন (১৮৪৩), কিন্তু নিজস্ব মত ও স্বতন্ত্র পথে। ব্রাহ্মসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ব্রাহ্মধর্মকে তিনি যুক্তিবহ ও বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তার ভাষায়—

> ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত সমুদায় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।[৫]

স্বভাবতই তাঁর মতামতকে অগ্রাহ্য করা হত এবং ব্রাহ্মদের সঙ্গে তাঁর তীব্র বাদানুবাদ দেখা দিত। 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল—

> The negative, critical and destructive part of the work of Brahmo Samaj, thirty years ago, was principally done by him.[৬]

ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃতের পরিবর্তে বাংলায় তিনি প্রার্থনার প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মের উপাসনায় পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্যাদি ব্যবহারের তিনি বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও তিনি বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিতে সব কিছু দেখতেন।

একবার উপাসনাকে তিনি একটি সমীকরণের[৭] সাহায্যে তার অর্থহীনতা প্রতিপন্ন করেন—

পরিশ্রম = শস্য
প্রার্থনা + পরিশ্রম = শস্য
∴ প্রার্থনা = ০

'বেদ ঈশ্বর প্রণীত ও অভ্রান্ত'- এই মতই একসময় আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারিত হত। এবিষয়ে অক্ষয়কুমার বিচার উপস্থিত করেন ও দেবেন্দ্রনাথকে স্বীয় মতে আনয়ন করেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—

> বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয়বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) ১১ই মাঘ দিবসে সাংবাৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।[৮]

এছাড়া অক্ষয়কুমার বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা প্রবর্তনেও উদ্যোগী হন। শাস্ত্র থেকে শ্লোক সংগ্রহ করে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন; তাতে অক্ষয়-কুমারের সায় ছিল না। শাস্ত্রীয় গোঁড়ামির পরিবর্তে তিনি চাইতেন প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্তন ও যুক্তিবিচারের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তাঁর যুক্তিপ্রবণ মনের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একটি ভাষণ থেকে—

> অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্যভট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোম্‌ত যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কণ্ঠ ও তলবকার, মুষা ও মহম্মদ এবং যীশু ও চৈতন্য পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।[৯]

১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাসভবনে দ্বিতীয় 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহর্ষি ছিলেন তার সভাপতি এবং অক্ষয়কুমার ছিলেন কর্মসচিব। প্রতিষ্ঠানটি তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী সদস্যদের মিলনকেন্দ্র ছিল। পারস্পরিক মতের সংঘর্ষে সভাটি বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। ঐ সভায় অক্ষয়কুমার একবার হাত তুলে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপণের জন্যে ভোট গ্রহণ করেছিলেন।[১০]

কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাসগৃহে প্রতিষ্ঠিত (১৮৫৪) যুক্তিবাদী নব্যসম্প্রদায়ের 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃৎসমিতি'তে অক্ষয়কুমারের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল: 'স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন এবং বহুবিবাহ প্রচলনরোধের' জন্যে আন্দোলন। রাধানাথ শিকদার, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদের ভ্রাতা প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ যুক্তিবাদী, সমাজসংস্কারক ও নব্যপন্থীগণ ছিলেন ঐ সমিতির সদস্য। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে।[১১]

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন অক্ষয়কুমারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে বিদ্যাসাগর কলকাতায় 'নর্ম্যাল স্কুল'-এর প্রতিষ্ঠা (১৮৫৫) করেন। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংশ্রব ত্যাগ করার পর বিদ্যাসাগরের অনুরোধে ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঐ পদে তিনি বছর তিনেক ছিলেন। এর কিছু আগে তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' গ্রন্থটির দুই খণ্ড (১৮৫১, ১৮৫৩) এবং 'চারুপাঠ' গ্রন্থটির দুই খণ্ড (১৮৫৩, ১৮৫৪) প্রকাশিত হয়। চারুপাঠের তৃতীয় খণ্ড (১৮৫৯) ছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' (১ম খণ্ড ১৮৭০, ২য় খণ্ড ১৮৮৩), এবং 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুরুতর শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি নর্ম্যাল স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন। দুরারোগ্য ঐ রোগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

রাজনারায়ণ বসু অক্ষয়কুমারকে অজ্ঞাবাদী (agnostic) বলে অভিহিত করেছেন।[১২] অক্ষয়কুমারের মতে বিশ্বজগৎ প্রকৃতির নিয়মে চলে, বিশ্বাতীত কোনো ঈশ্বরের নির্দেশে নয়। তাঁর কাছে প্রাকৃতিক নিয়মই ঈশ্বরসৃষ্ট নিয়ম। প্রার্থনার পরিবর্তে সেই নিয়ম পালন করলেই সুখী হওয়া যায়। 'মানব-কুলের হিত-সাধন করাই পরমেশ্বরের যথার্থ উপাসনা'—এই ছিল তাঁর মত।[১৩] তিনি মনে করতেন যে বিজ্ঞানই যখন সর্বজ্ঞানের আকর, তখন বিজ্ঞানভিত্তিক প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের জীবন ও সমাজের নীতি নির্ধারিত হওয়া উচিত। এই চিন্তাকে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে নিজের আত্মীয়বর্গ, সমাজ ও দেশের, তথা সমগ্র মানবকুলের প্রতি কর্তব্য-পালন বিধেয়—এই হল শ্রেষ্ঠ ধর্ম ও যথার্থ উপাসনা। তিনি বলেছেন—

> বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশকপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।[১৪]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবণতার সুসমঞ্জস ও যুগপৎ উন্নতির অনুশীলনই হবে প্রকৃত ধর্ম— যা তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শরূপে উপস্থাপনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রকৃতির নিয়মানুসারে কর্তব্য সম্পাদন করা না করাই ধর্ম ও অধর্ম। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে—

> সমাজ হইতে বেদের আধিপত্য উঠাইয়া দিয়া, স্বভাবকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে প্রতিপন্ন করত তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের পত্তনভূমি বুদ্ধি ও যুক্তি। বুদ্ধিকে নেতা করিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে অতি কঠোর বৌদ্ধধর্ম্মের আকারে প্রচার করিয়াছিলেন।[১৫]

যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার প্রাকৃতিক নিয়মের অপরিহার্যতায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন এবং অতীন্দ্রিয় সত্তায় তাঁর আস্থার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি প্রকৃতিকে স্বতঃসিদ্ধভাবে নিয়মনির্দিষ্ট জ্ঞান করতেন এবং তারই প্রেক্ষাপটে তিনি মানুষ ও সমাজকে বিচার করেছেন। তাঁকে সেজন্যে অনায়াসে বস্তুবাদী বলা চলে। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা আধুনিক কালে এদেশে তিনিই প্রথম করেন। তিনি বলেছেন—

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে যত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এবিষয়ে অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালের লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।[১৬]

প্রাকৃতিক নিয়মে সুখের সন্ধান স্বতঃসিদ্ধ। সুখের মানদণ্ডেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা ও সাফল্য নির্ণেয়। হিতবাদীরা সুখকেই সন্দেহাতীতভাবে সকলের কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য মূল্যবত্তা মনে করে তারই ভিত্তিতে মনুষ্যজীবনের বিচার করেছেন। ইংল্যান্ডের হিতবাদী চিন্তা ঐ সময়ে বাংলাদেশে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। কেশবচন্দ্র সেন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন—

The politics of the age is Benthamism, its ethics Utilitarianism, its religion Rationalism, its philosophy Positivism.[১৭]

বেনথামের হিতবাদী ও যুক্তিবাদী চিন্তায় অক্ষয়কুমার যথেষ্টই প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরও ঐ প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। অক্ষয়কুমার ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই হিতবাদী চিন্তাধারাকে আরও পরিপুষ্ট করে তোলেন। সুখকে তাঁরা সার্বজনীন সুখ হিসাবেই দেখতেন। তবে দুজনের দেখার দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন; অক্ষয়কুমার দেখতেন ব্যক্তিমানুষের বিকাশের দিক থেকে; পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টিগত উন্নতির দিক দেখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র শেষাবধি মিল-বেনথামের আদর্শকে পরিহার করেন।

প্রকৃতির নিয়ম তথা সুখ অর্জনকে অক্ষয়কুমার ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক এই তিন পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন। তাতে ভৌতিক পর্যায়ে নিয়মনিয়ন্ত্রিত জড়জগতের রূপ ও প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে। শারীরিক ক্ষেত্রে মানুষের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর প্রক্রিয়ায় দৈহিক নিয়মের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। মানসিক পর্যায়ে জৈব চেতনার বিশ্লেষণ এবং মানুষ ও পশুর ভিন্ন স্তরে নিহিত চেতনার কথা আলোচিত হয়েছে। বাহ্যবস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষের জৈব প্রবণতাকে অক্ষয়কুমার বুদ্ধি, ধর্ম ও নিকৃষ্ট বৃত্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। তাঁর এই বস্তুনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গিতে অতীন্দ্রিয় চেতনার কোনো অস্তিত্ব নেই। মানবিক প্রবণতা প্রসঙ্গে যদিও তিনি অর্জনস্পৃহা, লোকানুরাগ, সাবধানতা ইত্যাদির সঙ্গে ভক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন— কিন্তু সে ভক্তি ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে মানুষের প্রতিই প্রদর্শনীয়। বঙ্কিম-দর্শনেও ভক্তির এক

বিশেষ স্থান আছে। এবং তিনিও তা মহৎ আদর্শের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্বিধ নিয়ম প্রাচীন শাস্ত্রগুলি থেকে আহৃত। সেদিক থেকে অক্ষয়কুমারের ত্রিবিধ নিয়ম বেদ ও উপনিষদের নিগড়ে বাঁধা হয় নি। প্রকৃতিকে বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিতে জেনে কিভাবে সেই জ্ঞান থেকে সুখ অর্জন করা যায় সে-সম্পর্কে অক্ষয়কুমার তিনটি সূত্র দর্শিয়েছেন : ১. শরীর ও মনের যথোচিত সঞ্চালন; ২. সমুদয় মনোবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান; ৩. বাহ্যবস্তু সম্পর্কিত নিয়মের সঙ্গে সুসমঞ্জস মনোবৃত্তির সংগতিসাধন এবং সঠিক, সৎ ও শুভপথে পদক্ষেপের পন্থা নিরূপণ।

এখানেও পাশ্চমী হিতবাদী চিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের বেশ মিল দেখা যায়। দেহমনের শক্তি ও বিকাশের কথা বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেকেই উপলব্ধি করেছেন। তবে তাঁরা সকলেই তার লক্ষ্য হিসাবে সদাই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে ছিল সমাজ, পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমারের মানসনেত্রে ছিল মানুষ। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণে মানুষ ও তার জীবনদর্শনকে বিশ্লেষণ করেন নি। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই চেয়েছিলেন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারী জীবন ও সমাজের সুসমঞ্জস বিধিব্যবস্থা। উত্তরসূরীদের মধ্যে এই বিজ্ঞাননির্ভর মানবকেন্দ্রী মনোভাব মানবেন্দ্রনাথের দর্শনেই বিশেষ দেখা যায়।

অক্ষয়কুমার নির্বিচারে কোনো কিছু গ্রহণ করতেন না। প্রকৃতিকে তিনি যথার্থ জ্ঞান ও ধর্মের উৎস মনে করতেন। তাঁর মতে প্রকৃতির সম্যক জ্ঞান থেকেই মানুষ সঠিক জ্ঞানতত্ত্বে উপনীত হতে পারে; সেদিক থেকে প্রকৃতির নিয়মেই ধর্ম, ন্যায়পরায়ণতা, ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নিহিত; প্রকৃতির নিয়মকে উদ্‌ঘাটিত করতে হলে এবং তার থেকে মানুষ ও সমাজের পালনীয় অন্যান্য নিয়মে পৌঁছতে হলে যুক্তিবাদী মননির্ভর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা থাকা চাই। তাঁর কথায়—"বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য।" ঈশ্বর শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন—কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাতীত, অতীন্দ্রিয় ও উপাস্য কোনো শক্তি নন।

ইউরোপের মধ্যযুগীয় অধ্যাত্মবাদীদের মতো তিনি একথা বিশ্বাস করতেন না যে চূড়ান্ত প্রাকৃতিক নিয়ম মানুষের গোচরীভূত হয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম কালক্রমে আরও উদ্‌ঘাটিত হতে পারে; হলে সে-নিয়ম অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এ-কথায় বোঝা যায় যে তিনি অন্ধবিশ্বাসকে আদৌ সমর্থন করতেন না, বস্তুত বিবর্তনের গতিপথে জ্ঞানের রাজ্য সম্প্রসারিত হয়। বিজ্ঞানই মানুষের যাবতীয় বিধিব্যবস্থার আদর্শ ও মানদণ্ড।

অক্ষয়কুমারের সমাজের উৎপত্তি-প্রত্যয় অ্যারিস্টটলের চিন্তায় প্রভাবিত। সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) বশেই তাঁর মতে সমাজের উদ্ভব ঘটে—যুক্তি অথবা চুক্তি সমাজসৃষ্টির কারণ নয়।[১৮] এবিষয়ে তিনি রামমোহনের অনুগামী—রামমোহন সমাজসৃষ্টির কারণস্বরূপ চুক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না। চুক্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে সমকালীন ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতামত উভয়কেই প্রভাবিত করেছিল। অক্ষয়কুমার এবিষয়ে মৌমাছির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

> পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য করা মধুমক্ষিকার স্বভাব। যদি এক একটি মধুমক্ষিকা এক একটি প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে স্থাপিত হয়, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎকার ও একত্র সহবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে অপর্য্যাপ্ত আহার-দ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ শক্তিসহকারে সমবেত যত্ন দ্বারা যেরূপ সুখ সম্ভোগ ও কার্য্য সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্যই অসুখে কালযাপন করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বিষয়ও অবিকল সেইরূপ…সমাজবদ্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর মধ্যে একত্র বাস করাই মনুষ্যের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত নহে।[১৯]

তাঁর মতে ঈশ্বর স্নেহ, দয়ামায়া, ভালবাসা প্রভৃতি কতকগুলি সহজাত গুণে মানুষকে যেমন মহিমা দান করেছেন, তেমনি ঐসব বৃত্তিগুলির স্ফুরণার্থে প্রয়োজন সমাজবদ্ধতার প্রবৃত্তিতেও তাকে মণ্ডিত করেছেন। বিষয়টিকে তিনি আরও সবিস্তারে বোঝানোর জন্যে বলেছেন—

> মনুষ্যাদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ নির্ম্মাণ, শস্য উৎপাদন, নৌকা গঠন, বস্ত্র বয়ন ইত্যাদি যাবতীয় সুখ-সাধন ব্যাপার লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজবদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক চরিতার্থ হইয়া অশেষ সুখ সঞ্চার করে…যিনি আমারদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমারদিগের গৃহস্থ ও জনসমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে স্বভাবতই অন্য সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়।[২০]

সহজাত প্রবৃত্তি-প্রসূত ও প্রকৃতির বিধানাশ্রয়ী প্রত্যয় ছাড়াও সমাজকে তিনি জীবদেহ (organic) সদৃশ মনে করতেন। ঘড়ির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,[২১] যেমন ঘড়ির বিভিন্ন অংশের নিজ নিজ কাজ ও গঠনবৈচিত্র্য আছে এবং সেগুলির

সমন্বয়ে ঘড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে চলে থাকে, তেমনি মানুষও আত্মস্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গস্বরূপ সমাজের সঙ্গে সে সুসংবদ্ধ। যন্ত্রসদৃশ সমাজও একটা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান। মানুষ প্রাণীসদৃশ সমাজের অংশ, তাই ব্যক্তিমানুষের মঙ্গল সমগ্র সামাজিক মঙ্গলেরই নামান্তর। বেনথামের প্রত্যয়াশ্রয়ী মানুষের অহংপ্রবৃত্তিতে অক্ষয়কুমার বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে করতেন যে সমাজের সুষম বিকাশের মধ্যেই ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ঈশ্বর চান সকলের মঙ্গল; তাই তিনি মানুষের মধ্যে একদিকে যেমন অহং ভাব সঞ্চারিত করেছেন, তেমনি তার মনে এ-বোধও দিয়েছেন যে অপরের স্বার্থ রক্ষার মধ্য দিয়েই নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব। অপরের তথা সমাজের স্বার্থকে উপেক্ষা করে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের মনোবৃত্তি প্রকারান্তরে নিজেরই ক্ষতির কারণ হয়।

তাঁর মতে সামাজিক সকল বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য সর্বাত্মক কল্যাণসাধন—এবং তার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল ব্যক্তিমানুষের স্বীয় স্বার্থকে সমষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভাসিত করে তোলা। কথাটি laissez-faire মতবাদের প্রকারান্তর মনে হতে পারে—বস্তুত এ-মনোভাব তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় প্রাধান্য পায় নি—কারণ তিনি নিজেই বলেছিলেন যে অহং যেমন মানুষের একটি প্রবৃত্তি তেমনি পরার্থপরতাও মানুষের অপর একটি সহজাত প্রবৃত্তি। একের স্বার্থকে অপরের মনে তিনি প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন। মানুষের মধ্যে স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্য পরিণামে প্রতিটি ব্যক্তিকেই সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী করে তুলবে। স্বার্থের এই উদার ও উদ্ভাসিত চিত্র মানুষের মনোজগতে যে অনুপস্থিত সে-বিষয়ে অক্ষয়কুমার অবহিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন স্বার্থের অমিল ও সংঘাতই সমাজের যা কিছু দুঃখকষ্টের মূল। এ-কথার নজির হিসাবে দেখিয়েছেন যে কোনো দেশের রাজা পররাজ্য লোভে যখন অন্ধের মতো যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন উভয় দেশের সাধারণ মানুষ অশেষ দুঃখ ও বিনাশের সম্মুখীন হয়। জনসাধারণ যদি নিজ স্বার্থ ও রাষ্ট্রস্বার্থের অবিচ্ছেদ্যতা উপলব্ধি করে শাসকদের হিংসাত্মক আচরণকে প্রতিনিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়, তাহলে অশান্তি ও যুদ্ধবিগ্রহের অবসান ঘটবে।

ধর্ম ও প্রকৃতির বিধিব্যবস্থাকে উপেক্ষা করলে মানুষের সমুচিত দুর্ভোগ ঘটে। পররাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধবিগ্রহও এ কারণে অমঙ্গল ও বিনাশের পথে মানুষকে নিয়ে যায়। যুদ্ধ মানবিক মূল্যবত্তার পরিপন্থী। বহু সভ্যতাই তাঁর মতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত অক্ষয়কুমার বলেছেন—

ইংরেজরা অধর্ম্ম সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন, এবং অধর্ম্ম সহকারে

শাসন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব, যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া প্রজাদিগের সহিত ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন, সেই সকল মনোবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে।[২২]

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ইংরেজদের ভারতভূমি অধিকারকে তিনি অনুমোদন করেন নি। এরূপ মনোভাব ঐ সময় প্রায় বিরল ছিল। রামমোহন, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের আগমনকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে মনে করতেন।

অক্ষয়কুমার মনে করতেন যে, জন্ম থেকেই মানুষের উপর কতকগুলি দায়িত্ব এসে পড়ে, সেগুলির যথোচিত প্রতিপালন অপরিহার্য। তার মধ্যে নিজের স্বাস্থ্য বজায় রাখা, নিজেকে শিক্ষায় পরিপূর্ণ করে তোলা এবং সন্তানসন্ততিদের সযত্ন লালন ও পালনের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগমনকে ত্বরান্বিত করা—মানুষের জন্মগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। যে মানুষ প্রকৃতই সুখের সন্ধানী তাকে এই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।[২৩] অক্ষয়কুমারের চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নৈতিক আদর্শের সংমিশ্রণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে তার প্রযুক্তির নির্দেশ এদেশের রাষ্ট্রচিন্তায় একটি অভিনব অবদান।

সমাজতত্ত্ব

অক্ষয়কুমারের মতে রাষ্ট্র সমাজেরই দর্পণ। সমাজের চরিত্র ও চেহারা রাষ্ট্রের মধ্যেই ফুটে ওঠে। উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই অবিচ্ছেদ্য। রাষ্ট্র যেখানে দুর্বল ও অরাজকতায় পূর্ণ সেখানকার নাগরিকেরা নিজেদের মধ্যে সুদৃঢ় সম্বন্ধ গড়ে তোলে ও ছোট ছোট গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে লোকেরা এক-একটি গোত্রাধীনে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিবারভুক্ত বলে মনে করে। এ-ধরনের সমাজব্যবস্থা মধ্য এশিয়া ও আরব জাতিগুলির মধ্যে দেখা যায়।[২৪] ভারতের সামাজিক বৈশিষ্ট্যেই এখানকার যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত বলে অক্ষয়কুমার মনে করতেন। তবে রাষ্ট্রশক্তি সবল ও কুশল হলে জনসাধারণের মনে ধন প্রাণ সম্পত্তি সম্পর্কে স্বতঃই নিরাপত্তার ভাব জাগতে পারে; সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি চলে যায়; সমাজসংগঠনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্থান পায়।

তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে গোষ্ঠীর স্বার্থান্বিত সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সরকার ঐ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের প্রতিভূ। ব্যক্তিমানুষ যে-কারণে সমাজবদ্ধ হয়েছে সেই কারণ বা উদ্দেশ্য সরকারি কার্যকলাপের অঙ্গীভূত হওয়া

বাঞ্ছনীয়—যূথবদ্ধ প্রচেষ্টা বিনা বহু কাজই সাধন করা যায় না। অক্ষয়কুমার আরও মনে করতেন যে, সরকারের কাজ শুধু লোকের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষাই নয়, তাদের বৈষয়িক উন্নয়ন এবং দেহ ও মনের বিকাশ সাধনেও সহায়তা করা অন্যতম কর্তব্য। লোকে স্বাস্থ্যহীন হলে তারা তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়। একের রোগ অপরের ভিতর সংক্রামিত হয়। লোকের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞান বিস্তারও সরকারের কাজ। ঠিক তেমনি নীতিজ্ঞান ও মননশীলতার সাহায্যে মানুষের ইন্দ্রিয়াসক্তি সংযত না হলে সমাজেরই অশেষ দুর্গতি ঘটে—সেজন্যে জনসাধারণের নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশসাধনার্থে সরকারকে শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হতে হবে। যে-সরকার জনসাধারণের কাছে তার এইসব দায়িত্ব পালনে অক্ষম, সে-সরকার রিক্ত অধমর্ণের ন্যায় দোষী। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন সরকারের একটি গুরুদায়িত্ব তেমনি দৈহিক জ্ঞান ও মানবিক মূল্যবত্তায় মানুষকে সুশিক্ষিত করে তোলাও সরকারের আদর্শ হওয়া উচিত।

সমাজসংস্কারে অক্ষয়কুমারের চিন্তা ও চেষ্টাও স্মর্তব্য। পূর্বসূরী রামমোহন ও সুহৃদ বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রয়াসের তিনি অনুগামী ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি বিবাহের বয়সকে আইনের সাহায্যে বর্ধিত করার দাবি উত্থাপন করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ভারতে লোকে শিক্ষা সমাপ্তির পর ১২ থেকে ৩৬ বৎসর কালাবধি বিবাহ করতেন; মেয়েদেরও বিবাহ হত এমন বয়সে যখন তাদের স্বামী মনোনয়নের বুদ্ধি দেখা দিত। জার্মানির নজির উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে সেখানে বিবাহের ন্যূনতম বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২৫ এবং নারীর ক্ষেত্রে ১৮; স্ত্রীকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে সক্ষম জেনে তবেই সেখানকার যাজক ও কর্তৃপক্ষ লোককে বিবাহের অনুমতি দিতেন। ভারতেও এ-ধরনের আইন থাকা আবশ্যক বলে তিনি অনুভব করেন—নইলে ভারতের সুখ ও সমৃদ্ধি সুদূর পরাহত। বিবাহ সম্পর্কে তাঁর মতামতের সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—

১. 'কন্যা ও পুত্রের পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইবার পূর্ব্বে পরস্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের স্বভাব ও মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ, সদসৎ চরিত্র পরীক্ষা এবং প্রণয় সঞ্চার হওয়া আবশ্যক…'

২. 'শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে এবং জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবর্তী হইলে, পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে…'

৩. 'পিতৃকুল, মাতৃকুল অথবা তত্তৎ কুলের কোন শাখা প্রশাখা হইতে কন্যা ও পাত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে…'

৪. 'অসুস্থকায়, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে…'

৫. 'স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্য্যের রীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবশ্যক…'

৬. 'এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য, অধিবেদন অর্থাৎ বহু-বিবাহ কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে…'[২৫]

উপরিউক্ত আলোচনাতেই তিনি সুপ্রজননবিদ্যা (eugenics) ও শরীরতত্ত্বের দিক থেকে বাল্যবিবাহের অহিত দর্শিয়েছেন। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের এবিষয়ে অভিমতের সঙ্গে সমকালীন বৈজ্ঞানিকদের মতামত উল্লেখ করে অপরিণত বয়সে বিবাহের অপকারিতা বিশ্লেষণ করেছেন। জলবায়ুর তারতম্য অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বিবাহের বয়স নির্ধারণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। শীতল দেশে যে-প্রথা প্রচলিত তা উষ্ণ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। কাজেই শীতল দেশকে এবিষয়ে আদর্শ জ্ঞান করা অনুচিত। বিবাহের ন্যূনতম বয়স সরকারের বেঁধে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। বহুবিবাহের অপকারিতা প্রসঙ্গে লোকের নিষ্ক্রিয়তায় সরকারকেই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হচ্ছে বলে তিনি অনুশোচনা করেন। সেজন্যে ব্যক্তি ও পরিবারের ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন। স্ত্রী কিংবা স্বামী কেউ যদি অবৈধ যৌন সংসর্গ করে অথবা একের প্রতি অপরে নিষ্ঠুর আচরণ করে তাহলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের সাহায্যে তাদের বিবাহ নাকচ করে দেওয়া উচিত। বিবাহকে হিন্দুরা ধর্মাচরণ মনে করে, তাতে চুক্তি বলে কিছু নেই—অক্ষয়কুমার হিন্দুদের এই প্রথার নিন্দা করেছেন। পরবর্তী কালে কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম বিবাহ বিল অক্ষয়কুমারের 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থ থেকেই অনুপ্রাণিত বলে মনে করা হয়।[২৬]

বিধবা বিবাহের অনুকূলে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে (চৈত্র, ১৭৭৬ শকাব্দ) অক্ষয়কুমার পুরুষদের বহুবিবাহ প্রবণতার নজির, বিধবাদের আর্থিক দুর্গতি, বাল্যবিধবাদের আত্মীয়পরিজনদের মনোকষ্ট, বাল্যবিধবাদের স্বাভাবিক পদস্খলন, ভ্রূণহত্যা, কুলীনদের বহুবিবাহের ফলে সামাজিক অধোগতি ও সতীদাহ নিবারণের মত বিধবা বিবাহেও শাস্ত্রের সমর্থন থাকা বিষয়ে যেসব জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন তা বিদ্যাসাগরের আন্দোলনকে মদত যোগায়। সুরাপানদোষ (alcoholism) কিরূপে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অহিত সাধন করে থাকে সে বিষয়ে অক্ষয়কুমার তথ্যবহুল প্রমাণের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে নিজ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২৭]

দ ণ্ড নী তি

১৮৫৫ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দণ্ডনীতির উপর কয়েকটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেগুলিতে তিনি কয়েদিদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয় তার সমালোচনা করেন। কারাগার প্রশাসন সম্পর্কিত 'অ্যাডমিনস্ট্রেটিভ রিপোর্ট'-এর তথ্যগুলি উল্লেখ করে তিনি দেখান যে অশেষ নির্যাতন ও অত্যাচার সত্ত্বেও বাংলাদেশে অপরাধপ্রবণতা কমার পরিবর্তে বেড়েই চলেছে। এই রিপোর্টের বহু পূর্বে প্রকাশিত জেলখানার স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিষয়ে 'হাচিনসন রিপোর্ট'-এ বলা হয়েছিল যে ছ'শো কয়েদির মধ্যে ১৮২৯ সালে ১৬৬ জনের মৃত্যু ঘটে। তাতে কয়েদিদের জীবন সম্পর্কে একটি করুণ চিত্র দর্শিয়ে একথাও বলা হয় যে অতি প্রত্যুষে উঠে সায়াহ্নকাল অবধি কয়েদিদের রোদ ও জলের মধ্যে কাজ করতে হয়; মাঝে ঘণ্টা খানেকের জন্যে থাকে আহারের বিরতি; আহারের জন্যে তাদের মাথাপিছু মাত্র দু-তিনটি পয়সা দেওয়া হয়। ১৮৩৬ সালে মেকলের সভাপতিত্বে গঠিত এক উপদেষ্টা কমিটি কয়েদিদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচারের বহর আরও বাড়ানোর সুপারিশ করে।[২৮]

একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে অক্ষয়কুমারের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে বিশ্বপ্রকৃতি নিয়মনিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়মাধীনে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করলে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডভোগ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং সেই নিয়মের সঙ্গে সামাজিক দণ্ডনীতিও সম্পৃক্ত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির দিক থেকে দণ্ডের প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়—শুধুমাত্র শাস্তি দিয়ে মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি দূর করা যায় না। সেগুলির কারণ নির্মূল না হলে কুপ্রবৃত্তি মানুষের অন্তরে থেকেই যায়। এ-প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার মনস্তাত্ত্বিক বিচারে তিনটি কারণ দেখিয়েছেন—

১. 'কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অত্যন্ত প্রবল থাকাতে তাহার আতিশয্য দ্বারা আপনা হইতেই পাপ-কর্মে প্রবৃত্তি হয়;'

২. 'বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও দুষ্মর্তি উপস্থিত হয়';

৩. 'কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও অনেকানেক কুকর্ম্ম ঘটিয়া থাকে।'[২৯]

কারণগুলির প্রথমটি সহজাত, দ্বিতীয়টি পরিবেশজনিত এবং তৃতীয়টি অশিক্ষা প্রসূত। কুশিক্ষা ও অশিক্ষার দরুন অনেক সামাজিক দুর্নীতির উদ্ভব হয়, যেমন সতীদাহ, সাগরে সন্তান বিসর্জন ইত্যাদি এবং সেগুলি সামাজিক আইনে অবৈধ নয়। মানুষের অপরাধ প্রবণতার কারণ দূরীকরণ ও অপরাধীদের শাস্তিবিধান প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত মতামত হল—

১. অপরাধীকে কারারুদ্ধ করে তার মানসিক চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। সেই সঙ্গে তাকে কাজেও নিযুক্ত রাখতে হবে।

২. কারাগারে সম্ভাব্য অসৎ সংসর্গ থেকে অপরাধীকে সরিয়ে রাখতে হবে।

৩. উত্তম শিক্ষকের সাহায্যে অপরাধীর বুদ্ধিবৃত্তির মার্জনা ও ধর্মপ্রবৃত্তির বিকাশ এবং কারাগারে সাধু ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ ও পরিদর্শনের সাহায্যে অপরাধীদের সদুপদেশ প্রদানের ব্যবস্থা।

অক্ষয়কুমার কয়েদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সম্পর্কে বলেন যে তারা অশুভ প্রবৃত্তির বশে অপরাধে লিপ্ত হয়। দণ্ডের উদ্দেশ্য যদি অপরাধ নিবারণ হয় তবে দেখা দরকার কি কারণে তারা ঐসব কাজে প্রবৃত্ত হয়। অবশ্য এ-প্রচেষ্টা কোনো দেশেই হয় নি। ফলে অসহ্য পীড়ন সত্ত্বেও সর্বদেশেই অপরাধীর সংখ্যা না কমে বেড়েই গিয়েছে। দণ্ডনীতির উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রতিহিংসা। এ-বিষয়ে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই কথা অনুভব করেছেন যে, শাস্তিদানের নামে মানুষের পশুবৎ প্রতিহিংসা গ্রহণের অবদমিত ইচ্ছা প্রকাশ পায়। অক্ষয়কুমার মনে করতেন যে রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য মানুষের অশুভ প্রবৃত্তির দমন ও তার উন্নত মনোবৃত্তির উন্মেষ সাধন। ইদানীং মানবতন্ত্রী একদল সমাজতাত্ত্বিক কয়েদিদের প্রতি সদয় আচরণ ও সরকারি নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। কয়েদিরা মনের দিক থেকে রুগ্ন—তাদের মানসিক চিকিৎসা হওয়া উচিত—শাস্তি নয়। অবশ্য তাদের আটকে রাখা দরকার, নইলে তাদের মানসিক রোগের ছোঁয়াচে-প্রভাবে সমাজের বাকি সুস্থ লোকেরা আক্রান্ত হতে পারে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার সঙ্গে তাদের সক্রিয় জীবনে অভ্যস্ত করতে হবে। বিভিন্ন জীবিকায় তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা দরকার, যাতে তারা মুক্তির পর অর্থোপায়ের পথ খুঁজে পায়।

অক্ষয়কুমার মৃত্যুদণ্ডকে অন্যায় ও বর্বরতা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ তাতে হত্যা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটে না। এইজন্যে যে, যখন কেউ খুন করে তখন সে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষমতা থাকে না এবং নিজের জীবনের জন্যেও সে তখন পরোয়া করে না। অনেক ক্ষেত্রে হত্যার পর হত্যাকারী নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দেয়। এসব লোককে ফাঁসি দেওয়া অর্থহীন ও অমানুষিকতা। খুনীকে নির্বাসনে দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না—কারণ তাতে তারা ভিন্ন স্থানে গিয়ে অন্যান্য সৎলোককে কলুষিত করার সুযোগ পায় এবং সামাজিক বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করে হীন ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হতে পারে।

শি ক্ষা চি ন্তা

শিক্ষকতা অক্ষয়কুমারের একসময়ে উপজীবিকা ছিল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং পরে বিদ্যাসাগরের নর্ম্যাল স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষকতা করেছিলেন। শিক্ষার বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে গভীর চিন্তা ও অধ্যয়ন করেন। বঙ্গদেশের শিক্ষাতত্ত্বে তাঁর অবদান অসামান্য।

জনশিক্ষাই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। এদেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাঁর 'ধর্ম্মনীতি' গ্রন্থটিতে (১ম ভাগ, ৮ম অধ্যায়) পাওয়া যায়। নর্ম্যাল স্কুলের কার্যকালে বইটি রচিত। ঐসময়ে ছাত্রদের উপযোগী 'চারুপাঠ' প্রভৃতি কয়েকটি উৎকৃষ্ট পাঠ্যগ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। বাংলার নবজাগৃতির মানসক্ষেত্র তাঁর লেখনীর কর্ষণে বহুলাংশে উর্বর হয়ে উঠে। অক্ষয়কুমারের শিক্ষা সম্পর্কিত আদর্শ ও পদ্ধতি আজকের দিনেও প্রযোজ্য। কেশবচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ উত্তরসূরীরা অনেকেই তাঁর শিক্ষাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়।

শিক্ষার বিষয়টিকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার সাহায্যেই দেশের যাবতীয় দুর্গতির নিরসন হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে এদেশের জাগৃতি ও নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গেই তিনি শিক্ষাকেও যুক্ত করেন। তাঁর মতে—

> তাঁহাদের রাজ্যের সর্ব্বস্থানে শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা যেমন বিধেয়, অপর সাধারণ সকল প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিষয়ে শিক্ষাদানের বিধান করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য।[৩১]

শিক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজও দুর্বল হয়ে পড়ে। পনের বছর বয়স অবধি ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সরকারের উদ্যোগ একান্তই কাম্য। দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় শিক্ষায় বঞ্চিত হয়ে রুজিরোজগারে শিক্ষানবিশিতে নিযুক্ত হয়—এর বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৫৫ সালে যখন তিনি একথা উচ্চারণ করেন তখন ইংলণ্ডেও এ-দাবি স্বীকৃতি পায় নি। সরকারি প্রচেষ্টায় বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়নির্বাহের প্রশ্নে অক্ষয়কুমার বলেন যে সরকারের গরজ থাকলে অর্থাভাব ঘটবে না। সরকার যদি সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস করেন এবং ধনবান-দের বিলাসব্যসনে অর্থের অপচয় সংকোচনে সমর্থ হন তাহলে শিক্ষাবিস্তারে অর্থাভাব থাকবে না। সেজন্যে তিনি জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করেন—

রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে আহুতি প্রদান করিয়া নর-কণ্ঠ নিঃসৃত শোণিত প্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করেন, এবং প্রজাগণ অনিষ্টকর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও সুরারূপ সাংঘাতিক গরল গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে উজ্জ্বল ও ধর্ম্মভূষণে বিভূষিত করিয়া তাহাদিগের হীনতা ও দীনতা পরিহার পূর্ব্বক সৌভাগ্য সাধন উদ্দেশ্যে ব্যয় হইলে, জনসমাজ কতদিন আর এরূপ শ্রীহীন থাকে ?[৩১]

'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় অক্ষয়কুমার একসময় বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রামে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় অনুশোচনা করেন। তিনি সরকারকে ঐসব গ্রাম থেকে শিক্ষাবাবদ চাঁদা তোলার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে তাতে আপত্তির পরিবর্তে জনসাধারণ সাগ্রহে সাড়া দেবে। বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার জন্যে গঠিত Council of Education-এর উপর চাঁদা থেকে সংগৃহীত অর্থ রক্ষণ ও ব্যয়নির্বাহের দায়িত্ব অর্পণের সুপারিশ করেন।

তিনি শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের এক বিস্তারিত পরিকল্পনার খসড়া তৈরি করেছিলেন। এই খসড়ায় তিনি দু-বছর বয়স থেকেই ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা বলেছেন—ছোটদের কাছে তখন বিদ্যালয় হবে খেলার জায়গা ; ঐ সময়ে তাদের হাতেকলমে শরীর-স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রারম্ভিক শিক্ষা দেওয়া হবে। তারা তখন পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার রীতিনীতিও শিখবে। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ ও মানুষের তৈরি জিনিসপত্রের সঙ্গে পরিচয় ও পার্থক্যবোধ তাদের গড়ে উঠবে। শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনা ও আচরণের মধ্য দিয়ে শিশুদের সহজাত শুভবৃত্তির উন্মেষ ঘটবে ; শিশু অন্যায় করলে তাকে সাজা দেওয়া নিশ্চয় দরকার—কিন্তু তা মারধর করে নয়—শিশুদের পঞ্চায়েত ডেকে শিক্ষকের পরিচালনায় দোষীর বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা হবে। এর ফলে অভিযুক্ত শিশু লজ্জিত হবে এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য শিশুদেরও অন্যায় আচরণ সম্পর্কে সজাগ করে তুলবে। বিদ্যালয়ে যন্ত্রবৎ কিছু বানান মুখস্ত না করিয়ে বস্তুমুখী শিক্ষা ও গণিত শিক্ষাদানের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষকতা মানুষ গড়ারই নামান্তর, সেজন্যে শিক্ষাকার্যে নিয়োগের পূর্বে শিক্ষকদের যথোচিত শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা চাই। একথা বিদ্যাসাগরও বিশেষ অনুভব করেছিলেন এবং নর্ম্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন প্রধানত এই কারণেই।

অক্ষয়কুমারের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় স্তর ৬ থেকে ১৪ কিংবা ১৫ বছর বয়স অবধি বিস্তারিত। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রাকৃতিক পরিবেশে বসার ব্যবস্থা থাকবে ; গাছপালা ও কুঞ্জে পরিবৃত বীথিকার দুধারে থাকবে দেশবিদেশের মনীষীদের আবক্ষ মূর্তি। অল্প ব্যবধানে স্থাপিত কাঠের তক্তায় লেখা থাকবে

নানা নীতিকথা ও আদর্শ বাণী। এই শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে ক্রমে ছাত্রদের ভাষা, ইতিহাস, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাদানের তিনি সুপারিশ করেন। সেইসঙ্গে ছবি, চার্ট ইত্যাদি সরঞ্জামের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় বোঝানোর উপযোগিতাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

ইতিহাস পড়ানোর সময় যুদ্ধবাজ বীরদের আদর্শ ছাত্রদের কাছে তুলে ধরা তাঁর মতে অনুচিত। ঐ সব চরিত্র পাঠের সময় ঈর্ষা, লোভ, হিংসা, যুদ্ধ ইত্যাদি অহিতকর বিষয়ে ছাত্রদের চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। ব্যায়ামের উপর অক্ষয়কুমার খুবই গুরুত্ব দিতেন। দৈহিক শক্তির অভাবেই তাঁর মতে বিশ্বের বহু সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আক্রমণকারী কোনো জাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যে সৃষ্ট শক্তিমত্তা ও নিম্নপ্রবৃত্তিগুলি মানুষকে ক্রমে যেন অবনতির পথে নিয়ে না যায় সে-সম্পর্কে তিনি সতর্ক করে দেন।

অক্ষয়কুমারের পরিকল্পিত শিক্ষার তৃতীয় স্তরে বলা হয়েছে যে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্রই কেবল বিশ থেকে বাইশ বছর বয়স অবধি উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে। বাকি সাধারণ মেধার ছাত্রদের কারিগরি এবং পেশার পক্ষে উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বগত উচ্চশিক্ষা তাদের ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন—"গ্রামে গ্রামে কৃষিবিদ্যালয় ও শিল্পবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক।" শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে উত্তরকালের জীবিকা নির্বাহের একটা সংগতি থাকা প্রয়োজন। কৃষি ও কারিগরি শিক্ষাবিস্তারকার্যে তিনি সরকারি উদ্যোগ দাবি করেন; ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কলকারখানা, যন্ত্রপাতি নির্মাণ প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার যথোচিত সংযোগ থাকা চাই। শিক্ষার সঙ্গে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সংগতি বজায় রাখার মতো শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের অবস্থানকেও তিনি অপরিহার্য জ্ঞান করতেন। অক্ষয়কুমারের রচনায় এদেশে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিন্তা বোধ হয় সর্বপ্রথম দেখা যায়—

> নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপন করাও কর্ত্তব্য। আবশ্যকমত সমুদায় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব, সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রান্ত সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্যক। তাহা হইলে, লোকে তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ-জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে।[৩২]

জনশিক্ষা সম্প্রসারণে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষায় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনকে সমধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। পাঠ্যপুস্তকের গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও বৃদ্ধির চিন্তাও তাঁর ঐ আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

রামমোহন ইংরেজির মাধ্যমেই উচ্চ শিক্ষার প্রসারকামী ছিলেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার মাতৃভাষায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে একটা বিদেশী ভাষা প্রথমত আয়ত্ত করাই শক্ত—তার উপর সাধারণ গরিব লোকের পক্ষে সীমিত সময়ে আর-একটি ভাষা শেখা অসম্ভব ও অকার্যকর। একথা তিনি ভালভাবেই অনুভব করেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুফল সমাজের সর্বনিম্ন স্তরেও পেঁছিতে পারে ; সেক্ষেত্রে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন কেবল উচ্চস্তরের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। তিনি দেখিয়েছেন যে ইতিপূর্বে যাঁরা ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বদেশের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা বিজাতীয় উন্নাসিক ভাব দেখা দিয়েছে। তাছাড়া মাতৃভাষার তুলনায় ইংরেজিতে শিক্ষাদানের ব্যয়বাহুল্য চার গুণ বেশি। মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তকের অভাব সম্পর্কে অক্ষয়কুমার যথেষ্টই সচেতন ছিলেন। প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভাল বই বাংলায় অনুবাদ করিয়ে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার পথকে তিনি সুগম করতে চেয়েছিলেন। তবে ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে তিনি অবহেলা বা বর্জনেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। সরকারি কাজকর্ম মাতৃভাষায় হওয়াটাই তাঁর কাছে কাম্য ছিল। শিক্ষার বিস্তারে সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকাই প্রধান বলে অক্ষয়কুমার অভিমত প্রকাশ করেন।[৩৩]

আ র্থ নী তি ক চি ন্তা

তত্ত্বগতভাবে অর্থনীতি সম্পর্কে অক্ষয়কুমার পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনা করেন নি। সমসাময়িককালে জনসাধারণের দুঃখ ও দারিদ্র্য প্রসঙ্গে তাঁর বিভিন্ন উক্তি ও মতামতের খণ্ড চিত্রগুলির সমাহরণে একটি সুস্পষ্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই মনোভাবকে সাম্যপন্থি (egalitarian) বলা চলে, যেটা পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে।

ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ সম্পর্কিত অবিচ্ছেদ্যতা থেকে তিনি এই প্রত্যয়ে উপনীত হন যে জনসাধারণের বৃহদংশ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত থাকলে পরিণামে সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হয়। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যমোচন না হলে সমগ্র সমাজের দুর্দশা বেড়েই চলে। দুঃখী মানুষ সামাজিক কল্যাণের অনুকূল না হয়ে অহিতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অশিক্ষা, মাদকতা ও কর্মশৈথিল্য দেখা দেয়—উদ্ভূত হয় নানাবিধ অপরাধ-প্রবণতা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাব। দুঃখী মানুষ কোনও রীতিনীতি ও আইনকানুন বোঝে না ; বুঝলেও দারিদ্র্য তাদের সে-বিষয়ে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ; ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। নির্বিত্ত,

স্বাস্থ্যহীন ও রোগাক্রান্ত মানুষের সঙ্গে একই সমাজে বিত্তবান ও সুস্থ মানুষের সহাবস্থান অসম্ভব। ধনবৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল—সেজন্য মহামারী লাগলে সকলেরই জীবন হয়ে পড়ে সংকটাপন্ন।[৩৪]

সমাজের বৈষয়িক, নৈতিক ও মননশীল বিকাশের প্রয়োজনে তিনি দারিদ্র্যকে সর্বপ্রথমে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে ধনীরা সব দেশেই উৎকৃষ্ট বস্তুসম্ভার উপভোগ করতে চায় এবং মনে করে যে অন্যেরা তাদের সুখ ও উপভোগের রসদ জোগাবে। যে-সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার জন্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অহোরাত্র হাড়ভাঙা পরিশ্রমে রত থাকে সেখানে সামাজিক উন্নতি আয়ত্তের অতীত। ঈশ্বর মানুষকে বুদ্ধি ও নীতিবোধ দিয়েছেন। দারিদ্র্যের ফলে মানুষ ঈশ্বরদত্ত ঐ সত্তা থেকে বঞ্চিত।[৩৫] অক্ষয়কুমার সেজন্যে বলেছেন যে বিত্তবান ও বুদ্ধিমানদের উচিত শ্রমজীবীদের জ্ঞান ও উন্নতি অর্জনে সাহচর্য দেওয়া। সেইসঙ্গে সরকারকেও তিনি প্রয়োজনীয় আইনের সাহায্যে জনহিতার্থে যত্নবান হতে উপদেশ দেন। তিনি মনে করতেন যে রাষ্ট্র জনসাধারণেরই প্রতিভূ। জনসাধারণের উপর অনর্থক কর আরোপের কোনো অধিকার নেই।[৩৬] মানুষ চায় নিজের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষার অধিকার —সেই অধিকারকে বজায় রাখতে যতটুকু প্রয়োজন ততটা কর সরকার অবশ্য আদায় করতে পারেন। তাঁর মতে ভারতে ইংরেজ সরকার প্রজাদের প্রতি এই ন্যূনতম কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছে—গ্রামীণ অধিবাসী ও রায়তদের দুঃসহ অবস্থাই তার মস্ত প্রমাণ।

দারিদ্র্যের পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে মানসিক জড়তা, বাল্যবিবাহ, ক্রিয়াকর্মে কুসংস্কার, মাদকতা, ভূস্বামীদের অত্যাচার, বাণিজ্যিক জটিলতা ছাড়াও বন্যাপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগও দারিদ্র্যের উৎস।[৩৭] ম্যালথাসের জনতত্ত্বকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে জনসংখ্যা দেশের সাধ্য অতিক্রম করলে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে পরিবার পালনের ক্ষমতা না থাকলে বিবাহ করা অনুচিত।[৩৮]

দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্যে তিনি কয়েকটি পন্থাও নির্দেশ করেন। ধনবানদের বিষয়সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে তাদের দরিদ্রের স্তরে নামিয়ে আনার তিনি বিরোধিতা করেন—তিনি দরিদ্রকে ধনীর পর্যায়ে উন্নীত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্যে তিনি প্রথমে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাহায্যে লোকের নৈতিক এবং বৈষয়িক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন—যাতে শিক্ষার ফলে স্বতঃপ্রণোদিত মানুষ স্বীয় উন্নতিসাধনে তৎপর হয়। দ্বিতীয়ত আইনানুগ বিধিব্যবস্থার সাহায্যে সাধারণ মানুষের স্বার্থসংরক্ষণের উদ্যোগায়োজন চাই। তৃতীয়ত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যন্ত্রশিল্পের প্রসার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কায়িক-

শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার মানুষকে প্রচুর অবসর দেবে—যে-সময়টা মানুষ তার মনের ক্ষুধা মেটাবার সুযোগ পাবে। এবিষয়ে রাসেল প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়।

রামমোহনের উত্তরসাধক অক্ষয়কুমারও সমকালীন শিল্পোন্নয়নকে আবাহন জানান।[৩৯] জীবনধারণের উপযোগী সমুদয় ভোগ্যপণ্য সংক্ষিপ্ত সময়ে উৎপাদন করে মানুষ উদ্বৃত্ত সময় বা অবসর জ্ঞান ও ধর্মচিন্তায় ব্যয় করতে সক্ষম হবে।

রামমোহন ও অক্ষয়কুমার

আগেই বলা হয়েছে যে অক্ষয়কুমার রামমোহনের সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী জীবনাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বহুবিষয়ে প্রভেদ থাকলেও অক্ষয়কুমার রামমোহনকে আধুনিকতার পথিকৃৎ হিসাবে প্রণতি জানিয়েছেন—

> তুমি বিজ্ঞানের অনুকূল পক্ষে যে সুগভীর রণবাদ্য বাদন করিয়া গিয়াছ তাহাতে যেন এখনও আমাদের কর্ণকুহর ধ্বনিত করিতেছে।[৪০]

ঐতিহাসিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ আরোহী পদ্ধতিতে রামমোহন বিচারবিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমারের পদ্ধতি ছিল অবরোহী অর্থাৎ সাধারণ ও অনুমান থেকে বিশেষে উপনীত হওয়া।

সমাজসংস্কারই ছিল রামমোহনের লক্ষ্য; প্রচলিত সাংস্কৃতিক ধারাকে তিনি নস্যাৎ করে দিতে চান নি। শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলিকে তিনি যুক্তির কষ্টি-পাথরে যাচাই করে নিতেন। অক্ষয়কুমার সেদিক থেকে বরং অনেকটা আপস-বিরোধী ছিলেন—মূলত তিনি ছিলেন এক তাত্ত্বিক—সবকিছুকেই তিনি সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের বিচারে গ্রহণ করতেন।

রামমোহন বিবাহব্যবস্থায় শৈবপদ্ধতি প্রয়োগ অবধি এগিয়েছিলেন, সেক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার প্রচলিত বিধিব্যবস্থা যুক্তির সাহায্যে ভেঙে দিতে চান। বিধবা-বিবাহতো বটেই, অসবর্ণ বিবাহ ও প্রাকবিবাহ প্রণয় এবং পরিচয়াদিরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন; বিবাহ বিচ্ছেদকে তিনি সমর্থন করতেন—বিশেষ করে যেখানে স্বামী অথবা স্ত্রী দুশ্চরিত্র, অথবা মনের মিল যেখানে অনুপস্থিত কিংবা স্বামী যেক্ষেত্রে স্ত্রীকে প্রহার করে। যৌবনোদ্গমের পূর্বে বিবাহরীতির তিনি বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে সকল বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম পালনই বাঞ্ছনীয়।

রামমোহন মনে করতেন যে এদেশে নীলচাষসূত্রে ইংরেজদের আগমন ও বসবাস ঘটলে পরিণামে এখানকার শিল্পোন্নয়ন তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক

অবস্থার উন্নতি হবে। তাঁর কাছে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে অভিযোগ অতিরঞ্জিত ও কায়েমী স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। বৈপরীত্যে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ-বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে নীলকরেরা এদেশীয় কৃষকদের সর্বনাশের মূল। পরবর্তী কালে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লঙ সাহেব ও দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা যে আন্দোলন শুরু করেন অক্ষয়কুমার তথা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকেই তার পুরোগামী বলে মনে করা হয়।[৪১]

ইংরেজদের ভারত শাসন সম্পর্কে রামমোহন যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন তার অনেকাংশে ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ করেন অক্ষয়কুমার। তাই রামমোহনের মতো তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হতে পারেন নি। সরকারের প্রতি তাঁর অপ্রসন্ন মনোভাবের প্রধান কারণ ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সমবেদনা ও আবেগপূর্ণ দরদ। সরকারের কাজ যেখানে মানুষের নৈতিক ও বৈষয়িক মানোন্নয়ন, সেখানে অপরাধীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও কৃষকদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সরকারি ব্যর্থতারই প্রমাণ। জনগণের এই দুঃখদুর্দশার জন্যে তিনি সরকারকে অভিযুক্ত ও নিন্দা করেন। বৃহত্তর জনজীবনের অর্থনৈতিক সংকটের জন্যে তিনি ইংরেজ শাসনকেই দায়ী করেন। মফস্বলবাসী ও কৃষকদের দুঃসহ জীবনের চিত্র তিনি নিরন্তর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে দেশের শিক্ষিত জনমানসে তুলে ধরতেন। মানুষের জীবনে নিরাপত্তার অভাব যে ইংরেজ সরকারের অক্ষমতার ফলেই উদ্ভূত সেকথা তিনি নির্ভয়চিত্তে প্রকাশ করেন।

অত্যাবশ্যক ভোগ্যবস্তুর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির জন্যে তিনি সরকারের প্রতি দোষারোপ করে বলেন যে দেশবাসীর বিশেষ করে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও শরীর ভগ্নপ্রায়। তবে ঐসব দোষারোপ সর্বাংশে সত্য নয় এবং সেগুলি কিছুটা অতিশয়োক্তি ও একদেশদর্শিতা বলে মনে করা হয়।[৪২]

রামমোহন ইংরেজ সাম্রাজ্যাধীনে সমমর্যাদাসম্পন্ন অধিকার চাইতেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার সর্বপ্রকার পরাধীনতাকেই অপছন্দ করতেন। হিন্দুর নরক, মুসলমানের 'জাহান্নম' ও খ্রীষ্টানের 'হেল' অপেক্ষা পরাধীনতা হেয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৩] দেশের দুঃখমোচনের জন্য তিনি বিলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ-বিষয়ে অনুসন্ধান ও যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, অবস্থাবিপাকে আমরা ইংরেজদের সানন্দে সবকিছু সমর্পণ করে এদেশের রাজসিংহাসনে বসিয়েছি—তাদের উচিত এদেশবাসীর যথোচিত মঙ্গলসাধন। রামমোহন সুরাপানের বিরোধী ছিলেন না; কিন্তু অক্ষয়কুমার স্পষ্টভাবেই সুরাপানের বিরোধিতা করেন।

উপসংহার

ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দর্শনের একটি ধারায় অক্ষয়কুমার প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই দার্শনিক চিন্তাধারা প্রকৃতিবাদ (Naturalism) নামে পরিচিত। ডিমোক্রিটাস, লুক্রেটিয়াস, স্পিনোজা প্রমুখ দার্শনিকগণ প্রকৃতিবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন ; কিন্তু তাঁদের মৌল প্রত্যয় ছিল অভিন্ন।

প্রকৃতিবাদীদের মতে বিশ্বচরাচর সুনির্দিষ্ট এক নিয়মাধীনে নিয়ন্ত্রিত। বস্তুর উদ্ভব ও অবলুপ্তি এবং যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা একই নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ ; অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তার দ্বারা তা নির্দিষ্ট নয়। বস্তুময় বিশ্বপ্রকৃতির গতিপথ সুনিয়মিত ; সৃষ্টিস্থিতিলয়ের আধার এই জগৎ চলেছে সেই বাঁধাধরা নিয়মের পথে। বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য, পরিবর্তনের ভিতর স্থায়িত্ব এবং বহুমুখী ও বিস্ময়কর নিসর্গের ভিতর বুদ্ধির গোচরাধীন দৃঢ় এক বস্তুসত্তা বিরাজমান। সেই সত্তার পশ্চাতে কোনো অলৌকিক বা ঐশ অভিপ্রায় নেই।[৪৪]

অণুর উপাদানে গঠিত বস্তুসত্তার প্রকৃতি নিরপেক্ষ ও সমন্বিত এবং তার নিয়মাবদ্ধ গতিপথ চিরন্তন। গতিশীল বিশ্বজগতের ঘটনাপ্রবাহ যেন এক যান্ত্রিক নিয়মাধীনে শৃংখলা ও পারম্পর্যে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেও অনুরূপ নিয়মশৃংখলা ও সাযুজ্য বিদ্যমান। এই নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত নৈসর্গিক পরিবেশের অন্তরালে অতীন্দ্রিয় ও তুরীয় কোনো পরমসত্তার অস্তিত্বকে প্রকৃতিবাদীরা স্বীকার করেন নি। প্রাচীন গ্রীসে এই প্রকৃতিবাদ বস্তুবাদের সরল রূপ পরিগ্রহ করে। প্রকৃতিবাদের ছাঁচে বস্তুবাদ রূপায়িত হয়েছিল বটে, কিন্তু সকল প্রকৃতিবাদীকে বস্তুবাদী বলা যায় না।[৪৫]

অধিকাংশ প্রকৃতিবাদীই নীতিশাস্ত্রকে পরিবেশের অনুসারী জ্ঞান করতেন এবং আধ্যাত্মিক বিচারে প্রকৃতিবাদের প্রধান লক্ষণ নিরীশ্বরবাদ কিংবা অজ্ঞাবাদ। অক্ষয়কুমার অজ্ঞাবাদী হিসাবেই পরিচিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করতেন।[৪৬]

বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি ও মুক্ত মন নিয়ে অক্ষয়কুমার সবকিছুর বিচার করতেন। পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদী চিন্তায় অনুপ্রাণিত হলেও দেশের সনাতন আদর্শ ও প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা কম ছিল না। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থের দুটি খণ্ড তার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

প্রচলিত কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরোধিতা (heresy) করার জন্যে অক্ষয়কুমার, "বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ প্রভৃতি অশুভ দিন ও অশুভক্ষণ দেখিয়া ভ্রমণার্থ যাত্রা করিতেন, কুত্রাপি নির্জ্জন দেবমন্দিরে গিয়া,

আপনার অভিমতানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। যে দিন অপরাপর লোকে যোগ-স্নান ও গ্রহণান্ত স্নান-উদ্দেশে গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইতেছে, ইনি তাহার বিপরীত দিকে সরোবরে স্নান জন্য গমন করিতেন।"[৪৭]

অক্ষয়কুমার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কল্পনা করেন। তিনি সরকারের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে যত বলেছেন সে-তুলনায় জনসাধারণের নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলেন নি। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট। জনগণের দুঃখমোচনের জন্যে তিনি বিলাতের মহানুভব ব্যক্তিদের যত্নবান হতে অনুরোধ জানান। ভারতীয়দের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব সঠিক পালনের জন্যেও তিনি ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি মনে করতেন যেহেতু ভারতীয়েরা ইংরেজদের সার্বভৌম কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত করে নিজেদের জীবন ও ধনসম্পদ তাদের কাছে সঁপে দিয়েছে, সেহেতু তাদেরই উপর ভারতীয়দের কল্যাণসাধনের মহান দায়িত্ব নির্ভর করে।

তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী। তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও বিতর্কক্ষমতা তাঁকে সমকালীন বিদ্বৎসমাজের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও দূরদৃষ্টি তাঁর চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয়। প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রবল স্রোতের বিপরীতে সন্তরণ করার ফলে স্বভাবতই তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। নবীনবাংলার শীর্ষস্থানীয় চিন্তানায়ক অক্ষয়কুমার তাঁর জীবনসাধনাকে সাহিত্য, সাময়িকপত্র ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেন। বাংলার মনন- ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়াসে অক্ষয়কুমারের অবদান অসামান্য।

উ ৎ স নি র্দে শ

১. 'হরপ্রসাদ-রচনাবলী'। খণ্ড ১, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৮২।
২. নগেন্দ্রনাথ বসু, সংকলক। 'বিশ্বকোষ'। ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, খণ্ড ১।
৩. S. K. De. *Bengali Literature in the Nineteenth Century. 1962*, p. 606.
৪. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'আত্মজীবনী'। ১৯৬২, পৃ. ৪১৪।
৫. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ, ১৭৭৭ শকাব্দ। ১৪৯ সংখ্যা, পৃ. ১০।
৬. S. K. De. op. cit. p. 610.
৭. নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। 'অক্ষয়চরিত'। পৃ. ৩৯ (পাদটীকা)
৮. রাজনারায়ণ বসু। 'আত্মচরিত'। পৃ. ৬৮।
৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বৈশাখ, ১৭৭৭ শকাব্দ।
১০. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তদেব। পৃ. ২২০।

১১. সুশীলকুমার দে। 'অক্ষয়কুমার দত্ত', শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ ২১২।
১২. রাজনারায়ণ বসু। তদেব। পৃ ৬৮।
১৩. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'। খণ্ড ১, ১৯০৭, উপক্রমণিকা, পৃ ৪০।
১৪. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, বিজ্ঞাপন।
১৫. সুশীলকুমার গুপ্ত। 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ'। ১৯৫৯। ৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।
১৬. অক্ষয়কুমার দত্ত। তদেব। খণ্ড ১, উপক্রমণিকা।
১৭. P.S. Basu. *Life and Works of Brahmananda Keshub Chandra Sen.* p. 106
১৮. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। ১ম ভাগ, ৭ম মুদ্রণ, ৫ম পরিচ্ছেদ।
১৯. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৫৯-৬০।
২০. অক্ষয়কুমার দত্ত। তদেব। খণ্ড ২, পৃ ২৮-২৯।
২১. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। পৃ ৫৮।
২২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ৩০-৩১।
২৩. অক্ষয়কুমার দত্ত। তদেব। খণ্ড ২, পৃ ২২৯-২৮৭।
২৪. অক্ষয়কুমার দত্ত। তদেব। ১ম ভাগ, পৃ ১৯৭-১৯৮।
২৫. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। ৫ম অধ্যায়।
২৬. B. B. Majumdar. *History of Political Thought.* p. 139.
২৭. অক্ষয়কুমার দত্ত। তদেব। খণ্ড ২, পৃ ২২৯-২৮৭।
২৮. B. B. Majumdar. op. cit. pp 147-150।
২৯. অক্ষয়কুমার দত্ত। তদেব। ১ম খণ্ড, ৭ম অধ্যায়, পৃ ১২৭।
৩০. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। ১ম ভাগ, পৃ ১৬৬।
৩১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৬৭।
৩২. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১৬৪।
৩৩. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৪০ সংখ্যা। চৈত্র, ১৭৭৬ শকাব্দ।
৩৪. পূর্বোক্ত পত্রিকা। ১২২ সংখ্যা। আশ্বিন, ১৭৭৫ শকাব্দ।
৩৫. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, পৃ ৪৪-৪৬।
৩৬. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ধর্ম্মনীতি'। পৃ ১৬৯-১৭০।
৩৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। চৈত্র, ১৭৭৬ শকাব্দ।

৩৮. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'। খণ্ড ২, পৃ ২৫-২৭।

৩৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। পৌষ, ১৭৭৬ শকাব্দ।

৪০. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'। খণ্ড ১, ভূমিকা।

৪১. B. B. Majumdar. op cit. p. 129.

৪২. *Ibid.* p. 151.

৪৩. অক্ষয়কুমার দত্ত। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়'। খণ্ড ২, ভূমিকা।

৪৪. D. D. Runes, ed. *The Dictionary of Philosophy.* 1942, p. 205.

৪৫. E. R. A. Seligman, ed. *Encyclopedia of the Social Sciences.* 1959, Vol. 11-12, pp. 302-305

৪৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তদেব। পৃ ৪১১-৪১২।

৪৭. মহেন্দ্রনাথ রায়। 'বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত'। ১২৯২ বঙ্গাব্দ। পৃ ৩০৬।

কেশবচন্দ্র সেন ॥ ১৮৩৮—১৮৮৪

রামমোহনের যুক্তিবাদী চিন্তার শ্রেষ্ঠ উত্তরসাধকরূপে অক্ষয়কুমারকে দেখা গিয়েছে। অক্ষয়কুমার রামমোহনের ভক্তিবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন নি—সে-আদর্শের প্রধান অনুসারী হয়েছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহনের ভক্তিবাদী দিকটির আরও পরিপূর্তি ও পরিমার্জন করেন মহর্ষির শিষ্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। বিপিনচন্দ্র পালের মতে—"it will have to be admitted, he largely supplemented and even corrected the great Raja himself'।"[১] বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে ঐক্যের পথনির্দেশ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মপ্রচারকের আদর্শের সমন্বয়প্রয়াস সমগ্র আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের একটি অনন্য অবদান। কেশবচন্দ্রের ইতিহাসচিন্তা ও বিশ্বজনীন ঐক্যের সাধনা অনুরূপ মৌলিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সম্পর্কে চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন "Keshub was an ardent nationalist, an ardent social reformer, an ardent man of god"।[২] সুবক্তা ও সুলেখক কেশবচন্দ্র যৌবনের প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন (১৮৫৭)। বয়স যখন তাঁর উনিশ সে-সময়ে তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সচিব নিযুক্ত হন। বয়স্ক শিক্ষা (adult education), স্ত্রীশিক্ষা ও সমাজোন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজকে একটি বৃহত্তর গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থনে কেশবচন্দ্র স্বয়ং 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন (১৮৫৯)।

সকল মতের নিষ্কর্ষ গ্রহণ ও সমন্বয় সাধনে তাঁর অপূর্ব দক্ষতা ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয় সাংস্কৃতিক ধারার তিনি গভীর অধ্যয়ন করেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিল মুক্ত ও উদার। রামমোহনের মতো তিনিও সমাজসংস্কারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। খ্রীষ্টান ক্যাথলিকদের মতো কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপ প্রকাশের পন্থায় তিনি বিশ্বাস করতেন। তাতে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের দুষ্কর্মপ্রসূত পাপপ্রত্যয়ের একটা মিল দেখতে পান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন চিন্তাশীল মনীষীর আদর্শে তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব গঠন করেন।

১৮৬২ সালে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে ব্রহ্মানন্দ উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য। বছর দুয়েক ধরে (১৮৬৪-৬৬) ভারতের বিভিন্ন স্থান তিনি পর্যটন করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচারানুষ্ঠান,

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, উপবীতধারণ, মদ্যপান, অবরোধ প্রথা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ছিল সেই পরিক্রমার উদ্দেশ্য। সে-সময়ে দেশে ঐ ধরনের কাজ বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সমান মনে করা যায়। ১৮৬৪ সাল থেকে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামে একটি পত্রিকার তিনি প্রকাশন শুরু করেন।

তিনি ও তাঁর অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে পৃথক হয়ে যান। কারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরা অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ, অসবর্ণ বিবাহ ও খ্রীষ্টের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শনে আপত্তি তোলেন। ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'। 'সমদর্শী' নামে এই গোষ্ঠীর একদল পরে আবার বেরিয়ে গিয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মদের সঙ্গে একত্রে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা (১৮৭৮) করেন। তাঁরা কেশবপন্থীদের গুরুবাদ পছন্দ করতেন না—ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটা গণতান্ত্রিক রূপ দেওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। এই বিভেদের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে নিজেরই সৃষ্ট বিবাহ আইন ভঙ্গ করে কেশবচন্দ্র নিজের অপরিণীতা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের রাজকুমারের বিবাহ দেন, এবং সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। এইসব কারণে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গোষ্ঠী কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন। বিবাহের ব্যাপারটা ছিল মূলত রাজনৈতিক। স্বাধীন করদ রাজ্য কুচবিহারের প্রশাসনকে আধুনিকীকরণের জন্যে ইংরেজ শাসকেরা এই বিবাহের প্রস্তাব করে। দ্বিধাগ্রস্ত, কিন্তু রাজভক্ত কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের প্রসারকল্পে সম্ভবত বিবাহদানে সম্মত হন। এই বিবাহকে উপলক্ষ্য করে কেশবচন্দ্রের বিরোধীরা যে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করেন, তাতে ব্রাহ্মধর্মের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে তাতে ভাঙন ধরে।

লর্ড লরেন্স ও বিলেতের একেশ্বরবাদীদের আমন্ত্রণে কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ড ভ্রমণে গিয়েছিলেন (১৮৭০)। সেখানে বিভিন্ন সভায় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বক্তৃতা বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রানী ভিক্টোরিয়া ও প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোন কেশবচন্দ্রকে ভোজে আপ্যায়ন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুরাগীদের পরিচয় ঘটে। তাঁরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ মিল খুঁজে পান। বস্তুত কেশবচন্দ্রের মাধ্যমেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সংযোগ ও ঘনিষ্ঠতা দেখা দেয়। ম্যাক্স মূলারের মতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই কেশবচন্দ্র ১৮৮০ সালে 'নববিধান' ('New Dispensation') আদর্শের প্রবর্তন করেন। সর্বধর্মের সমন্বয় (Religion of Harmony) ছিল এই নবচিন্তার মর্ম। নববিধানের মূলকথা হল জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনের মধ্যে ঐকাত্ম্য স্থাপন ও যাবতীয়

জ্ঞানের ভিত্তিতে ঈশ্বরের সহিত সংযোগ সাধন। কেশবচন্দ্রের 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' উক্ত নবজীবনাদর্শের প্রধান গ্রন্থ। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ছিলেন এই মতের বিশিষ্ট প্রচারক। 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা ছিল নববিধান গোষ্ঠীর মুখপত্র।

সকল জাতি ও ধর্মের লোকদের নিয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মস্ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপন (১৮৭১) রাষ্ট্রসাধনার ক্ষেত্রে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং তাঁর উদ্যোগে পারস্পরিক সৌহার্দের ভিত্তিতে একত্র বসবাস ও মিলিত উপার্জনে জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে 'ভারত আশ্রম' স্থাপিত হয়। দেশব্যাপী প্রচারের সুবিধার্থে তিনি 'প্রচারক সভা' নামে অপর আর-একটি সংস্থা এবং শিক্ষাবিস্তার ও চিন্তার আদানপ্রদানের কেন্দ্রস্বরূপ কলকাতায় 'অ্যালবার্ট হল্' ও 'অ্যালবার্ট ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন।

কেশবচন্দ্র যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম মন্দির' নির্মাণ করেছিলেন সেটি তাঁর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের সমন্বয়প্রচেষ্টার এক মূর্ত প্রতীক। মাতৃভাষায় ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে চয়ন করে তিনি 'শ্লোকসংগ্রহ' নামে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তাতে বেদ বাইবেল কোরাণ ও জেন্দ অবেস্তা থেকে উদ্ধৃতি সমান স্থান পায়। সুসংগঠিত উপায়ে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে শতাধিক ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমন্দির স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ একটি জাতীয় আন্দোলনের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

উচ্চ আদর্শ ও শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কেশবচন্দ্র বাংলার সামাজিক ও নৈতিক মানকে নতুন ধারায় উন্নীত করার প্রয়াসী হন। বহুমুখী সমাজ-সংস্কারকর্মে নারী প্রগতিকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

জীবনের শেষ পাঁচটি বছর তিনি সমন্বয়ধর্ম প্রচার, গ্রন্থরচনা ও সংস্কারকর্মে অতিবাহিত করেন। নতুন ধর্মাদর্শ প্রচারেয় সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা এবং সাধকদের জীবনচরিত রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে তাঁর আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী 'জীবন বেদ' ও 'নবসংহিতা' গ্রন্থদ্বয় প্রকাশিত হয়। সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সাধকদের নিয়ে সার্বভোম সাধুমণ্ডলীর পত্তন, নারীসমাজ গঠন ও রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে লোকশিক্ষা প্রচারই তাঁর এই সময়ের প্রধান কাজ ছিল।

কেশবচন্দ্রের আদর্শ ও আচরণে একসময়ে খ্রীষ্টধর্মের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। রামমোহন খ্রীষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ ও নীতিকথার অনুরাগী ছিলেন। কেশবচন্দ্র আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানী আচারানুষ্ঠান অনুযায়ী নববিধান মন্দিরের রীতিনীতি রূপায়িত করেন। আচার্য-অভিষেক (ordain), ধর্মে দীক্ষাদান, শেষভোজন ইত্যাদি অনুষ্ঠান খ্রীষ্টীয় ধারারই অনুকৃতি।

জীবনের শেষ পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবেই হয়তো খ্রীষ্টানী মনোভাব তিনি কিছুটা পরিত্যাগ করেন এবং অন্তর্লৌকিক বৈদান্তিক যোগক্রিয়ায় আকৃষ্ট হন।

দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদী আত্মবিকাশ, উন্নয়ন ও স্ফুরণের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন—পক্ষান্তরে তাঁরই শিষ্য কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টীয় মার্গে চলতে শুরু করেন। তিনি রামমোহনের যুক্তিবাদী মনের দ্বারা তেমন প্রভাবিত হন নি, যতটা হয়েছিলেন ভক্তির আদর্শে। তিনি শেষ দিকে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহযোগিতায় নববিধানসভায় বৈষ্ণবদের অনুরূপ সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্রের জীবন ও মননে একাধারে ভক্তিবাদ ও অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সমাজ-সংস্কার ও মুক্তির প্রেরণা এক সমন্বিত রূপ পেয়েছে।

ধর্মচিন্তা

কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শ আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটি অভিনব পদক্ষেপ! তাঁর কাছে ধর্মের প্রত্যয় ছিল প্রকৃতিগত—অর্থাৎ ঈশ্বরকে উপলব্ধির জন্যে মানুষের সহজাত ঐশ প্রবণতা ও অধ্যাত্মবোধই যথেষ্ট, সেজন্যে প্রচলিত কোনো ধর্মের নির্দেশ, শাস্ত্রগ্রন্থ বা গুরুর প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে মানুষের ধর্ম ও নীতিবোধের উৎস দ্বিবিধ। একটি পুরুষানুক্রমে প্রচলিত ঐতিহ্যাশ্রয়ী কোনো ধর্ম বা অনুশাসন; দ্বিতীয়টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও স্বজ্ঞা (Intuition)। কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় ধারাটি অবলম্বন করেন। 'জীবন বেদ' গ্রন্থের গোড়ায় তিনি লিখেছেন—

> গির্জায় যাইব কি মসজিদে যাইব, দেবালয়ে যাইব কি বৌদ্ধদিগের দলে যোগ দিব, তাহার কিছুই ভাবিতাম না। প্রথমেই বেদ বেদান্ত কোরান পুরাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রার্থনা, তাহাই অবলম্বন করিলাম।[৩]

প্রার্থনাই তাঁর প্রাকৃতিক বা ব্যক্তিগত ধর্মের প্রথম সোপান। সে-প্রার্থনা পার্থিব কোনো বস্তুর জন্যে নয়। নিষ্কাম প্রার্থনার পথ অনুসরণ করে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধি চেয়েছিলেন। পৃথিবীর পাপপঙ্কিল পরিবেশ পরিত্যাগের জন্যে দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ তিনি 'পাপবোধ' জাগ্রত করার উপদেশ দেন। তমসাচ্ছন্ন ও জড়তাগ্রস্ত আবেশ থেকে জীবনকে মুক্ত করার তাগিদে তিনি তৃতীয় সোপান হিসাবে 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা' নেবার কথা বলেন। ক্রমে বিবেক, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি সোপান অতিক্রম করে সার্বভৌম চিন্তার স্তরে উপনীত হবার অভিমত প্রকাশ করেন। সর্বোপরি তিনি বৌদ্ধ আদর্শে বৈরাগ্যকে স্থাপন করেছেন।[৪]

কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শের মর্মকথা হল জীবনের পরিপূর্ণতা। পূর্ণ যিনি তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে নিজেরও পূর্ণতা—অর্থাৎ ঈশ্বরদত্ত মানবিক সকল শুভবৃত্তির উন্মেষ চাই। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বেশ মিল দেখা যায়। উভয়েই দেহ মন ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। সমগ্র সত্তার পূর্ণ বিকাশের ফলেই পরমাত্মার সঙ্গে সহজে মিলিত হতে পারা যায়। বিজ্ঞানচর্চাকে কেশবচন্দ্র যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং ধর্মচর্চাকে বিজ্ঞানবিমুখ করতে চান নি। হিমালয় ভ্রমণ-কালে এক পত্রে তিনি তাঁর অনুরাগীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন—

> ঈশ্বর বলিয়াছেন, বিজ্ঞান আমাদিগের ধর্ম্ম হইবে। তোমরা সকলের উপর বিজ্ঞানকে সম্মান করিবে, বেদাপেক্ষা জড়বিজ্ঞানকে, বাইবেলাপেক্ষা অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সম্মান করিবে। জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ব, শরীরবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্র প্রকৃতির ঈশ্বরের জীবন্ত শাস্ত্র। দর্শন, ন্যায় ও নীতিবিজ্ঞান, যোগ দেবনিশ্বসিত এবং প্রার্থনা আত্মার পক্ষে ঈশ্বরের শাস্ত্র। নূতন ধর্ম্মবিশ্বাসে প্রতিবিষয় বৈজ্ঞানিক, কিছুই অবৈজ্ঞানিক নয়। নিগূঢ় রহস্য দ্বারা তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিও না, স্বপ্ন বা কল্পনার প্রশ্রয় দিও না, কিন্তু পরিষ্কৃত দৃষ্টিতে এবং প্রশস্ত বিচারে সকল বিষয় প্রমাণিত কর।[৫]

কেশবচন্দ্র বিশ্বের প্রচলিত সকল ধর্মের নিষ্কর্ষ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো ধর্মমতের উপর নিজ আদর্শ স্থাপন করেন নি। তাঁর অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানকে মোটামুটি এইভাবে দেখানো যায়—

১. জীব ও জগতের নিয়ামক পরম সত্তা সদাই ক্রিয়াশীল।

২. ঐশ নির্দেশ গ্রহণে উপযোগী মানুষের কাছে ঈশ্বরাদেশ প্রেরিত হয়।

৩. মনুষ্যজীবনের সহিত জড়িত যাবতীয় নৈসর্গিক বিষয় ঐশ নির্দেশে তাৎপর্যবহ। প্রার্থনার ফলে সেই নির্দেশ মনুষ্যহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। এবং তা যদি পরীক্ষামূলক হয় তাহলে পরীক্ষার সম্মুখীন হবার শক্তিও মানুষ প্রাপ্ত হয়।

সর্বব্যাপী ঈশ্বরের উপলব্ধিই ছিল তাঁর প্রধান কামনা ও বাসনা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাঁর ত্রিত্ব (Trinity)-প্রত্যয়ে বিন্যস্ত: God in Nature, God in Soul এবং God in History.[৬] শেষোক্ত স্তরেই ঈশ্বর সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশমান। তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ মানবগণের মাধ্যমে দিব্য অভীপ্সা নিয়তই সঞ্চারিত হয়; বিশ্বচরাচরের অবিরাম নবরূপায়ণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর সকল পাপাচারীকে উদ্ধার করেন। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ঈশ্বর মানবমনে সদাই পবিত্র মূল্যবোধ সঞ্চার করেন। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কেশবচন্দ্র

অনুভব করেন যে সকল ধর্মেই সত্য বিরাজমান। সেই বিশ্বাসেই তিনি নববিধান আদর্শে সকল ধর্মের সমন্বয়ে সমগ্র মানবজাতিকে একটি মৌল আধ্যাত্মিক চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' গ্রন্থে ধর্মীয় সকল মত ও পথের একটি সমন্বয়তত্ত্ব তিনি উপস্থাপিত করেন। নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য প্রমুখ সংস্কারকের পথানুসারী কেশবচন্দ্র বর্তমান কালে এক নতুন সমাজ-বিপ্লবের নিশানা দেখান।

কেশবচন্দ্রের সমন্বয়পন্থী নববিধান আদর্শ বৈশ্বিক সৌহার্দ, সর্বাত্মক ও সমবায়ী সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সহায়ক বলে মনে করা যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে ঐক্যবদ্ধ ও অভিন্ন একটি মানবসমাজের চিন্তা কেশবচন্দ্রের নববিধান আদর্শে সুপরিস্ফুট—

> গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা পরমতাসহিষ্ণুতা নববিধানের ভাবের একান্ত বিরোধী জানিয়া উহাদিগকে নিয়ত পরিহার করিবে। তোমাদের বিশ্বাস অসর্বান্ত র্ভাবক না হইয়া সর্বান্তর্ভাবক হউক। তোমাদের প্রেম সাম্প্রদায়িক অনুরাগ না হইয়া সার্ব্বভৌমিক ঔদার্য হউক। যদি তোমরা কেবল আপনাদেব লোক, আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনকে ভালবাস ইহাতে আর তোমাদের কি গৌরব? তোমরা নূতন সম্প্রদায় গড়িবে না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবে। তোমার নূতন ধর্ম্মমত সংসৃষ্ট করিবে না, কিন্তু সকল ধর্ম্মমতেব সামঞ্জস্য সম্পাদন করিবে।[৭]

উনিশ বছর বয়সে কেশবচন্দ্র স্বগৃহে 'Goodwill Fraternity' নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করেন (১৮৫৭)। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও সর্বজনের ভ্রাতৃত্ব ছিল গোষ্ঠীর আদর্শ। সামাজিক দিক থেকে দ্বিতীয়টি ছিল সেদিন বিশেষ অর্থবহ। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে জাতবিচার তথা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে তিনি সমধর্মাদেব শপথ নেওয়াতেন। তাঁর মতে পৌত্তলিকতার মতো জাতপাতেব বিচারও সামাজিক অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রাচীন ভারতে জীবিকা অনুযায়ী সমাজবিন্যাস বা জাত গঠিত হত, ধর্মের অনুসঙ্গী কিংবা জন্মসূত্রে নয়। তিনি বলেন যে বহুদেবত্ব ও জাতিভেদ হিন্দুধর্মের পূর্বতন পবিত্রতাকে কলুষিত করে, ভারত বহিরাগত বিজেতা শক্তির কাছে দুর্বল প্রতিপন্ন হয়। জাতবিচারের অবসান না হলে ভারতের প্রগতি অসম্ভব উপলব্ধি করে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তাঁর কথায়—

> …it is impossible to ensure the real welfare of the country unless and until caste is wholly eradicated…'[৮]

ই তি হা স চি ন্তা

কেশবচন্দ্র সর্বব্যাপী ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন; তিনি মনে করতেন ঈশ্বরই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা; প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর প্রকাশমান হন; ইতিহাস ও মানবাত্মার মাধ্যমে ঐশ নির্দেশ অভিব্যক্তি লাভ করে; ঈশ্বরনিরপেক্ষ জড় ও জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব; বিশ্বচরাচরের সুসমঞ্জস সম্পর্ক ও শুভগতি এবং মানবাত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঈশ্বর কর্তৃক নির্দিষ্ট—

> …There is God in History. He who created and upholds this vast universe also governs the destinies and affairs of nations. The same hand which we trace in the lily and the rose, in rivers and mountains, in the movements of the planets and the surges of the sea, regulates the economy of human society, and works, unseen, amid its mighty revolutions, its striking vicissitudes, and its progressive movements. History is not what superficial readers take it to be, a barren record of meaningless facts—a dry chronicle of past events, whose evanescent interest vanished with the age when they occurred. It is the most sublime revelation of God.[৯]

প্রকৃতির ন্যায় ইতিহাসেও ঈশ্বর প্রকাশমান হন। আপাতদৃষ্টিতে যে-ইতিহাস মানুষের রচনা বলে মনে হয় বস্তুত তার অন্তরালে এক ঐশশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু ঈশ্বর ইতিহাসে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেন? তার জবাবে কেশবচন্দ্র বলেছেন মহান মানুষের (Great Man) মধ্য দিয়েই ঈশ্বর প্রকাশমান হন। তাঁর এই কথায় কার্লাইলের একটি উক্তি যেন ধ্বনিত হয়েছে: "history of the world is the biography of great men"। এক একটি যুগ ও জাতি কোনো এক মহান ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে কেন্দ্রীভূত ও সংঘবদ্ধ হয়। কালের প্রবাহে কত সমাজ ও জাতির উত্থান ও পতন ঘটে থাকে; সংখ্যাতীত মানুষের স্রোত বয়ে চলে—যুদ্ধবিগ্রহে কত নাম-না-জানা মানুষই জীবনবলি দেয়—কিন্তু নাম থেকে যায় কেবল নেতৃবৃন্দ ও সেনানায়কদের। এই নেতৃস্থানীয় মহান ব্যক্তিরাই সব কিছু চালনা করেন। তাঁদের খ্যাতি ও দ্যুতি ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। Heroes, Reformers, Prophets ইত্যাদি আখ্যা তাঁরা পান। কেশবচন্দ্রের মতে ইতিহাসখ্যাত মহান মানবদের সাহায্যেই ঈশ্বর ইতিহাসে অভিব্যক্ত হন। এক-একটি যুগের প্রতিভূ মহামানবেরা নিজেদের ধ্যানধারণার

প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন—অন্তর্ভাবকে বহির্লোকের মধ্য দিয়ে রূপায়িত না করা অবধি স্বস্তি পান না। গীতোক্ত বিভূতি যেমন স্বতঃই বিচ্ছুরিত হয় তেমনি তাঁদের ধ্যানের বস্তু সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চিরন্তন জ্যোতির্ময়ের মতো ফুটে ওঠে। প্রকৃতির প্রয়োজন ও সমাজের তাগিদে ঐ সব মহামানবগণ আবির্ভূত হন। বিশ্বনিয়ন্তার নৈতিক শক্তিকে তাঁরা প্রকাশমান করে তোলেন। যৌবনে তিনি কার্লাইল ও ইমার্সনের এই চিন্তায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কার্লাইলের ব্যক্তিপূজা-তত্ত্ব তাঁকে চমৎকৃত করে।

মানবিক কল্যাণকল্পেই ঐসব মহান ব্যক্তিরা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হন—তাঁরা ঈশ্বরেরই প্রতিভূ—নানা গুণ ও শক্তিমণ্ডিত মহান ব্যক্তিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিপথ রচনা করেন। সাধারণ মানুষ থেকে তাঁরা সর্বাংশে উন্নত; সেজন্যে কেশবচন্দ্র তাঁদের অতিমানব বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর 'Great Man' তত্ত্বের সঙ্গে হেগেল ও নীট্‌শের অতিমানব প্রতীতির কিছুটা মিল আছে এবং এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে তাঁর চিন্তার বিশেষ পার্থক্য নেই। কেশবচন্দ্রের অতিমানব একদিকে দেশ ও কালের প্রতিভূ; অপরদিকে বিশেষ কোনো ভাবধারার প্রবক্তা। কেশবচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে অতিমানবের নিঃস্বার্থ ত্যাগ, অনাবিল তিতিক্ষা, ঐকান্তিক নিষ্ঠা, জ্ঞানবিদ্যার মৌলিকতা ও অজেয় শক্তি থাকে।

এশিয়াকে কেশবচন্দ্র মানবসভ্যতার পীঠস্থান (Holy Ground) বলে মনে করতেন; এশিয়াতেই বিশ্বের সকল ধর্ম ও সংস্কৃতি ভূমিষ্ট হয়েছে; এশিয়াতেই জন্মেছেন অধিকাংশ মহান ব্যক্তি; তাই এশিয়ার ধুলো তাঁর কাছে সোনার চেয়েও আদরণীয় ছিল। ইউরোপকে তিনি এশিয়ার ঔদার্য, মানবিকতা ও বিশ্বপ্রেমের বাণী গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। তাঁর 'নব-বিধান' আদর্শে এশিয়ার সকল চিন্তা ও ধর্ম সমন্বিত হয়েছে। ভারতে ইংরেজদের আগমনকে তিনি দিব্য অভীপ্সা বলে মনে করতেন: "It is Providence that rules India through England."[১০] মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের যে সামাজিক ও নৈতিক অবনতি ঘটে তার সংশোধনের জন্যে পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে এদেশের সংযোগ থাকা আবশ্যক। ভারতকে জগৎসভায় সম্মানিত আসন ফিরে পেতে হলে পশ্চিমী সংযোগ ও সাহায্য তাঁর মতে ছিল অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ভারতের আধ্যাত্মিক বাণী ইংল্যাণ্ডেরও উপকারসাধন করবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন—

> The mutual intercourse between England and India, political as well as social, is destined to promote the true interests and lasting glory of both nations.[১১]

দেশের নৈতিক ও সামাজিক সংকটের সন্ধিক্ষণে ইংরেজের আবির্ভাবকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে বিদেশী আক্রমণ ও আধিপত্য ভারতকে দীন ও হীনবল করেছিল—সময়টা তাঁর মতে তখন খুবই সমস্যাসংকুল—ইংরেজশাসনও তাই অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কতিপয় ইংরেজের বিসদৃশ আচরণ সত্ত্বেও ইংরেজরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সূচনা করেছে। তাই কেশবচন্দ্র তাঁর 'England and India' বক্তৃতায় ইংরেজদের ভারতবিজয়কে বিধিনির্দিষ্ট ('Providential Dispensation') বলে অভিহিত করেন। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন ভারতে ইংরেজ শাসন প্রকারান্তরে ঐশ আশীর্বাদ-স্বরূপ। সেজন্যে ব্রিটেনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই তাঁর অভিমত ছিল।

দ র্শ ন

অক্ষয়কুমারের মতো কেশবচন্দ্রও মনে করতেন যে প্রাকৃতিক প্রবণতা ও প্রয়োজনেই সমাজের উৎপত্তি। সামাজিক ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সম্ভাবনা পরিণতি লাভ করে। পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজ ও রাষ্ট্র অতিক্রম করে সারা বিশ্বের সংঘবদ্ধতায় ব্যক্তিসত্তা পরমসত্তার সন্ধান পায়। ঐক্যবদ্ধতা মানুষের স্বভাব। মানুষে-মানুষে ঐক্যের ভিত্তিতেই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হওয়া যায়।

কেশবচন্দ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন। গোষ্ঠীর নামে তিনি ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে চান নি। একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তিনি বলেন—

> We do not want any single instrument to supplant and supersede the rest ; We do not wish that only one voice should sing and all the others be annihilated or hushed in silence. True music is not all drum or all violin ; it is the perfect agreement of all varieties of sound, instrumental and vocal.[১২]

ব্যক্তিমানুষকে তিনি দিব্যবিধান অনুযায়ী মূলত নীতিপ্রবণ ও যুক্তিমুখী মনে করতেন। মানুষের ঐ সহজাত সত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশই ছিল তাঁর কামনা। তিনি চাইতেন—

১. অনুশাসনমুক্ত মানুষের ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা ;
২. ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার মূলে ব্যক্তির স্বাধীন বিবেকের অনুশাসন ;

৩. সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা।[১৩]

মনন ও ধর্মের ব্যাপারে কেশবচন্দ্র চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতা। 'জীবন বেদ' গ্রন্থে তিনি মুক্তির জয়গান করেছেন। পরাধীনতা তাঁর কাছে ছিল এক মস্ত পাপস্বরূপ—যা ঈশ্বরের প্রতি বৈরিতা বিশেষ; মুক্তির প্রশ্নে তিনি ছিলেন অটল ও অনমনীয়। তিনি মনে করতেন যে কুসংস্কার ও অজ্ঞানের একমাত্র প্রতিষেধক হল স্বাধীনতা। দাসত্ব ব্যক্তির অধীনেই হোক বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনে হোক তা মন্দ বই আর কিছু নয়। বর্ণবৈষম্য ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতায় তাঁর এই মুক্তির চেতনা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সকল মানুষের মধ্যে একই ঈশ্বর বিরাজ করেন; সেজন্যে মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য অন্যায়। মুক্তিকে তিনি আত্মম্ভরিতা, হঠকারিতা বা নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিতে দেখতে নিষেধ করেন। ঈশ্বরের অনুগতরূপে ঈশ্বরের উপর অচল আস্থা ও নির্ভরতাই মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে।

সামাজিক মুক্তির প্রসঙ্গেও তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন প্রবক্তা। তমসাচ্ছন্ন দেশ ক্রমে আলোকের পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে মুক্তিকামী মানুষ ধীরে ধীরে জেগে উঠছে বলে তিনি অনুভব করেছিলেন। তাঁর রচনায় যুগের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রায়শঃই তাঁর সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়—

> The love of freedom is the chief characteristic of the present age··· This love of freedom manifests itself in all departments of speculation and practice. In politics men aspire to that form of government in which every section of the community may be fairly and fully represented. In education, the cry all over the civilized world is—enlighten the masses···In society, there is an earnest struggle to break through the fetters of tradition, custom and conventionalism. In religion also we see the effects of a strong desire to enfranchise the spirit···[১৪]

কেশবচন্দ্রের মতে মুক্তি সম্পর্কিত মূল্যবোধই হল জাতির প্রাণশক্তিস্বরূপ। আর এই মুক্তিকে তিনি দেখেছেন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

ইংরেজদের ভারত আগমনকে কেশবচন্দ্র ঐশ অভিপ্রায় বলে মনে করতেন এবং ইংল্যান্ডের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের স্বপক্ষেই ছিল তাঁর অভিমত। মনুর স্মৃতিশাস্ত্র অনুসরণপূর্বক তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাজশক্তি স্বয়ং ঈশ্বরের প্রতিভু। তাই মানুষের নতি ও আনুগত্য রাজারই প্রাপ্য। ঐ প্রসঙ্গে

কেশবচন্দ্র একথাও বলেছেন যে রাজদ্রোহ কেবল রাষ্ট্রনৈতিক অপরাধই নয়—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচারও বটে। রাজানুগত্য অস্বীকার করার অর্থ ইতিহাসের ঐশ প্রত্যয়কে (God in History) অগ্রাহ্য করা। ভাবাবেগবশতঃ কেশবচন্দ্র বলেছিলেন : "We love our Queen as our mother"। ভারতে ইংরেজ শাসনের পশ্চাতে কেশবচন্দ্রের এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা উত্তরকালে অনেক রাষ্ট্রনায়ককে প্রভাবিত করেছিল বলে অনুমান করা হয়। বিশেষ করে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে তাঁর এই চিন্তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং মডারেট-পন্থী ফিরোজ শাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ রাজনীতিকের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষণীয়।[১৫]

কেশবচন্দ্র মনে করতেন যে প্রাচীনকালে রাজার প্রতি হিন্দুদের আনুগত্য দেবভক্তিস্বরূপ ছিল; হিন্দুরা গৃহে পিতামাতাকে যেমন দেবতার তুল্য ভক্তির চোখে দেখে রাজাকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখত।[১৬] এই দৃষ্টিভঙ্গি কেশবচন্দ্রের মতে প্রকৃতিগত। রাজার রাজ্যশাসন ত্রুটিপূর্ণ বা অনিপুণ হলেও—প্রজারা পিতার গুণাগুণ বিচার না করে যেমন ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, রাজার প্রতিও তেমনি আনুগত্য প্রদর্শন করত। এ মনোভাব হিন্দুদের প্রকৃতিগত ও তাদের অনাবিল হৃদয়ের লক্ষণ—

> Loyalty shuns an impersonal abstraction. It demands a person, and that person is the sovereign, or the head of the state, in whom law and constitutionalism are visibly typified and represented.[১৭]

রাজানুগত্যকে তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সমতুল বলে মনে করতেন, কারণ তাঁর মতে আনুগত্য তাতে দৃঢ়তা ও পবিত্রতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং পুণ্য আবেগ ও চেতনার সৃষ্টি করে। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতাকে কেশবচন্দ্র নিন্দা জানাতেও কোনো দিন পরাঙ্মুখ হন নি। ভারতের আমলাতান্ত্রিক শাসনযন্ত্রকে তিনি ইংরেজশাসনের থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখতেন। ইংরেজশাসন দিব্যবিধানে প্রবর্তিত—ঐ-শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তার বিরোধিতা ও সংশোধনেরও অবশ্য প্রয়োজন আছে। ভারতকে ইংরেজের অধীনে রাখার পরিবর্তে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সমান অধিকার ও সমন্বয়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাই ছিল তাঁর কামনা। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য, সৌহার্দ ও সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে তিনি যত্নবান হন। শাসনব্যবস্থার গলদ দূর করার জন্যে রাজদ্রোহের আশ্রয় গ্রহণকে তিনি দেব-অভিপ্রায়ের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে—

> Sedition is rebellion against the authority of God's repre-

sentative, and therefore against God. It is not merely a political offence, but sin against Providence.[১৮]

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁর অভিপ্রেত ছিল। ইংরেজদের শুভবুদ্ধি ও বিবেকের কাছে সেজন্যে তিনি আবেদন জানান। সমকালীন ইউরোপে সামাজিক ও শাসনতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় যে-সব পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছিল, কেশবচন্দ্র সে-বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এদেশে তার প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও বিভিন্ন লেখায় ও ভাষণে বারংবার উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে সে-সবের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। বিখ্যাত 'Asia's Message to Europe' বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—

Among the advanced nations of the west the tendency of modern politics is not to exclude any, but to include all; not to destroy and ignore any section, but to represent the whole people. The highest form of government is synonymous with the most thorough-going and comprehensive representation···If you have even the semblance of good government, if you care for real political prosperity, surely you cannot reject the humbler classes; you cannot extinguish them because of their poverty, you cannot crush them into atoms because of their ignorance. There is everywhere a cry for justice, justice to the weak and powerless, justice to the working classes. Not to listen to that cry would be a disaster.[১৯]

হ্যামিলটনের নীতিদর্শন তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং হয়তো সেই প্রভাবেই মনে করতেন যে নীতি ও ধর্ম কেবল গুহায় অথবা পর্ণকুটিরে বিরাজ করে না; সেইসঙ্গে একথাও বলতেন যে বিত্তবানদের বরাতে মুক্তি জোটে না। তাঁর নববিধানে ধনী-নির্ধনের স্থান ছিল সমান। তাঁর মতে রাজপ্রাসাদেও যেমন, তেমনি দরিদ্রের কুটিরেও ঈশ্বর বিরাজ করেন।

কেশবচন্দ্র নিজেকে সোশালিস্ট বলে জাহির করেন নি। রাজনীতির ব্যাকরণ-গত চেতনাও হয়তো তাঁর ছিল না। কিন্তু সোশালিজমের যা মূলকথা—অর্থাৎ মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার আদর্শ—তা তাঁর সমগ্র চিন্তা ও আচরণে স্পষ্টই অভিব্যক্তি লাভ করেছে। বড়মানুষ কে? এ-প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন—

আমাদের দেশে এদেশের ছোটলোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত, আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি। কিন্তু কয়জন তাহাদিগের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব মনে করে…পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোটলোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর দুঃখে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না।[২০]

ইংল্যাণ্ড ও আয়াল্যাণ্ডের লোকেরা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল সেকথা তিনি ঐ প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেন। কেশবচন্দ্র বিপ্লব চান নি। শান্তিপূর্ণ সংস্কারের সাহায্যে দেশের পরিবর্তন চেয়েছেন। তা বলে তিনি দুর্বলতাকেও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি বলেছেন—

যাহারা তোমাদের মধ্যে রেওত বা কারিগর আছ, সকলে একত্র হইয়া একবার গা তুলো। তোমাদের যাতে ভাল হয়, তোমরা যাহাতে দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরতা, প্রজাপীড়ন বলপূর্বক কমাইতে পার, ইহাতে একান্ত যত্ন কর।…তোমরা আর নিদ্রা যাইও না। সময় হইয়াছে, উঠে দেখ তোমাদের হইয়া বলে এমন লোক নাই। রাজপুরুষেরা তোমাদের কথা শুনিতে পান না, বড়মানুষেরা তোমাদিগকে গ্রাহ্য করে না। এরূপ অপমান কি তোমরা চিরকাল সহ্য করিবে। তোমরা কি মানুষ নও?'[২১]

কেশবচন্দ্রের সমন্বয়বাদী বিশ্বজনীনতা রাষ্ট্রের ভাববাদী প্রত্যয়ের অনুসারী ছিল। তাঁর কাছে রাষ্ট্র ছিল কতকগুলি জীবন্ত অবয়বের ঐক্যবদ্ধ একটি জটিল যন্ত্রের মতো—সর্বজনের চিন্তা, আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে সমন্বিত করাই তার উদ্দেশ্য। আর্থিক কৌলিন্যের অধিকারী জমিদার ও পুঁজিবাদীদের সঙ্গে একত্র নির্বিত্ত চাষী ও শ্রমিকের প্রযত্নে রাষ্ট্র সজীব ও সুসংবদ্ধ আকার ধারণ করে। তাদের কোনো একটির বিচ্যুতি ঘটলে রাষ্ট্রের অঙ্গহানি হয়। কেশবচন্দ্রের কথায় রাষ্ট্র হল: "the perfection of consolidated fellowship"।[২২] তাই রাষ্ট্রদেহে শ্রেণীবিদ্বেষ ও অসূয়া- বিভেদ ও দলীয় মনোভাব ক্ষতিকর।

কেশবচন্দ্র রাষ্ট্রকে যদিও জীবসদৃশ (organic) ভাববাদী দৃষ্টিতে দেখতেন, কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বিক শক্তিময়তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বিশ্বসম্প্রীতির আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সেই দৃষ্টিতে অনুভব করেছিলেন: "what a wonderful thing is balance of power in the civilized world"।[২৩] মৌল আধ্যাত্মিক সুরেই তাঁর বিশ্বজনীনতা অভিব্যক্তি লাভ করে।

কেশবচন্দ্রের মতে প্রাচীন ভারতে ব্যক্তি-মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না—মুসলমান আমলেও নয়। রাজার ইচ্ছাতেই সবকিছু চলত। ইংরেজশাসনকালে যে মানুষ বিশেষ কিছু স্বাধীনতাপেয়েছে তা-ও তিনি বিশ্বাস করতেন না। ভারতীয়দের মধ্যে অনৈক্যের দুটি মূল কারণ তিনি দর্শিয়েছেন। প্রথমত ভাষার প্রভেদ, দ্বিতীয়ত ধর্মের অমিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পরবোধ্য একটি ভাষা না থাকলে জাতীয় ঐক্য-সাধন অসম্ভব। হিন্দি ভাষাকেই তিনি এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা উপযোগী বলে মনে করতেন। তাঁর মতে—

> যদি ভাষা এক না হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয় তবে তাহার উপায় কি? সম্ভব ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দি ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত। এই হিন্দি ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমাত্র ভাষা করা যায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পারে।[২৪]

ধর্মের মধ্যেও যে নানা ভেদাভেদ তা বিদূরিত করে ভারতকে একতাবদ্ধ করার জন্যে তিনি এই বলে অভিমত প্রকাশ করেন: "আর্য্যজাতির চিরপূজ্য একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইলে সর্ব্বপ্রকার অনৈক্য চলিয়া যাইবে।"

সমাজোন্নয়ন-চিন্তা

রামমোহন প্রদর্শিত সমাজসংস্কার ও কল্যাণকর্মেও কেশবচন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফেরার পর (১৮৭০) দেশবাসীর নৈতিক উজ্জীবন ও সামাজিক বিধিব্যবস্থার সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'Indian Reforms Association' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মোটামুটিভাবে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পাঁচটি ধারায় বিভক্ত ছিল—

১. নারীর সামাজিক অধিকার অর্জন ও উন্নতি সাধন;
২. সর্বাত্মক শিক্ষার প্রবর্তন;
৩. সুলভ পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ;
৪. মাদকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন;
৫. নানাবিধ সংস্কার ও সেবাকার্যের আয়োজন।

নারীর স্বাধীনতাও অধিকারের প্রশ্নটিকে কেশবচন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং অনুভব করেছিলেন যে তাদের মুক্তিসাধনের জন্যে প্রয়োজন যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা। সেজন্যে স্ত্রীশিক্ষার কাজে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষণ-

প্রাপ্ত একদল মহিলার সাহায্যে গৃহে গৃহে অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' সভা নামে একটি সংস্থা গঠন করেন (১৮৬৩)। তাঁর চেষ্টাতে মহিলাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষার তাগিদে ব্রাহ্মিকা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে বিবেচনার জন্যে নারীশিক্ষা সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। মহিলাদের জন্যে 'বামাবোধিনী' ও 'পরিচারিকা' নামে দুটি পত্রিকারও প্রকাশন শুরু করেন। তবে নারী শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহী হলেও তিনি স্ত্রী শিক্ষায় পাশ্চাত্য চালচলন পছন্দ করতেন না। সেই কারণে তিনি বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিরোধিতা করেন। তিনি ছিলেন 'ধীরে চল' নীতির সমর্থক। বিপথগামিনী মেয়েদের উদ্ধার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি একটি আশ্রমেরও পত্তন করেছিলেন।

দেবদেবীর নামে পুরুতপাণ্ডাদের চাতুরীতে সাধারণ মানুষ কিভাবে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা শিক্ষিত জনসমক্ষে তিনি তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে ব্রাহ্ম বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হয়। মাদকতা নিবারণ প্রসঙ্গে তিনি সরকারি নীতির নিন্দা করে বলেন যে সরকার রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে এ ব্যাপারে উদাসীন; যদি রাজস্বের উৎস হয় মানুষের দুর্নীতি, উচ্ছৃংখলতা, আর্থিক ক্ষতি ও অপরাধ প্রবণতা তাহলে রাজস্ব আদায় না হওয়াই মঙ্গল। শেষোক্ত বিষয়গুলিতে কেশবচন্দ্র রামমোহনের পরিবর্তে অক্ষয়কুমার দত্তর দ্বারাই প্রভাবিত হন।

নববিধানের সদস্যদের জন্যে রচিত 'নবসংহিতা' গ্রন্থে প্রাত্যহিক জীবনে পালনীয় আচারবিচার সম্পর্কে যেসব উপদেশ আছে তার মধ্যে কেশবচন্দ্রের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষা চিন্তা

সমসাময়িককালে যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা, পানদোষ ও বিজাতীয় মনোভাব প্রত্যক্ষ করে কেশবচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে শিক্ষাব্যবস্থায় নীতিবোধ, স্বদেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। তাঁর মতে—"to the influence of ungodly education is to be attributed the want of progress in the social conditions of the country"। এই সময়ে একদল মনে করতেন যে শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া বাঞ্ছনীয়—কারণ ধর্মের মধ্যেই যা কিছু কুসংস্কার, যুক্তিবিমুখতা ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব নিহিত থাকে। তার প্রতিবাদে কেশবচন্দ্র বলেন—

If intellectual progress went hand in hand with religious

developments, if our educated countrymen had initiated themselves in the living truths of religion, patriotism would not have been mere matter of oration, but a reality in practice. Society would have grown in health and prosperity···That unity and nationality which are considered a great desideratum would have been established.[১৭]

তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশবাসীর নৈতিক ও সামাজিক চেতনা ব্যতিরেকে দেশের মুক্তির সাধনা সফল হবে না ; শিক্ষাই রাষ্ট্রচেতনার উপাদান। তাই তিনি ভাবীকালের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহী হতে উপদেশ দেন। শুধু উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। শিক্ষার উন্নয়নে তিনি ঐ সময়ে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তা আজও স্মরণযোগ্য। সমসাময়িককালে আরও যে দুজন মনীষীকে অনুরূপ কাজে অগ্রণী হতে দেখা যায় তাঁরা হলেন বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।

এদেশে অধুনা প্রবর্তিত বয়স্ক শিক্ষার আন্দোলন তিনিই প্রথম শুরু করেছিলেন। কারিগরি শিক্ষার জন্যে Industrial School এবং শ্রমজীবীদের মানসিক বিকাশ সাধনকল্পে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং Working men's Institution প্রতিষ্ঠা করেন। নারীশিক্ষার জন্যে তিনি Normal School-এর পত্তন এবং উপযোগী অন্যান্য পন্থাও অবলম্বন করেন। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে—তা প্রাথমিক কিংবা উচ্চশিক্ষাই হোক অথবা নারী কিংবা শ্রমিকদের জন্যেই হোক—প্রতিটি স্তরের পক্ষে উপযোগী পরিকল্পনা তিনি রচনা করেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রয়োজনীয় কর আরোপের প্রস্তাবও তিনি তুলেছিলেন। তবে শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারি দায়দায়িত্বের চেয়েও লোকের উদ্যম ও প্রয়াসকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর শিক্ষার চিন্তা ও তৎপরতার মোটামুটি রূপ ছিল এইরকম—

১. দেশীয় বিদ্যালয়গুলির কাজকর্ম পরিদর্শনের জন্যে একজন উপযুক্ত পরিদর্শক থাকা প্রয়োজন ;
২. চাষী ও শ্রমিকদের উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক ;
৩. জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত ;
৪. অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের জন্যে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির উপর প্রযোজ্য সরকারি অনুদানের নিয়মকানুন শিথিল করা আবশ্যক ;
৫. ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকগণের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিত্তগ্রাহী বক্তৃতার ব্যবস্থা ;

৬. সরকারি সাহায্যে প্রকাশিত সংবাদপত্র বিনামূল্যে গ্রামে গ্রামে বিতরণ ;
৭. গ্রামবাসীদের শিক্ষার জন্যে জমিদারদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সযত্ন উদ্যোগ ;
৮. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনে দেশীবিদেশী ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের কাছ থেকে শিক্ষা বাবদ স্বল্প পরিমাণ কর সংগ্রহের আইনানুগ আয়োজন।

জনশিক্ষার সুবিধার্থে কেশবচন্দ্র এক পয়সা মূল্যের 'সুলভ সমাচার' নামে সহজবোধ্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাছাড়া ছোটদের জন্যে তিনিই প্রথম 'বালকবন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেন। বাড়ীর ঝিচাকরদের প্রতি সাধারণত যে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয় ও তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, গৃহ ভৃত্যদের জন্যে 'রজনী-বিদ্যালয়' স্থাপন করা প্রয়োজন।[২৬]

উপসংহার

উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন কেশবচন্দ্র। মনন ও ব্যক্তিত্বে তাঁর সমকক্ষ জননেতা সমসাময়িককালে খুব বেশি দেখা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের গুণ ও সম্ভাবনার অধিকারী বলে মনে করতেন।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁকে "সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত" বলে অভিহিত করেছেন।[২৮] অকালে আকস্মিক মৃত্যু ও জীবনাদর্শের কিছুটা বিচ্যুতির ফলেই হয়তো তাঁর সম্ভাবনা যথোচিত পরিপূর্তি ও সার্থকতা লাভ করে নি এবং তাঁর উদ্যমও বিশেষ কার্যকর হয় নি।

রামমোহনের পর বাংলার মননধারা মূলত ভক্তিবাদের পথে অগ্রসর হয়েছিল। সে পথের প্রধান পথিক দেবেন্দ্রনাথের শিষ্য ও সঙ্গী ছিলেন কেশবচন্দ্র। কিন্তু কেশবচন্দ্র অধিক মাত্রায় খৃষ্টীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ায় তিনি দেবেন্দ্রনাথের বিরাগভাজন হন। তৎকালীন বাংলার চিন্তা-নায়কদের অধিকাংশের মধ্যেই ইউরোপের হিতবাদ ও দৃষ্টবাদ যে প্রভাব বিস্তার করেছিল কেশবচন্দ্র তাকে ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁর মন অত্যধিক স্বজ্ঞা ও অতীন্দ্রিয় আবেগে আবিষ্ট হয়ে পড়ায় পরবর্তীকালে বিদ্বজ্জনমানসে যুক্তি ও বস্তুতন্ত্রী চিন্তার ক্রমবিস্তারে তিনি ক্ষুব্ধ হন. গোড়ার দিকে তার মধ্যে যে উদারনৈতিক ও প্রগতিবাদী মনের স্ফুরণ ঘটে তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে পড়ে। বস্তুত তিনি ও তাঁর সঙ্গীদের অপরিণামদর্শিতার ফলে নববিধান গোষ্ঠীর বনিয়াদ সংকীর্ণ ও শক্তিহীন হয়ে যায়। তিনি এক নতুন ধরণের পুরোহিততন্ত্র

গড়ে তোলেন এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে মুষ্টিমেয় কিছু লোককে অন্যান্যদের উপর আধিপত্যের সুযোগ দেন। বিপিনচন্দ্র সখেদে লিখেছেন—

আমরা পিতামাতার শাসন অস্বীকার করিয়া যে-যুক্তিবাদের আশ্রয়ে ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছিলাম, কেশবচন্দ্রের মণ্ডলীতে তাহার যথাযোগ্য স্থান ও সম্মান ছিল না।[২৯]

ভাঙন শুধু নববিধান গোষ্ঠীতেই ধরে নি। উপরন্তু তাদের উগ্রতার ফলে দেশে এক প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিপক্ষ গড়ে ওঠে—সেকথা সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৩০]

আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের অবদান অসাধারণ। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবাদর্শের মিলন তথা সকল ধর্মের সমন্বয়ে গঠিত এক বিশ্বজনীন সংস্থার পতাকাতলে প্রেম ও শান্তির প্রতিষ্ঠা এবং মুমুক্ষু মানুষের মুক্তির কল্পনা নিঃসন্দেহে মৌলিক ও অনবদ্য। সকল ধর্মই তাঁর কাছে ছিল ঐশ সত্যের প্রকাশ। প্রথম দিকে তাঁর অধ্যাত্মিক বিশ্বজনীনতার যে অস্পষ্টতা ছিল তা তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলে কেটে যায়। সকল ধর্মের নিষ্কর্ষ—উপনিষদের একেশ্বরবাদ, ইসলামের সাম্য এবং খ্রীষ্টধর্মের ঈশ্বর ও মানবের পিতাপুত্র-প্রত্যয়ের সমন্বয়ে তিনি মানুষকে একটি নতুন জীবনাদর্শের সন্ধান দিয়েছিলেন। নববিধান আদর্শে তিনি সকল দর্শন ও ধর্মের অধিবিদ্যা ও ঈশ্বরতত্ত্বগুলিকেই শুধু সমন্বিত করেন। তাই কেশবচন্দ্রকে সর্বধর্মসমন্বয়ের ও বিশ্বজনীনতার সার্থক প্রতিভূ বলা যায়। সর্বধর্মের মৌল চিন্তার ভিত্তিতে পরস্পর নির্ভরশীল একটা সজীব মানবিক সম্পর্ক তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বস্তুত রামমোহনের আদর্শকেই তিনি পরিবর্ধিত রূপ দিয়েছেন।

ইমার্সন ও কার্লাইল পাঠ করেই হয়তো কেশবচন্দ্রের মনে ব্যক্তিপূজা ও অতিমানব-তত্ত্ব অঙ্কুরিত হয়। তিনি মনে করতেন যে প্রকৃতির প্রয়োজন ও তাগিদেই ঐসব মহামানবদের আবির্ভাব ঘটে এবং বিশ্বনিয়ন্তার নৈতিক শক্তি তাঁদের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে; মহামানবদের আবির্ভাব সামাজিক প্রয়োজনও বটে; তাঁরা শান্তি ও মুক্তির মন্ত্র প্রচার করেন। মহামানবদের জীবনে একটি সুরই কেবল অনুরণিত হয়—"আদর্শের জন্যেই বাঁচা ও মরা।" এখানে হেগেল ও নীট্‌শের অনুরূপ চিন্তা স্মর্তব্য—যে চিন্তাকে ফ্যাসিবাদের অন্যতম প্রধান উপাদান বলে মনে করা হয়। ভারতের মাটি ও জলহাওয়ায় ব্যক্তিপূজা, অবতারতত্ত্ব ও অতিমানবতা নতুন কিছু নয় এবং শ্রীঅরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই প্রতীতি গ্রহণ করেছেন। তাই ফ্যাসিবাদের পক্ষে ভারতভূমি অনুর্বর নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী

কেশবচন্দ্র এই স্ববিরোধী ও সংকীর্ণ চিন্তায় আচ্ছন্ন থাকলেও স্বেচ্ছাচারী শাসনক্ষমতাকে তিনি অনুমোদন করতেন না।

মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফুরণে তাঁর বিশ্বাস ও আগ্রহ ছিল। সমাজ সংস্কারের মধ্যে দিয়ে তিনি আধ্যাত্মিক অভ্যুন্নতির প্রয়াসী হন। আধ্যাত্মিক নবজাগরণের ভিত্তিতে তিনি তাঁর সমাজসংস্কারের কর্মপন্থা রূপায়িত করেন। প্রভূত প্রয়াস ও নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতির দ্বারাই তিনি দেশ ও জাতি গঠন সম্ভব বলে মনে করতেন।

ইংরেজদের তিনি এদেশের অছিরূপে দেখতেন এবং তাদের কাছ থেকে সুবিচার চাইতেন।[৩১] এদেশের সম্পদ আহরণ করে ইংরেজের বিত্তবৃদ্ধির তিনি নিন্দা করেন; সেজন্যে ইংরেজদের উদ্দেশে বলেন যে এই পাপের জন্যে তাদের একদিন ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ভারতে ইংরেজশাসনের একমাত্র কৈফিয়ত হল—"good and welfare of India"; ম্যাঞ্চেস্টারের উন্নতির জন্যে ভারতকে শোষণের তিনি সমালোচনা করেন। এখানে কেশবচন্দ্রের চিন্তায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

এদেশে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি প্রথমাবস্থায় ইংরেজ বিতাড়ন বা রাজনৈতিক চেতনা থেকে হয় নি। নিজের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গৌরববোধ সৃষ্টি থেকেই জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধে ওঠে। একসময়ে দেশটা পাশ্চাত্ত্য আচারানুষ্ঠানের অনুকরণ ও খ্রীষ্টীয় মতে ধর্মান্তরিতকরণের দিকে খুবই ঝুঁকে পড়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন। সেই আন্দোলনের দক্ষ নেতৃত্ব কেশবচন্দ্রকে জনপ্রিয় করে তোলে। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"Keshub Chandra Sen was a great organizer, a born leader of men with a penetrating insight into human nature;" কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি "দেশের বিজাতীয়করণের ঘোর বিরোধী" ছিলেন।[৩২] প্রাক-কংগ্রেস আমলে রাজনীতি যখন সুস্পষ্ট দলীয় রূপ পরিগ্রহ করে নি সেময়ে তখনকার সংস্কারবাদী আধা-রাজনৈতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐসব প্রতিষ্ঠান ও তাদের তৎপরতা দেশের পরবর্তী দিনের স্বদেশী আন্দোলনের যেন পূর্বপ্রস্তুতি। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায়—

> Social reform, industrial revival, moral and spiritual uplift, have all followed in the track of the great national awakening which had its roots in the political activities of our leaders··· The activities of Iswar Chandra Vidyasagar helped Keshub Chandra Sen by enabling him to appeal to

instincts and tendencies broadened by the spirit of reform. His work in its turn, helped that of Kristo Das Pal and others ; and the new School of Politicians…[১১]

তৎকালে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা অচিন্তনীয় ছিল। বিপিনচন্দ্র ভিন্ন মত পোষণ করতেন বলেই হয়তো লিখেছেন যে কেশবচন্দ্রের রবিবাসরীয় সামাজিক উপাসনায় সমগ্র জগতের কল্যাণার্থে প্রার্থনা করা হত ; কিন্তু স্বদেশের জন্যে করা হত না, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথাও বলা হত না। বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ-সাধনে রাজনারায়ণ বসুকে (১৮২৬-১৯০০) প্রথম পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন।

বস্তুত রাজনীতিকে কেশবচন্দ্র ধর্মের একটি অঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। সরাসরি রাজনীতি করা তাঁর কাম্য ছিল না। ধর্মের সঙ্গে যতটুকু সম্পর্ক ততটুকুই এবং তার বেশি রাজনীতি নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে চান নি। একথাও অবশ্য তিনি অনুভব করতেন যে ধর্ম-সম্পৃক্ত রাজনীতিকে বর্জন করা কোনো সামাজিক মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তিনি রাজনীতিক ও রাষ্ট্রদার্শনিক ছিলেন না। তবে তাঁর মধ্যে সে-সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলে বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হতে পারতেন বলে সুরেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১]

উৎস নির্দেশ

১. Bipinchandra Pal. *Character Sketches.* 1957, p. 12.
২. Quoted in V. P. Varma. *Modern Indian Political Thought.* 1961, p. 48.
৩. কেশবচন্দ্র সেন। 'জীবন বেদ'। ১৯১৭, পৃ ৩।
৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ ১০৬।
৫. কেশবচন্দ্র সেন। 'পত্রাবলী'। ১৯৪১, পৃ ২৩৩।
৬. Keshub Chandra Sen. *Lectures.* p. 56.
৭. কেশবচন্দ্র সেন। পত্রাবলী। ১৯৪১, পৃ ২৩২-২৩৩।
৮. Keshub Chandra Sen. *Sen in England.* Part II, p. 4.
৯. Keshub Chandra Sen. op. cit. p. 56.
১০. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India.* 1904, p. 127
১১ Keshub Chandra Sen. *Lectures.* p. 325.
১২. Keshub Chandra Sen. *Lectures in Asia.* p. 64.

১৩. Amiya Chandra Banerji. 'Brahmananda Keshub Chandra Sen', *Studies in Bengal Renaissance*. ed. by Atul Chandra Gupta. 1962, p. 80.
১৪. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India*. 1904, p. 99.
১৫. V. P. Varma. *Modern Indian Political Thought*. 1961, p. 44.
১৬. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সংকলক। 'সুলভ সমাচার ও কেশবচন্দ্রের রাষ্ট্র-বাণী'। খণ্ড ১, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
১৭. Keshub Chandra Sen. *Lectures*. p. 322.
১৮. P. S. Basu. 'Political Thoughts of Keshaub Chandra Sen', *Navavidhan*. December 15, 1938, p. 46.
১৯. Keshub Chandra Sen. *Lectures in India*. 1904, p. 507.
২০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তদেব। খণ্ড ১।
২১. পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ: ২১।
২২. Keshub Chandra Sen. op. cit. 1904, p. 506.
২৩. *Ibid.*
২৪. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তদেব। পৃ: ৩-৪।
২৫. Quoted in Amiya Chandra Banerji, op. cit. p. 83.
২৬. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তদেব। নিবেদন।
২৭. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making*. 1963, p. 131.
২৮. 'বঙ্কিম রচনাবলী'। সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, ১৩৬১, পৃ: ৬১৮।
২৯. বিপিনচন্দ্র পাল। 'সত্তর বৎসর ঃ আত্মজীবনচরিত'। ১৯৬২, পৃ: ২৫৭।
৩০. Surendranath Banerjea. op. cit. p. 6.
৩১. Quoted in : C. R. Das. *Speeches*. p. 212-213.
৩২. রাজনারায়ণ বসু। 'আত্মচরিত', ১৯৬১। পৃ: ১১৮।
৩৩. Surendranath Banerjea. op. cit. p. 183.
৩৪. *Ibid.* p. 6

২ দৃষ্টবাদী রাষ্ট্রদর্শন ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

পরিপ্রেক্ষিত

উনিশ শতকের বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা ও মননধারার ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। ভিন্ন আদর্শ ও চিন্তায় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকে আশ্রয় করে নবযুগের যে-ইতিহাস রচিত হয়েছিল তার নায়কদের মত ও পথের কোনো মিল ছিল না। তাঁরা সবাই মিলে ভাব ও আদর্শের কোনো অখণ্ড ধারা বহন করে চলেন নি। তবে ঐ-শতকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে ভিন্ন মত ও পথে সবাই একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধ ও মূল্যবত্তা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার সাহায্যে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিক্ষিপ্ত সমস্যাগুলির এক সমন্বিত মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। রামমোহন, ডিরোজিওপন্থী নব্যবঙ্গদল, দেবেন্দ্র-অক্ষয়-বিদ্যাসাগরের তত্ত্ববোধিনী সভা এবং কেশবচন্দ্র প্রমুখ চিন্তানায়ক জীবনাদর্শের এক-একটি সূত্র তুলে ধরেছিলেন। ঐসব সূত্রগুলিকে গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব চিন্তার সহযোগে একটি সমন্বিত তত্ত্বের রূপ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

ঐ-তত্ত্বেরই সুরবিস্তার-স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের যে দ্বিতীয় ভূমিকা তা ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে দেশের হিন্দুপ্রধান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বিদেশী শাসকদের সহৃদয় সম্পর্ক ছিল। ইংরেজ শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে উদারতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিমুখিতা এদেশবাসীর মনে অঙ্কুরিত হয়, নতুন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্দীপিত সমাজসংস্কার প্রয়াস ক্রমে জাতীয় আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার পথে অগ্রসর হয়। ইউরোপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটায় ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, গ্রীস ও ইতালির পরাধীনতার অবসানবার্তা দেশের জাতীয় আবেগকে পরিপুষ্ট করে। ইংরেজ শাসনের পক্ষ-পুটেই চলেছিল সরকারি কাজের সমালোচনা, স্বায়ত্তশাসন ও প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা পরিষদের দাবি। সিপাহিবিদ্রোহের পর কোম্পানির কাছ থেকে এদেশের শাসনকর্তৃত্ব সরাসরি ইংরেজ সরকার গ্রহণ করার পর অর্থনৈতিক শোষণের ক্রমবিস্তার, রাজনৈতিক একাধিপত্য, প্রশাসনকর্মে বৈষম্যমূলক আচারণ প্রভৃতি কারণে দেশবাসীর বিশেষ করে নবোদ্ভূত মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর সঙ্গে শাসকদের মানসিক বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার এবং সেইসঙ্গে খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা শিক্ষিতশ্রেণীর মনে হীনতাভাব সঞ্চার করে। শিক্ষা, অর্থনীতি ও কর্মজীবনের ব্যর্থতায় জাতীয় চেতনা ক্রমে নানা সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলিত হতে থাকে। জাতীয় চরিত্র, জাতীয় শক্তি, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের চেতনায় সমাজের পূর্বাপর ঐতিহাসিক বিচারের সূত্রপাত হয়। দেখা দেয় অতীতমুখিতা ও অতীত ঐতিহ্যের পনরুজ্জীবন-প্রয়াস। জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার জন্যে সার্থকভাবে যিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশের নবোদ্ভূত জাতীয়তাবাদী চেতনায় আধ্যাত্মিক সুর সংযোজন করে তিনি দেশের উত্তরকালীন রাজনীতির সম্প্রদায়গত মনোভাবের গোড়াপত্তন করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে উনিশ শতকে বাংলায় যে রেনেসাঁস আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা বেশিকাল স্থায়ী হয় নি। বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও ক্রমবিস্তারে ইহমুখী জীবনবোধ ও বুদ্ধির স্বাধীন চর্চা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেও আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল না। ইয়ং বেঙ্গলের শিরোমণি রামগোপাল ঘোষ ও দিগম্বর মিত্রকে তাই দেখা যায় পারিবারিক দুর্গাপূজার প্রথাকে ফিরিয়ে আনতে। অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম নয়তো খ্রীষ্টধর্মের দিকে ঝোঁকেন। ১৮৮২ সালে কলকাতায় যখন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির একটি শাখা স্থাপিত হয় তাতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম কর্ণধার প্যারীচাঁদ মিত্র ও শিবচন্দ্র দে। তাহলেও ইয়ং বেঙ্গল যুগের যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ক্ষীণ সূত্রধরে পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তি ইহমুখী জীবনদর্শনের সন্ধানী ছিলেন। তাঁরা ফরাসি দার্শনিক ওগুস্ত কোঁৎ-এর (১৭৯৮-১৮৫৭) দৃষ্টবাদে (Positivism) আকৃষ্ট হন।[১] তাঁদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও তাঁর ভ্রাতা রামকমল, কংগ্রেস নেতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।[২]

দৃষ্টবাদী দর্শনের মূলকথা হল যে মানবমন ঈশ্বরতত্ত্ব ও অধিবিদ্যার দুটি স্তর অতিক্রম ক'রে, দৃষ্টবাদী তৃতীয় স্তরে পৌঁছয়। ঈশ্বরতত্ত্বে অতিপ্রাকৃত কার্যকারণ ব্যাখ্যা এবং অধিবিদ্যায় মানবচিত্তের অতীত বিমূর্ত শক্তির কল্পনা করা হয়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে প্রকৃতির রহস্যভেদের প্রয়াস দৃষ্টবাদী তৃতীয় স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া দৃষ্টবাদে সামাজিক গতিপ্রকৃতিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার এবং সমাজতত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ সূত্রনির্ণয়ে গুরুত্ব আরোপ করা

হয়। সমাজকে যথোচিত প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল মানুষের আয়ত্তাধীনে আনাই ছিল আসল লক্ষ্য, যাতে মানবজীবন সুখদায়ক হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য যে কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ পাশ্চাত্ত্যে উনিশ শতকের বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন প্রয়াসকে অনেকাংশে শক্তিশালী করেছিল।

বৈজ্ঞানিক রীতি ও পদ্ধতির প্রতি মাত্রাধিক আবেগ সত্ত্বেও কোঁৎ মানবসমাজে সংঘবদ্ধ ধর্মীয় প্রবণতাকে উপেক্ষা করেন নি। তাঁর ধর্মচিন্তা বৈজ্ঞানিক, এবং তাতে ঈশ্বর অনুপস্থিত, ঈশ্বরের স্থানে মানব প্রতিমা অধিষ্ঠিত। কিন্তু কোঁৎ যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে মানবপ্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করেন নি। তাঁর মানবতা নিছক আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতীকের সাহায্যে মানবতাকে ফুটিয়ে তোলার তাগিদে শেষাবধি তিনি যিশুক্রোড়ে ম্যাডোনার চিত্র প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেন।

বাংলাদেশেও দৃষ্টবাদ ক্রমে একটা ধর্মের ব্যঞ্জনা লাভ করে। কোঁৎ হয়ে দাঁড়ান একজন ঋষি। হিন্দু স্তোত্রপাঠে প্রবিষ্ট হয়। দৃষ্টবাদ বাঙালি মননজীবনে ক্রমে বিশেষ সমাদরের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ কিছুকাল দৃষ্টবাদী দর্শনে আবিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দৃষ্টবাদকে যথার্থ গ্রহণ ও পরিবর্ধন করেন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

উৎস নির্দেশ

১. G. H. Forbes. *Positivism in Bengal* ; 1975. p. 51
২. Niranjan Dhar. 'Religion of humanity', *Radical Humanist*, 23 and 30 March, 1969.
৩. Auguste Comte. *The catechism of positive religion* tr by R. Congreve. London, 1891. p. 256-9

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।। ১৮৩৮—১৮৯৪

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই এদেশে কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হয়ে গিয়েছিল। অনেক বাদবিতণ্ডার পর ইংরেজি শিক্ষারও চলন শুরু হয়ে যায়। সিপাহি-যুদ্ধের পর সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৫৮)। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়ে যশোহরে তিনি বছর দেড়েক শিক্ষানবিশি করেন। সিভিল সার্ভিসের নিয়মানুসারে কাঁথি, খুলনা, বারাসত, হুগলি প্রভৃতি স্থানে বদলির পর সবশেষে তিনি আলিপুরে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯১ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

বাল্যকালে পারিবারিক পূজাঅর্চনার পরিবেশে তাঁর মনে অধ্যাত্মচিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হয়; মধ্যজীবনে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়নের ফলে কিছুটা অজ্ঞাবাদী (agnostic) হয়ে উঠলেও পারিবারিক প্রভাবকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পরিণত জীবনে সাধু-সন্ন্যাসীদের সংসর্গে তিনি সম্পূর্ণ আস্তিক হয়ে ওঠেন। তাঁর মনে রামমোহনের আরোহী পদ্ধতিতে ইতিহাসচিন্তা এবং অক্ষয়কুমারের বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ একসময়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন ও সংস্কারপন্থীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ লক্ষিত হলেও তাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন সমধর্মিতা অস্বীকার করা যায় না। পক্ষান্তরে সমকালীন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করে নি।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন যে ঐ সময়ে হিন্দুধর্ম পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টার দুটি দল দেখা যায়। একটি শশধর তর্কচূড়ামণি, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রমুখ রক্ষণশীলদের, অপরটি বঙ্কিম, চন্দ্রনাথ বসু, নবীন সেন প্রমুখ 'নবজীবন' পত্রিকা-গোষ্ঠীর। মিল-স্পেন্সার-ডারউইনের চিন্তায় বঙ্কিম হিন্দুধর্ম ও দর্শনকে ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু বঙ্কিমের উপর কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ (Positivism) সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছিল---যার সাহায্যে তিনি সমাজ ও জীবনের প্রতিটি দিকের নতুন মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হন।[১]

হিন্দুধর্মের বিশেষ ব্যাখ্যাসূত্রেই বঙ্কিমের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বাধে।[২] রামমোহন সম্পর্কেও বঙ্কিমের বিরূপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; তার কারণ রামমোহনের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বেশি অন্তরঙ্গতা।[৩] তাছাড়া রামমোহনের চিন্তায় হয়তো বঙ্কিম তাঁর অভীষ্ট অখণ্ড কোনো জীবনতত্ত্ব খুঁজে পান নি, যা থেকে সমাজ ও জীবনের একটা সুস্পষ্ট নীতি ও আদর্শ পাওয়া যায়। বঙ্কিম চিন্তাশক্তিকে জাগাতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে রামমোহনোত্তর

আদি ব্রাহ্মনেতা দেবেন্দ্র-কেশবের "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়" তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হন নি। নববিধানপন্থী কেশবচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের প্রতি আকৃষ্ট হলেও তাঁদের যুক্তি ও বিচারবিবর্জিত অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও প্রত্যাদেশবাদকে মানতে পারেন নি। একমাত্র অক্ষয়কুমারের প্রাকৃতিক নিয়মনির্দেশিত যুক্তিবাদে বঙ্কিম অনুপ্রাণিত হন।

সবকিছু সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে ব্রাহ্মদের সঙ্গে অমিলের চেয়ে মিলই তাঁর বেশি ছিল—বিশেষ করে এইজন্যে যে ব্রাহ্মধর্ম বলতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কোনো ধর্মমত নেই—তাঁদের বিভিন্ন দল ও উপদলের চিন্তায় যথেষ্ট পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়। তাই বিপিনচন্দ্র বলেছেন—

> বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যার দ্বারা হিন্দুধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে একটা সমন্বয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন।[১]

গোঁড়া হিন্দুদের চেয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গেই তাঁর বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহ রোধ, অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতি সমাজসংস্কারে তিনি বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু সেই সকল বিষয়ে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে আইন প্রবর্তন অপেক্ষা জনচেতনা সৃষ্টিই হবে অধিক কার্যকর। তিনি মনে করতেন জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যথোচিত চেতনা সৃষ্ট হলে মানুষের মন থেকে ঐসব সামাজিক সংকীর্ণতা স্বতঃই বিদূরিত হবে। ছাত্রজীবনে 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় রচনা প্রকাশের সূত্রে প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় গুপ্তকবির বিশেষ প্রভাব ছিল। সেই প্রভাবেই হয়তো বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভিন্নচিন্তা দানা বাঁধে।

ধর্ম্ম ও হিন্দুত্বের তিনি পৃথক ব্যাখ্যান করেছেন। দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-প্রত্যয় বৈদিক নয়; কারণ তাতে বঙ্কিমের উক্তি অনুযায়ী "সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল"; তাঁর হিন্দুত্ব প্রত্যয় ঔপনিষদও নয়, কারণ সেখানে "চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মের কোন ব্যবস্থা নাই"; তাঁর হিন্দুত্ব বুদ্ধের জ্ঞানময় ও ধ্যানময় ধর্ম্মও নয়, কারণ "বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না।" তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুত্বের প্রত্যয় কি? তিনিই বলেছেন—

> এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা,

এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে।[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-প্রত্যয় সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তর (১৮৪৮-১৯০৯) অভিমত হল—

তিনি হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, আমার মতে তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণ—একটি চিহ্ন স্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য-সংঘটন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্ম্মের সঞ্জীবনী-শক্তি প্রচার করণ, অজ্ঞানতাব ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞান বিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন—এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা আজ বঙ্গ সমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র।[৬]

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় স্বাবিরোধিতা বা পরিবর্ত্তন ঘটেছে বিস্তর। সেকথা তিনি নিজেই বলেছেন—

আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে?…মত পরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্ত্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।[৭]

প্রথম জীবনে যে-মানুষ স্বভাবতই ছিলেন যুক্তিবাদী নবীনতার অনুরাগী, পরিণত বয়সে তিনি হয়ে পড়েন প্রাচীনতার পক্ষপাতী। নবীন বয়সে মিল ও বেনথামের প্রভাবে তিনি 'সাম্য' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পরে নিজেই তার বিপরীত মত প্রকাশ করেন। এমনকি অধিকার-ভেদ স্বীকার করে বলেন, "সকলে তুল্যরূপে মোক্ষাধিকারী নহে।" পাশ্চাত্ত্য সমাজের অনুসরণে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারেও তাঁর বিশেষ অনুমোদন ছিল না। তবে নারীকে তিনি যথোচিত মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করেন নি।

বেনথামের হিতবাদ (Utilitarianism), মিলের যুক্তিবাদ (Rationalism) ও স্পেন্সারের অজ্ঞাবাদ (Agnosticism) বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় একসময়ে যতই প্রভাব বিস্তার করে থাকুক না কেন তিনি কোনোদিনই যথার্থ নাস্তিক ছিলেন না। স্বর্গ ও নরক সম্পর্কে তিনি মনে করতেন যে ঐ শব্দ দুটির দ্বারা কোনো স্থান বোঝায় না—অবস্থান বোঝায়। রামমোহনের পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণচিন্তা ও প্রয়াস উত্তরকালে বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে—

যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম

একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।[৮]

প্রাক্-বঙ্কিম বাংলার মননধারায় সবারই দৃষ্টি পড়েছিল ইহজীবনের পুনর্গঠনে—ধর্ম, মুক্তি ও ঈশ্বরচিন্তার কাজ হয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল কেবল জীবনাচারের দিকটি—যেন বঙ্কিমেরই দৃষ্টিদানের অপেক্ষায়। তাঁর সঙ্গে সমকালীন বিদগ্ধ সমাজের মতের মিল ছিল না। গতানুগতিক ধারা থেকে স্বতন্ত্রপথে নিজের ভাবনাচিন্তাকে মুক্তি দেবার জন্যে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাটির সাহায্য নিয়েছিলেন। ক্রমে তাঁকে ও তাঁর ঐ পত্রিকাটিকে ঘিরে একটি লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পত্রিকাটি বেশি দিন চলে নি। ১৮৮৪ সালে তিনি 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামে দুটি পত্রিকা বের করেছিলেন এবং সে-দুটির মাধ্যমে স্বকীয় পদ্ধতিতে ধর্ম ও দর্শনচর্চায় প্রবৃত্ত হন।

তত্ত্বগতভাবেই তিনি চিন্তা করেছেন, যুক্তি খুঁজেছেন, কিন্তু হাতেকলমে প্রয়োগের চিন্তা ও চেষ্টা—অর্থাৎ ধর্মপ্রচার, সমাজসংস্কার কিংবা দলগঠনের দিকে তিনি যান নি। তবে তাঁর চিন্তা ও সাধনা যে সর্বাংশে একক ও আত্মকেন্দ্রিক ছিল তা নয়। প্রকারান্তরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সংগঠিত তৎপরতার মতো তৎকালীন বাংলার একদল পণ্ডিত ও মনীষীকে একসূত্রে আবদ্ধ করেছিল।

রামমোহনের পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির সাধনা ছিল বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ, কিন্তু পরস্পরবিচ্ছিন্ন; নব্যবঙ্গদলের সমাজকল্যাণকর্মে যুক্তিধর্মিতা, অক্ষয়কুমারের প্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের লক্ষ্য-পরিবর্তন, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিজ্ঞানসাধনা, তত্ত্ববোধিনী-গোষ্ঠীর সংযত তত্ত্বালোচনা, হিন্দুদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের বিরোধ, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বাঙালি জনচিত্তের বিকাশ বিক্ষিপ্তভাবে এগিয়ে চলেছিল। বিভিন্ন ধারায় প্রবহমান সেইসব খণ্ডপ্রয়াস বঙ্কিম-পর্বে এসে সমন্বিত রূপ পরিগ্রহ করে। রামমোহনোত্তর বাংলার জীবন ও মনন ছিল পশ্চিমী ধারায় প্রভাবিত। ফলে দেশের জনসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল ছিল পশ্চিমী শিক্ষায় প্রাগ্রসর, কিন্তু বৃহৎ দলটি সে-শিক্ষায় বঞ্চিত থাকে। শিক্ষিত বাঙালির বাংলা সাহিত্যে রুচি ছিল না। অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসগর, রঙ্গলালের রচনা স্কুলপাঠ্য হিসাবে পরিগণিত হত, মাইকেলের সাহিত্য সমাদর পেলেও "সেকালের সাধারণ ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর সোজা ছিল না, বুঝা কঠিন ছিল।" ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলে অভিহিত তখনকার সাহিত্যের লক্ষ্য ছিল "ব্যক্তিগত চরিত্রে শুদ্ধতা সাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ সংস্কার"।[৯] ব্রাহ্মদের সেই আদর্শ অনেকটা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতায় ছিল আবদ্ধ; তাঁদের ধর্ম ও সমাজসংস্কারের

আন্দোলনে যে-সব সাধারণ মানুষ যোগ দেন নি বা দিতে পারেন নি তাঁরা বাংলার নবচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যান। বঙ্কিমচন্দ্র দেশের সেই দ্বিধারাকে যুক্ত করার প্রয়াসী হন। সেদিনের শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের যেমন সংযোগ ঘটে, তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গেও জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগসূত্র সূচিত হয়।[১০] নিছক সাহিত্যচর্চা বা সংবাদ পরিবেষনের জন্যে পত্রিকাটির সৃষ্টি হয় নি। ইতিহাসের গতিনির্ণয়, জাতীয় ধারার মূল্যায়ন, বিজ্ঞানচর্চা, সমাজবিজ্ঞানের অনুধাবন এবং সেইসঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বঙ্গদর্শনে নিয়মিত প্রকাশিত হত। সেই সব রচনার মধ্যে চিন্তাগত ঐক্য প্রকাশ পেত; আর বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই একতার মধ্যমণি। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বিষয়গুলি ছিল মোটামুটি তিন ধরনের—১. বিশ্লেষণধর্মী, অর্থাৎ ধর্ম, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদির ব্যাখ্যান ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা; ২. গৌরবোদ্দীপক, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে দেশবাসীর কর্মোদ্যোগ ও গৌরববোধ জাগ্রত করা এবং সাহস ও বীর্যের উন্মেষসাধন; ৩. সাহিত্যচর্চা। যদিও বঙ্গদর্শনের মেয়াদ ছিল মাত্র চার বছরের তবু তারই মধ্যে বাংলার ভাবুক-সমাজে একটা জীবনবোধ ও স্থায়ী মূল্যবত্তা সঞ্চারিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনকে ঘিরে সেদিন দেশের যে-সব জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ ঘটে তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। এঁদের সকলেই যে সাহিত্যশিল্পী ছিলেন তা নয়, কিন্তু পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার বিচারে এঁরা নিঃসন্দেহে উচ্চস্থানের অধিকারী। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—"বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল।"[১১]

বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক কোনো আন্দোলনে প্রকাশ্যভাবে যোগ দেন নি। অন্যান্য চিন্তানায়কেরা তত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে যখন সংস্কার-আন্দোলনে সক্রিয়, সে-সময়ে তিনি ধ্রুব আদর্শের বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক গবেষণায় নিমগ্ন। দল গঠন, ধর্ম-প্রচার বা সমাজসংস্কারে তাঁকে সরাসরি নামতে দেখা যায় নি। হয়তো চাকরির কাজে বেশির ভাগ সময় মফস্বলে ঘোরাঘুরি করা ও আটকে থাকার দরুন গঠনমূলক কর্মতৎপরতায় তাঁর পক্ষে জড়িত থাকা সম্ভব হয় নি। তাছাড়া সরকারি চাকুরে হওয়ার ফলে পাছে সরকারের রোষনজরে পড়েন সেই আশঙ্কায় রাজনীতি সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে লিখতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন—

I won't take up politics, because then I would be sure to rouse the indignation of Anglo-Saxonian against 'Mookerjee.' That is why *Bangadarshan* has little of politics in it.[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকালেই দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত রূপ লাভ করেছিল। তার সঙ্গে তিনি পরোক্ষ সংশ্রব বজায় রাখতেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে (১৮৭৬) তিনি একটি শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছিলেন। অনেকে তাঁকে নবগঠিত কংগ্রেসের বিরোধী বলে মনে করতেন। কংগ্রেসের বিরোধী না হলেও তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র মনোভাব পোষণ করতেন—

কংগ্রেসের প্রতি আমার সহানুভূতি নাই, একথা আমি কখনই বলিতে পারি না—উহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে প্রণালীতে উহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, আজ পর্য্যন্ত উহা সাধারণের যোগদানের উপযুক্ত হয় নাই। উহার সমস্ত আন্দোলন যেন ক্ষণস্থায়ী ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উহা এখনও সমস্ত দেশের লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই। দেশের সাধারণ লোকদিগকে দূরে ও অন্ধকারে রাখিয়া কতিপয় শিক্ষিত লোকের অভিপ্রায় অনুরূপ কার্য্য সাধিত হইলে কখনই উহার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক কখনই উহার আবশ্যকতা ও মহত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না…।[১৯]

উপরের উদ্ধৃতি থেকে দেশে নবোদ্ভূত দলীয় রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ও গণতান্ত্রিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনিও সিপাহিবিদ্রোহকে সমর্থন করেন নি। আবার দীনবন্ধু মিত্রের একান্ত বান্ধব বঙ্কিমচন্দ্র নীলকরদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও সে-বিষয়ে নীরব থাকেন। এখানে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল দেখা যায়, যদিও রামমোহন জন্ অ্যাডাম প্রবর্তিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচন-নীতির প্রতিবাদ করেছিলেন; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লিটনের 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট, ১৮৭৮' বিতর্কের সময় দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন।[২০] অন্যদিকে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের মতো তিনিও ইংরেজশাসনকে অন্তত সাময়িকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক সৃজনশীলতা মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথমটি অপরিণত চিন্তা ও রোমান্টিক উপন্যাসের যুগ। 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় বাল্যরচনার শুরু (১৮৫২) এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) প্রকাশসহ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার আবির্ভাবের (১৮৭২) প্রাকাল অবধি এই পর্যায়ের বিস্তার।

এই পর্যায়ে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দেন নি। বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল থেকে 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), রচনার পূর্ববর্তী সময়কে দ্বিতীয় পর্যায় বলা চলে। এই পর্বে 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে 'বঙ্গদেশের কৃষক' (১৮৭২), 'সাম্য' (১৮৭৯), 'বিজ্ঞানরহস্য' (১৮৭৫), 'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৮৭৩), 'লোকরহস্য' (১৮৭৪), 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১৮৮৭) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এইসব রচনায় তাঁর দর্শন, রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক চিন্তার প্রথম পরিচয় মেলে। বস্তুত এই পর্যায়টিই তাঁর মননশীল জীবনের সার্থক পরিচয় বহন করে। আনন্দমঠ (১৮৮২) থেকে জীবনের শেষাবধি তৃতীয় পর্যায় বিস্তৃত। দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ যেমন এক ঐতিহাসিক ঘটনা, তৃতীয় পর্যায়ে তেমনি 'প্রচার' পত্রিকার প্রকাশনও (১৮৮৪) তাঁর অপর এক কৃতিত্বের পরিচিতি। উক্ত পর্যায়েই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধর্মী তিনটি উপন্যাস 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪) এবং 'সীতারাম' (১৮৮৭) প্রকাশিত হয়। মানসিকতার ক্রমবিবর্তনে এইসময়ে তাঁর চিন্তায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়, যার পরিণতি 'কৃষ্ণচরিত্র' (১৮৮৬) ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (১৮৮৮) গ্রন্থদুটিতে সুপরিস্ফুট।

ইতিহাসচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্র জাগতিক গতিশীলতা ও ঘটনাপরম্পরার পশ্চাতে সৎ, চিৎ ও আনন্দের অস্তিত্ব নির্দেশ করেন। জগতে যা কিছু বিদ্যমান বা সত্য বলে প্রতীয়মান তা সেই সৎ-এর প্রকাশ; জাগতিক প্রক্রিয়ার বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, বহুত্বের মধ্যে একটি ঐকতান অনুরণিত হওয়ার পিছনে এক অনন্ত ও অনির্বচনীয় শক্তি বিদ্যমান—যা থেকে বিশ্বচরাচর জন্মায়, যার সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয় এবং পরিণামে তারই সঙ্গে লীন হয়ে যায়—সবকিছুই সেই চিতের উপর নির্ভর করে। সতে যে চিতের অস্তিত্ব—তারই প্রভাবে জাগতিক শৃঙ্খলা ও তাতেই জীবনের সার্থকতা এবং আনন্দযুক্ত সেই সার্থকতায় জীবের সুখ বর্তায়।

যে-জীবে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম চরমোৎকর্ষ লাভ করে, সচ্চিদানন্দ সেক্ষেত্রে মহোজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্মের স্বারূপ্যসিদ্ধ, তিনিই মুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মানুষের সহজাত সকল বৃত্তিসমূহের অনুশীলন দ্বারা সম্যক বিকাশ, পরিণতি ও সমন্বয়ই ধর্মের লক্ষ্য এবং তিনিই আদর্শ পুরুষ যাঁর সকল বৃত্তি বিকশিত, পরিণত ও সামঞ্জস্যময়। এই অবস্থাকেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব বলা হয়, এখানেই মোক্ষ। তাঁর মতে—"ধর্ম্মের সার culture—কর্ষণ—মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম্ম।"

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনটি পৃথক সত্তায় তিনি বিভক্ত। সেই ত্রিসত্তার একজন করেন সৃজন, অন্যজন পালন ও অপরজন ধ্বংস করেন। তাঁর এই বৈদিক ত্রিদেব প্রত্যয়কে তিনি বিজ্ঞান-সম্মত বলে মনে করতেন। এই জগৎব্যাপী সর্বত্র, সর্বকার্যে এক অনন্ত, অচিন্ত্য ও অজ্ঞেয় শক্তি আছে—যা সমস্ত কিছুর কারণ এবং বহির্জগতে অন্তরাত্মার স্বরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র উপনিষদ্-কথিত সৃষ্টি-তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে বলেছেন—

জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন, ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থূল কথা···ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution-বাদের স্থূল কথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না—একাঙ্গিত্ব ও বহুঙ্গিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়···কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে।[২৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থটিকে অংশত প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বলে গণ্য করা হয়। গ্রন্থটিতে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বও আছে। তাতে তিনি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা দর্শিয়েছেন। তাঁর মতে মহাভারত নিছক কল্পনাপ্রসূত মহাকাব্য নয়, ইতিহাসও। কারণ কৃষ্ণের উল্লেখ মহাভারত ছাড়া বিভিন্ন সময়ে লিখিত পুরাণগুলিতেও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ চরিত্রটি তাই কবিমনা ভাবুকের কল্পনাজাত রূপকমাত্র নয়। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন যে ঋগ্বেদে কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া গেলেও তিনিই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বাসুদেব কিনা সেকথা বলা শক্ত। হীরেন্দ্রনাথ পুরাণান্তর্গত কৃষ্ণবংশের একটি বংশলতিকার উল্লেখ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—

Bankim Chandra's story of Shree Krishna followed the main canons of modern scriptural and historical criticism that had been first introduced by the Brahmo Samaj into modern Bengali thought and literature. In building up some sort of a history out of the legends and traditions that had gathered in course of unremembered centuries around the name and character of Shree Krishna in the Hindu books, Bankim Chandra really followed the lead of Renan whose life of Jesus Christ had been at one time a favourite study with the members of the Brahmo Samaj.[২৬]

বঙ্কিমচন্দ্র অবতারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরের অবতাররূপে জ্ঞান করতেন। কিন্তু ভগবানের মনুষ্যদেহ ধারণ সম্ভব কিনা এবং তার প্রয়োজনই বা কি সে-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ, ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না।…অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।…এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?[১৭]

তবে কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা অপেক্ষা কৃষ্ণের মানবচরিত্র উদ্‌ঘাটন করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বধর্ম ও বর্ণাশ্রম বিষয়ক প্রত্যয় দুটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে স্বধর্ম ব্যাপকার্থে গীতায় প্রযুক্ত হয়েছে, কারণ গীতার উপদেশ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়, সার্বভৌম। তাঁর কথায়—"ইহজীবনে যে, যেকর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম"। গীতার ব্যাখ্যানে তিনি বলেছেন—

> ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই?…ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।[১৮]

সমকালীন যুগের দাবিতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সংস্কৃতি ও অতীতের দিকে তাকিয়েছিলেন। কিন্তু অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি বর্তমানকে অস্বীকার না করে উভয়কে প্রয়োজনানুযায়ী সমন্বিত করার প্রয়াসী হন। স্বর্ণময় অতীতকে তিনি দেশ ও কালের অতীত পরম তত্ত্ব বলে উপলব্ধি করতেন। এবং সে চেতনায় দেশ-কাল নির্বিশেষে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন।

দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে

বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থটিতে সর্বাধিক পাওয়া যায়। অন্যান্য লেখাতেও তাঁর দার্শনিক মতামত ছড়িয়ে আছে; তিনি সমন্বয়ধর্মী ও সম্পূর্ণ একটি জীবনদর্শন রচনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা গভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক মননশীলতার পরিচায়ক। প্রতীচ্যের নবলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তিনি নিষ্কাম ধর্ম তথা ভারতের সনাতন জীবনাদর্শকে নবরূপ দিতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের দার্শনিক চিন্তাধারা

তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর উপর পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের প্রভাব সর্বক্ষেত্রে শেষাবধি স্থায়ী না হলেও তা তাঁর মানসিকতার পরিশীলনে বিশেষ সহায়তা করে।

শিক্ষিত বাঙালিসমাজে 'পজিটিভিজম' ও 'ইউটিলিটারিয়ানিজম' মতবাদের দ্রুত বিস্তার ঘটায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। তত্ত্ববোধিনীতে রাজনারায়ণ বসু বঙ্কিমচন্দ্রকে সরাসরি "জঘন্য কোমৎ মতাবলম্বী" বলে নিন্দা করেন; এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে ওগাস্ত কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ এক সময় বাঙালি বিদগ্ধসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন এই প্রভাবিতদের একজন—তখন তাঁর বয়স ও মন উভয়ই অপরিণত। কোঁৎকে তিনি আদর্শরূপে জ্ঞান করতেন। কোঁৎ-এর মতবাদে মানবিক চিন্তাধারায় তিনটি ক্রম-পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে—"Theological philosophical and the positive or scientific"। ভারতীয় চিন্তার ধারানুসারে যাকে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক বলা যায়। প্রথম পর্যায়ে মানুষ প্রকৃতির সবকিছু বিষয়ের সঙ্গে এক-একটি দেবদেবীকে যুক্ত করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐ-সব দেবদেবী অ-দৃষ্ট প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মে ও দর্শনের পথ রচনা করেন। আর তৃতীয় পর্যায়টিকে "বৈজ্ঞানিক ক্রম" মনে করা হয়। কোঁৎ-এর মতে অধ্যাত্মচর্চা নিষ্ফল—বিজ্ঞানই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। বিজ্ঞানের বিকাশ অনুযায়ী কোঁৎ তাকে এইভাবে ক্রমবিন্যস্ত করেন: গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, রসায়ন, জীববিদ্যা ও সমাজতত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিজ্ঞানের সঙ্গে 'প্রজ্ঞান' প্রত্যয়টি যুক্ত করেন। তাঁর মতে ভৌত বিষয়কে জানতে হলে বহির্বিজ্ঞান অর্থাৎ কোঁৎ এর প্রথম চারটি বিভাগের সাহায্য নিতে হবে। আত্মতত্ত্ব জানার জন্যে প্রয়োজন বহির্বিজ্ঞান, বিশেষত জীববিদ্যা এবং অন্তর্বিজ্ঞান, অর্থাৎ সমাজতত্ত্বের সাহায্য। এ-সব জ্ঞানের উৎস তাঁর মতে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান। কোঁৎ অজ্ঞাবাদী (agnostic) ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। কোঁৎ-এর চিন্তায় প্রত্যক্ষ তন্মূলক অনুমান ব্যতীত প্রমাণান্তর নেই।[১৯] ঈশ্বর হয় কাল্পনিক, নয়তো অ-দৃষ্ট—দৃষ্টবাদীর কাছে তা পরিত্যাজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞানতত্ত্বে বলা হয়েছে "প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল, সকল প্রমাণের মূল"। পরে 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এ সন্নিবেশিত "জ্ঞান" শীর্ষক প্রবন্ধের পাদটীকায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন—"এই সকল মত আমি এখন পরিত্যাগ করিয়াছি।" 'ধর্ম্মতত্ত্ব'—এও একথার পুনরুক্তি করে বলেছেন—"সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে।" হার্বার্ট স্পেন্সার (১৮২০-১৯০৩)-এর অজ্ঞাবাদী ভাবনার অর্থাৎ যে-মতে ঈশ্বর তর্কাতীত, অচিন্তনীয় অপরিমেয় ও অজ্ঞেয়, সে-মতে

বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকেই কোঁৎ প্রমাণের পথ বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ তার পরিচয় পাওয়া যায়—

> প্রাচীন ঋষি ও পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্যাদা ও অনাদর করিবে না···আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।[২০]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল বক্তব্য যে ভাগবত উক্তির উপর রচিত সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কোঁৎ-এর একান্ত অনুরাগী হলেও তিনি কোঁৎ-এর প্রভাব পরবর্তীকালে বর্জন করেন।

পশ্চিমী দার্শনিকদের মধ্যে জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২)-কেও তিনি এক সময় সানুরাগচিত্তে শ্রদ্ধা করতেন। বেনথাম হিতবাদের (Utilitarianism) প্রবর্তক। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "বেন্থাম হিতবাদ-দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন"।[২১] এ-বিষয়ে বেনথামের প্রধান অনুগামী ছিলেন জন্ স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩)। হিতবাদের সারমর্ম হল: সুখ ও আনন্দই মানুষের একমাত্র কাম্য। সেই পন্থাই মানুষের অনুসরণীয় যাতে বহুজনের হিত সাধিত হয় (Greatest good of the greatest number)। এবং হেয় ও পরিত্যাজ্য হল তা-ই যা বহুজনের পক্ষে অহিতের কারণ। হিতবাদ ও সুখবাদ (hedonism) এক নয়। এ বিষয়ে অবশ্য নানান মত আছে। হিতবাদী মতে সুখদুঃখই ধর্ম ও অধর্মের একমাত্র মাপকাঠি। হিতবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

> যদি একদিকে একজনের হিতসাধন ও আর একদিকে দশজনের তুল্য হিতসাধন পরস্পরবিরুদ্ধ কর্ম্ম হয়, তবে একজনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশজনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম্ম···এখানে good of the greatest number ···পক্ষান্তরে যেখানে একজন অল্প হিত, আর একদিকে আর একজনের বেশী হিত পরস্পর-বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম্ম···এখানে কথাটা greatest good.[২২]

গীতার "সর্বভূতহিতে রতাঃ" উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারায় হিতবাদ বিদ্যমান ছিল। হিতবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য আপেক্ষিকভাবে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন, অর্থাৎ যেমন সত্য পালনে পরের অনিষ্ট আশংকা থাকলেও সত্যভঙ্গ অন্যায় নয়।

বেনথামের মতো মিলকেও বঙ্কিমচন্দ্র অপরিণত বয়সে আদর্শ জ্ঞান করতেন। কিন্তু পরে মিল সম্পর্কেও তাঁর মতপরিবর্তন হয়। হিতবাদকে

তিনি কমলাকান্তর মুখ দিয়ে "পুরুষার্থ" ও "উদার দর্শন" বলে পরিহাস করলেও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন—"হিতবাদ মতটা, হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে।...হিতবাদ ধর্ম্ম—অধর্ম্ম নহে।"[২৩]

হিতবাদের পক্ষাপক্ষে যা কিছু বক্তব্য থাকুক না কেন মূলত তা উদারনৈতিক এবং ব্যষ্টির পরিবর্তে সমষ্টির কল্যাণপন্থী। বেনথামের দৃষ্টিতে সুখ যে কোনো প্রকারের হোক না কেন তা সমপর্যায়ভুক্ত। বেনথামের অনুগামী মিল সেজন্যে সুখের শ্রেণীবিভাগ করেন এবং মানুষের উচ্চতর সত্তা তথা মানসিক বৈশিষ্ট্যের কষ্টিপাথরে সুখকে যাচাই করে নিতে বলেন। তাঁর মতে—"It is better to be a Socrates dissatisfied than a fool satisfied—better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied"। মিলের এ-কথায় বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ সমর্থন ছিল। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেছেন—"ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না, সে-অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ।"[২৪] সুখের তিনি তিনটি পর্যায় দেখিয়েছেন। সুখ ত্রিবিধ: ১. স্থায়ী; ২. ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য; ৩. ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। হিতবাদী দর্শনে বহুর জন্যে একের আত্মত্যাগের কারণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, ঈশ্বর সর্বভূতে বিদ্যমান—সর্বজনের সঙ্গে নিজের অভেদ উপলব্ধির মধ্যে জ্ঞান, ধর্ম, প্রীতি ও ভক্তির উন্মেষ—সমস্ত জগৎকে আত্মবৎ প্রীতির আধার করাই কাম্য। হিতবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী ধর্মকে তার অঙ্গ মনে না করে হিতবাদকে ধর্মের অঙ্গস্বরূপ তথা তাঁর "অনুশীলন" তত্ত্বের একটি অংশ বলে মনে করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলিকে 'বৃত্তি' আখ্যা দিয়েছেন এবং সেগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী নামে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন। এগুলিকে অবশ্য তিনি স্থানান্তরে মোটামুটি মানসিক ও শারীরিক রূপে বর্গবিন্যাস করেছেন। ঐ-বিভাগগুলি প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি না হইলে, শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না...মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে; কতকগুলি কাজ করে বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়; আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্য্যকারিণী বৃত্তি বলিব।

আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল।[২৫]

তাঁর মতে ঐ-বৃত্তিগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। সেগুলি কেবল বিকশিত হলেই চলবে না, তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা চাই। মনের জন্যে সুস্থ শরীর এবং শরীরের জন্যে সুস্থ মন। "তাহা হইলেই বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতি ঘটিবে। ইহাই ধর্ম্ম।"

অনুশীলন-তত্ত্বের মূল-কথাই হল সকল বৃত্তি পরস্পর সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হয়ে অনুশীলিত হবে, একে অপরকে অবদমন করে বর্ধিত হবে না। অনুশীলনের স্থূল কথা পারস্পারিক সামঞ্জস্য। তবে বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তি সুখ নয়—সুখের অঙ্গ, সুখটা ঘটে তাদের সমবায়ে। সেখানেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা। তাকেই বলা যায় মানুষের ধর্ম। তবে বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে এতগুলি বৃত্তির সম্যক পরিপূর্তি ও সমন্বয় সকল ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় বলে মনে করতেন।

দ্ব্যর্থহীনভাবেই তিনি বলেছেন যে পাশ্চমী অনুশীলনধর্মের লক্ষ্য নিছক সুখমাত্র। কিন্তু তাঁর অনুশীলন-তত্ত্বে তিনি ভারতীয় ভাবধারাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন এবং সেটা তাঁর মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ—এবং তারই উপর ভগবদ্গীতা প্রতিষ্ঠিত; তাঁর এই অনুশীলন-তত্ত্বের লক্ষ্য মুক্তি।

ভক্তিবাদের আশ্রয়ে তিনি অনুশীলন-তত্ত্ব প্রচার করেছেন। ভক্তিশাসিত-অবস্থাকেই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য বলে অনুভব করতেন এবং তাঁর কাছে ভক্তিই অনুশীলনের একমাত্র মার্গ। "অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি"-র উৎস হলেন ঈশ্বর। ঈশ্বরভক্তিই তাঁর কাছে মনুষ্যত্ব। ভক্তির পরেই তিনি শান্তি, প্রীতি, দয়া ও অহিংসার কথা বলেছেন। তাঁর কাছে অহিংসা একটি প্রধান আদর্শ; ধর্মের প্রয়োজন ভিন্ন যে-হিংসা তা থেকে বিরত হওয়াই ধর্মের নির্দেশ; অবশ্য হিংসাকারীর দমনের জন্যে হিংসা অধর্ম নয়। কামক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলিকে অনুশীলন দ্বারা সংযত রাখা উচিত, ধ্বংস নয়—এই ছিল তাঁর হিংসা সম্পর্কে অভিমত। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন ঐশ প্রয়োজন ও নিয়ম রক্ষার জন্য ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয় সংযম অবশ্যই পালনীয়।

তাঁর 'চিত্তরঞ্জিনী' প্রত্যয়ও তাৎপর্যপূর্ণ। কথাটি নন্দনতত্ত্বের; বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাষায়—"যে-সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্ম্মল ও অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করি—তাহারাই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি"। ঈশ্বর অনন্ত সুন্দর; তিনি একাধারে সত্য, শিব ও সুন্দর। যা কিছু সুন্দর

তার উৎস সেই চিরসুন্দর। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এই বৃত্তিকেও ঈশ্বরাভিমুখী করা প্রয়োজন। তাকেই বলা যায় নিষ্কাম ধর্ম, চিত্তশুদ্ধি ও স্থায়ী সুখ। তার লক্ষণ ভক্তি, প্রীতি ও শান্তি। তাকেই বলে ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখাত অনুশীলনতত্ত্বটির উৎস সম্পর্কে মতভেদ আছে। বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন—

তাঁহার অনুশীলনধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মেরই নামান্তর মাত্র।···সেকালে মার্কিণ চিন্তানায়ক থিয়োডোর পার্কারের প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের উপর পড়িয়াছিল। পার্কার ও নিউম্যান তখনকার নবীন ব্রাহ্মদের শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। পার্কারের চতুরঙ্গ ভক্তি বা fourfold piety এই অনুশীলন ধর্ম্মেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও এই আদর্শের প্রেরণাতেই তাঁহার 'ধর্ম্মতত্ত্ব' রচনা করেন।[২৬]

উক্তিটি কিছুটা তর্কসাপেক্ষ। ব্রাহ্মদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার সমধর্মিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু বঙ্কিমের দৃষ্টিভঙ্গিকে তদানীন্তন ব্রাহ্মরা আদৌ সুনজরে দেখতেন না। বস্তুত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থের ক্রোড়পত্রে তিনি কোঁৎ-এর যে উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেই যে তাঁর ঐ তত্ত্ব মূলতঃ উৎপন্ন সেকথা সহজেই অনুমেয়। তাঁর ঐ তত্ত্বে স্পেন্সার ও মিলেরও প্রভাব ছিল। এছাড়া সমসাময়িককালে প্রকাশিত দুটি বই তাঁকে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে করা হয়। দুটিরই লেখক সার জন রবার্ট সীলী (১৮৩৪-১৮৯৫)। তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্র একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাকারী হিসাবে প্রশংসা করেছেন। সীলীর চিন্তার প্রাসঙ্গিক যে-অংশ বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করা হয় তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ—

১. এযুগে এমন কতকগুলি নতুন উপাদানকে স্বীকার করতে হবে যা হয়তো প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে নেই। ২. এ যুগে যে নতুন মূল্যবোধ ধর্মের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে সংস্কৃতি বা culture। ৩. কালচার হচ্ছে কলা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত। ৪. সংস্কৃতিই ধর্মের স্থান নিচ্ছে। ৫. ধর্মের সার নীতি, একথা না বলে বরং বলা উচিত ধর্মের সার হচ্ছে সংস্কৃতি।[২৭]

বঙ্কিমচন্দ্র যুগোপযোগী নতুন সমাজ চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন—যার উপাদান হিন্দুধর্মে নেই। সমসাময়িক যুগসমস্যা অনুভব করে তিনিও কালচারের প্রতি ঝুঁকেছিলেন, তবে একটু অন্যভাবে, অর্থাৎ নিছক কলাকল্পনার পরিবর্তে বৃত্তির সুসমঞ্জস অনুশীলনকল্পে সমাজের উপযোগী ব্যক্তির স্বভাবধর্মকে কর্ষিত ও বিকশিত করে তুলতে। সীলী যেমন খ্রীষ্টকে নতুন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যার প্রয়াসী হন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অপেক্ষা

তাঁর মানবচরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব মানবতন্ত্রী এবং অলৌকিকতাবর্জিত যুক্তিবহুল বলে মনে করা হয়।

নিষ্কাম ভক্তিকে তিনি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেছেন। প্রহ্লাদ তাঁর কাছে প্রেমের প্রতীক। প্রেম নিষ্কাম হলেও ভক্তির পরিপূর্তি নয়। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মকে তিনি গ্রহণ করেন নি। 'আনন্দমঠ'-এ বলেছেন—"চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন, তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।" বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদকে তাঁর অনুশীলনতত্ত্ব থেকে পৃথকরূপে দর্শিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে একসময় নাস্তিক বলে মনে করতেন।[২৮] পরে তাঁর মতিগতি বদলায়। তাঁর ধর্মতত্ত্বের মূলে ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর স্বীকৃত। তাঁর কথায়—"ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একত্বই মুক্তি। জীবাত্মার পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ঐ ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তি লাভ হয়।" রামমোহনের মতো তিনিও ব্রহ্মকে সগুণ কিন্তু নিরাকার জ্ঞান করতেন। কারণ সাকার তাঁর মতে সর্বব্যাপী হতে পারে না। ধর্মের শীর্ষে উপনীত হতে হলে তাঁর মতে কতকগুলি স্থূল সোপান অতিক্রম করে সূক্ষ্ম স্তরে যেতে হয়। ধর্মের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা, দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা, তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা (বা বৈষ্ণবধর্ম) অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।

রাষ্ট্রদর্শন

কেশবচন্দ্রের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও রাজনীতিকে ধর্মের একটি অঙ্গরূপে দেখেছেন। তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। রামমোহনের আদর্শে তিনিও পশ্চিমী জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন চিন্তাধারার সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন। কোনোটিই তিনি অন্ধভাবে গ্রহণের পরিবর্তে যুক্তিবিচারপূর্বক উভয়ের নিষ্কর্ষই তিনি গ্রহণ করেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে তিনি দৃষ্টবাদ ও হিতবাদের আলোকে পরিমার্জনার প্রয়াসী হন। তবে ঐ দুটি মতবাদের পাশ্চাত্ত্য প্রত্যয়কে তিনি বহুলাংশে বর্জন করেন। বেনথাম মনে করতেন মানুষ মূলত আত্মকেন্দ্রিক। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মানবিক হৃদয়বত্তা ও সৌন্দর্যপ্রিয়তার কথা বলেছেন। মিলের সামাজিক নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একসময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। মিলের

আদর্শেই তিনি স্ত্রীজাতিকে সমানাধিকার দানের সমর্থক হয়েছিলেন। অবশ্য মিলকে তিনি পরে সমালোচনা করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও পরিচালনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক বা চুক্তিগত উৎপত্তি বিষয়ক প্রত্যয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। সমকালীন ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের "ইচ্ছা"গত প্রত্যয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যাও তিনি গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে—"শারীরিক বলই অদ্যাপি পৃথিবী শাসন করিতেছে"। বাহুবল পশুবলেরই সামিল। মানুষকে সেই বলেরই আশ্রয় নিতে হয়; কারণ তাঁর মতে মানুষ অংশত এখনও পশুর পর্যায়ে রয়েছে। জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য, বিবেক বাহুবলেরই অধীনে আবদ্ধ। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কথাটা আরও তাৎপর্যপূর্ণ।

বাহুবল কথাটি তিনি ব্যক্তিবিশেষের শারীরিক শক্তির অর্থে বলেন নি। সংঘবদ্ধ, বলদর্পী জাতির শক্তিমত্তার দিক থেকে তিনি কথাটি ব্যবহার করেছেন। বাহুবল সভ্যতা ও প্রগতির পরিপন্থী; অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীলদের রুখতে হলে বাহুবলের আবশ্যকতাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। বাহুবল জনমতের (অর্থাৎ বাক্যবল) কাছে নগণ্য। কারণ রক্তঝরা পথে বাহুবলের আধিপত্য বিরাজ করে—জনমতের সমর্থন ব্যতিরেকেই বাহুবল অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তু অর্জন করে থাকে। বস্তুত জনমতেই মানুষের পরার্থচিন্তার উন্মেষ ঘটে। সামাজিক উৎপীড়নের অবসান একমাত্র জনমতের দ্বারাই সম্ভব। অবশ্য জনমতের পশ্চাতে অনেক সময় বাহুবলের প্রয়োজন হয়। বাহুবলের প্রয়োজনকে বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্নার্থে সমর্থন জানিয়ে শারীরিক বৃত্তির বিকাশ কামনা করেছেন; চেয়েছেন মানুষের সবল স্বাস্থ্য। অহিংসাবাদকে যে তিনি সর্বার্থে গ্রহণ বা বর্জন করেন নি সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমের উদ্‌গাতা মেকিয়াভেলির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করা হয়।[২৯] মেকিয়াভেলির মতো বঙ্কিমচন্দ্রও স্বদেশপ্রেমকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে উভয়ের মধ্যে মৌল প্রভেদ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাষ্ট্রদর্শনকে নীতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেকিয়াভেলির রাষ্ট্রতত্ত্বে নীতিকথার স্থান গৌণ; সেখানে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে নীতিকথা শৃংখলিত। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি ও নীতিতত্ত্ব সম্পৃক্ত। পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসাকে তিনি সারা মানবসমাজে সম্প্রসারিত করতে চেয়েছেন। সারা মানবজাতির মঙ্গল কামনায় তাঁর দেশভক্তি ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তাঁর কথায়—"সমাজ ধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস ও সমস্ত মনুষ্যের সকল প্রকার মঙ্গল ধ্বংস। যদি তাহাই হইল, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা

করিতে হয়।" স্বার্থ ও পরার্থের সামঞ্জস্যে তিনি স্বদেশপ্রেমকে বিচার করেছেন এই বলে—

> সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই ধর্ম্ম নাই··· আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া—এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত···পরসমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া আমরা সমাজের ইষ্টসাধন করিব না, এবং আমরা সমাজের অনিষ্টসাধন করিয়া কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য।[১০]

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিমানুষের অধিকার অপেক্ষা তার সামাজিক দায়দায়িত্ব অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। সেজন্যে তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র ও তার বিধি-ব্যবস্থার তাত্ত্বিক নির্দেশ বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁর চিন্তায় রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজেরই প্রাধান্য ছিল বেশি; উত্তরকালে তা রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ প্রভাবিত করে। উভয়েরই মতে জনচিত্ত ও জীবনের ধারক ও বাহক হল সমাজ; রাষ্ট্রের স্থান সেখানে গৌণ। সমাজের নিরাপত্তা ও যূথবদ্ধ সমাজজীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার তাগিদেই রাষ্ট্রের আবশ্যকতা। বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্র ও সরকারকে একার্থে দেখতেন। তিনি মনুষ্যজীবন ও সমাজজীবনের অনুক্রম সম্পর্কে কিছু না বললেও, স্পেন্সারের চিন্তায় তিনি প্রভাবিত বলে মনে করা হয়—অর্থাৎ কালের প্রবাহে সমাজের উৎপত্তি ঘটেছে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। জনকল্যাণে রাষ্ট্রের ভূমিকায় তাঁর তেমন আস্থা ছিল না। সমাজোন্নয়ন ও সংস্কারের জন্যে আইনানুগ বিধিব্যবস্থার চেয়ে মানুষের সমাজ-চেতনায় তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে লোকে আইনভঙ্গ ও অনুচিত কাজ করলে একদিন সমাজের কাছেই জবাবদিহি করতে হয়। সমাজকে তিনি রাষ্ট্র থেকে পৃথকরূপে দেখতেন।

তাঁর চিন্তায় কল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রকৃত বনিয়াদ হল মানুষের শুভ প্রবণতা; সেজন্যে তিনি লোকের শুভ বোধ ও আচরণ, নীতিপরায়ণতা ও চেতনার উন্মেষ চাইতেন। গোঁজামিলের পথ বেয়ে রাষ্ট্রাধিকার করায়ত্ত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। সমকালীন ইংরেজি কেতাদুরস্ত ব্যক্তিদের বিদেশী রীতিনীতি, ভাব ও ভাষায় আন্দোলন সৃষ্টির কোনো মূল্য দিতেন না। নগরকেন্দ্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ অধিবাসীরা উপেক্ষিত হয়ে থাকে। তিনি আরও অনুভব করেন যে ভুঁইফোড় নেতাদের মধ্যে ত্যাগ ও সংকল্প বলে কিছু নেই। কমলাকান্তর মুখ দিয়ে তিনি তাই বলিয়েছেন—"আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না

সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স লিখিতে বলেন?" রাষ্ট্রনীতিকদের বাকসর্বস্বতায় তাঁর কোনো রুচি ছিল না ; রাষ্ট্রনীতিকেরা ইংরেজদের যে-কোনো একটা কারণে কিছু সমালোচনা করলেই নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক সিদ্ধিলাভ হয়েছে বলে মনে করেন। সরকারকে অহেতুক নিন্দা করাতেও তাঁর স্পৃহা ছিল না। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর অরুচির প্রধান কারণ হিসাবে মনে করা হয় যে তিনি ভিন্নপথে জাতির নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিন্তাহীন আবেগের পরিবর্তে তাঁর তত্ত্বগত একটা সুস্পষ্ট আদর্শ ছিল।

ধর্মকর্মের সুবিধার্থে ও প্রয়োজনেই সমাজের আবশ্যকতা ঘটে বলে তিনি মনে করতেন ; সমাজবদ্ধ না হলে মানুষের জৈব অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু থাকে না। জ্ঞানার্জন-বৃত্তির বিকাশ সাধিত হয় না, ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতাও জন্মায় না এবং ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা ব্যাহত হয়। তাই ধর্ম রক্ষার্থে সমাজের প্রয়োজন। সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন ছিলেন।

সমাজের উৎপত্তির পূর্বে প্রাকৃতিক সম্পদে সকলেরই অধিকার সমান ছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোগ্যবস্তুতে মানুষের লোভ থাকত না। সঞ্চয়েরও কোনো প্রয়োজন তখন ছিল না। কাজেই ধনবৈষম্যের কোনো প্রশ্ন উঠত না। প্রাক-সমাজজীবনে মানুষ বর্বর ছিল বলে হব্‌স অভিমত প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেকথায় বিশেষ আপত্তি না করলেও প্রাক-সমাজজীবন দ্বন্দ্ববিধুর ছিল বলে তিনি স্বীকার করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র রুশোর অনুরাগী ছিলেন। রুশোর প্রাক-সামাজিক স্বর্ণজীবনের প্রত্যয় তাঁকে প্রভাবিত করে। তবে সংগ্রহ ও সঞ্চয় প্রবৃত্তি যে মানুষের আদিম জীবনেও ছিল সেকথা তাঁর মনে উদিত হয় নি।

সমাজ মানুষের স্বাধিকার হরণ করে বলে তিনি মনে করতেন। যূথবদ্ধ সমাজের নিগড়ে মানুষ তার অনেক স্বাতন্ত্র্যই হারায় ; অবদমিত হয় তার ইচ্ছা, সমাজের পক্ষে সুবিধাজনক ও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা হয়তো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। সমাজব্যবস্থার সুফল ও কুফল সম্পর্কে সচেতন থেকে সমাজের কাছে মানুষকে তিনি অনুগত থাকতে উপদেশ দেন—

> সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ ও রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে।[৩১]

সমাজকে বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রের উপরে স্থান ও প্রাধান্য দিলেও রাষ্ট্র বা

সরকারের গুরুত্ব অস্বীকার করেন নি। জনজীবনের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে সরকারের প্রয়োজন। রাজা অর্থাৎ শাসক সবাই হতে পারে না। সেজন্যে একজনকে শাসনকর্তা হতে হয়। সমাজকে তিনি পরিবারের মাপকাঠিতে বিচার করতেন। পরিবারে যেমন একজন গৃহকর্তা থাকেন, সমাজেরও তেমনি কর্তা হলেন রাজা। পিতার পরিবার পালনের মতো রাজা রাজ্যপালন করেন। সেজন্যে পিতার সমতুল রাজাও শ্রদ্ধার পাত্র। রাজা বলতে তিনি রাজশক্তি মনে করতেন; এবং তৎ প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্যেরও পার্থক্য অনুভব করতেন; অনেকটা যেমন গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও পার্লামেন্টের প্রতি নীতি স্বীকার করতে হয়। সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তির প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য না থাকলে সে-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে—কারণ রাষ্ট্র-শক্তির উৎস হল নাগরিকেরাই—

> গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের কর্ত্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায় রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান—নইলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না।[৩২]

বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রতত্ত্বে রাজা কোনো ব্যক্তিবিশেষ নয়, রাজশক্তির প্রতিভূ। রাজশক্তি যদি প্রজাপীড়ক হয় তাহলে তা আর ভক্তির পাত্ররূপে বিবেচিত হবে না। স্বেচ্ছাচারী রাজাকে ভক্তির পরিবর্তে সুশাসনে বাধ্য করাই জনগণের উচিত কাজ বলে তিনি 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তার প্রণালী সম্পর্কে নিশ্চুপ থেকে গিয়েছেন; অবশ্য 'আনন্দমঠ'-এ ভবানন্দর মুখ দিয়ে বিদ্রোহের কথা বলেছেন; কিন্তু সে-বিদ্রোহের রূপ কি তা তিনি সবিস্তারে বলেন নি। প্রজার পালন ও রাজার প্রতি আনুগত্য—এই দুইয়ে মিলে সার্বভৌম শক্তি গঠিত হয়। প্রজাপালনে বিরত হলে তাদের আনুগত্যে রাজার কোনো অধিকার থাকে না। তবে কারও দ্বারা এবং কি পদ্ধতিতে ভালমন্দের যাচাই হবে সে প্রসঙ্গে তিনি যান নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতার প্রত্যয়ও ছিল স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা বলতে তিনি নিছক রাজনৈতিক আত্মতৃপ্তি বা অর্থনৈতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মনে করতেন না; ঐ দুটি বিষয়ের পরিপূর্তি হলেই মানুষের অন্য সবকিছু উৎকর্ষ সাধিত হবে সেকথা ঠিক নয়। তাই তিনি বলেন—"স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি, 'লিবার্টি' শব্দের অনুবাদ,...ইহার এমন তাৎপর্য্য নয় যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে।" রাজা বা রাষ্ট্রশাসনকে তিনি শান্তিশৃঙ্খলা বজায়

রাখার জন্যেই চাইতেন। সেটা যেন অনেকটা বাইরের ব্যাপার। ভিতরের বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র—অর্থাৎ সেটা সামাজিক, রাষ্ট্রিক নয়। প্রকৃত সামাজিক শাসনেই পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তার বিকাশ সম্ভব। রাষ্ট্রিক শাসনকর্তার জাতবিচার তাঁর কাছে গৌণ।

ব্যক্তিস্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। পরিণত বয়সে মিলকে তিনি পরিহার করলেও মিলের "স্বাধীনতা" প্রত্যয়কে তিনি বর্জন করেন নি। এ বিষয়ে স্পেন্সারও তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি মনে করতেন যে ভালমন্দ বিচারের শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত সার্বভৌম শক্তি যদি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ প্রণোদিত সমাজবিরোধী ও অকল্যাণকর কাজে বাধা দেয়, তবে তাতে অন্যায় কিছু নেই। নতুবা নিজের হিতাহিত নির্ধারণে মানুষের স্বাধিকার হরণ ও রাষ্ট্রশক্তির হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। তাবলে রাষ্ট্রীয় অবদমনের প্রয়োজনকে তিনি সর্বক্ষেত্রে বর্জন করেন নি।

সাম্যচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের আগেও এদেশে অনেকের লেখায় সাম্যচিন্তার অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের রচনাদিতে বেনথাম ও মঁতেসকিউর সাম্যচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল। ডিরোজিও-র ছাত্রদের মধ্যে রুশোর প্রভাব পড়ে। তাঁদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী কৃষকদের দুর্গতি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেন। পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখার্জী, শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জন চাষীর দুরবস্থা, ক্ষেতমজুর ও গ্রামবাসীদের দুঃসহ জীবনের কথা লিখেছেন। শ্রমিকদের স্বার্থে অনুরূপ ভাবনা দেখা যায় রাধানাথ শিকদার, শশিপদ ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখের রচনাদিতে। কৃষকদের করুণ জীবনের সার্থক চিত্র তুলে ধরেন লালবিহারী দে ও রমেশচন্দ্র দত্ত। নারী সমাজের প্রতি অবিচার ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের বিরুদ্ধে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত অনেক মনীষীর চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের কথা সুবিদিত।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধ এবং 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধের কিছু অংশ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' ১৮৭৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে সাম্যের চিন্তা ত্যাগ করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "সাম্যটা সব ভুল, আর ছাপাব না।" তবে 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন। কৃষকের কথা আধুনিক অর্থে সামাজিক বৈষম্যের বিষয় হিসাবে লিখিত হয় নি। প্রাচীন বর্ণ-

বৈষম্যের পরিণাম হিসাবে তিনি প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন সাম্যনীতিকে ইউরোপীয়রা যেভাবে বিচার করেন, তিনি তা করেন নি। তিনি যা বুঝেছিলেন, তাই লিখেছেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের সাধারণ পাঠককে বোঝানো ও তাদের মনে সাম্যনীতির বোধ সঞ্চার করা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' সুসংবদ্ধ মৌলিক কোনো তত্ত্বালোচনা নয়।

পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদার্শনিকেরা সাম্যকে নাগরিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই শুধু বিচার করেছেন; আর এক দল করেছেন অর্থনৈতিক দিক থেকে। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র মূলত সামাজিক দৃষ্টিকোণেই সাম্যের আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে নাগরিক ও রাজনৈতিক সাম্য ইংরেজদের আনুকূল্যে এদেশে অল্পবিস্তার প্রবর্তিত হয়ে থাকলেও সাধারণ মানুষ সেগুলির উপকার থেকে বঞ্চিত; কারণ এদেশের সমাজেই সাম্য প্রতিষ্ঠা পায় নি। মানুষে মানুষে কৃত্রিম বৈষম্য থাকলে আইনানুগ সাম্য নিষ্ফল হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আর অর্থনৈতিক সাম্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন সামাজিক সাম্যের তাগিদেই। বৈষয়িক উন্নতি অবশ্যই চাই; গ্রাসাচ্ছাদনের নিরাপত্তা না থাকলে সমস্ত নীতিবাক্যই নিঃসার বলে প্রতিপন্ন হয়।

অসাম্যকে বহুদিক থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক ও বর্ণ বৈষম্যমূলক। প্রাকৃতিক সাম্যে তিনি বিশ্বাস করতেন না; প্রকৃতি মানুষকে অসমরূপেই সৃজন করে; কেউ সুন্দর, কেউ কুৎসিত, কেউ রোগা আবার কেউ বা মোটা। তবে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য কিংবা বাঙালি ইংরেজের অসাম্য প্রকৃতিগত নয়।

দেশের যতকিছু দুর্গতির মূলে তিনি কৃত্রিম অসাম্যকেই দায়ী করেন। অন্যান্য দেশে অসাম্য দূর করার জন্যে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে বৈপ্লবিক পথ অনুসৃত হয়েছে। প্রাচীন রোমে 'পেট্রিষীয়' ও 'প্লবীয়'দিগের লোকেরা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সাম্যের প্রতিষ্ঠা করে। পক্ষান্তরে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বৈপ্লবিক নীতি অবলম্বিত হয়েছিল। মহান চিন্তানায়কেরা প্রথমটিকেই শ্রেয় বলে মনে করেছেন।

সাম্যপ্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসে তিনজনকে পথপ্রদর্শক বলে মনে করতেন, যথা বুদ্ধ, যিশু ও রুশো। বুদ্ধদেব শূদ্রদের ব্রাহ্মণদের স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন; ফলে সেইসময়ে ভারতীয় সভ্যতার গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। যিশু খ্রীষ্ট ক্রীতদাসদের শৃঙ্খলমোচনে সচেষ্ট হয়েছিলেন; পশ্চিমের প্রগতিকে যিশুই বেগবান করে তোলেন। ভলতেরের ন্যায় বঙ্কিমচন্দ্র রুশোর অর্থনৈতিক সাম্যকে অপছন্দ করতেন। তবে ফরাসি বিপ্লবের পশ্চাতে রুশোর চিন্তাই গতিবেগ সঞ্চার করে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। ফরাসি

বিপ্লব পশ্চিমী সভ্যতার মোড় ফিরিয়ে দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে রুশোর সমাজ-সাম্যের চিন্তাই তাঁর প্রধান প্রেরণা ছিল। রুশোকেই তিনি সাম্য ও সমাজবাদের জনক বলে অভিহিত করেন। উত্তরকালে ইউরোপের সমাজতন্ত্রী চিন্তানায়কেরা রুশোর দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় সমকালীন সাম্যবাদী চিন্তার সম্যক পরিচয় ও "ইণ্টার-ন্যাশন্যাল"-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মার্কসীয় চিন্তা ও আদর্শ জানার সুযোগ হয়তো তিনি পান নি; কারণ মার্কসের রচনা তখন ইংরেজিতে সহজ লভ্য ছিল না। "ইণ্টারন্যাশন্যাল" বলতে তিনি মার্কস-প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার (১৮৬৪-৭৪) কথাই হয়তো বলতে চেয়েছেন।

বুদ্ধ ও যিশুর পরে রুশোকে তৃতীয় সাম্যাবতার বলে অভিহিত করলেও বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন যে রুশো প্রথম দুজনের "সমকক্ষ ব্যক্তি নহেন"। তাঁর মতে রুশো "অবিমিশ্র বিমল সত্য" প্রচার করেন নি। রুশো "মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের" সঙ্গে অনিষ্টকর "মিথ্যা মিশাইয়া" সেই মিশ্রিত পদার্থকে বাকচাতুর্য ও বিমোহিনী শক্তির সাহায্যে ফরাসিদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন। রুশোর "সৎকথানুসারিণী ভ্রান্তিও" ফরাসিদের জীবনে "বীজমন্ত্র" বলে গৃহীত হয়। তারই গুণে ফরাসি বিপ্লব ঘটে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন; মন্তব্যের বিস্তারিত বিশ্লেষণে যান নি।

রুশোর সাম্যচিন্তার মূলকথা "প্রাকৃতিক নিয়ম" প্রত্যয়টির সমর্থনসূচক বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে সভ্যতার আগে প্রাকৃতিক অবস্থায় সব মানুষই ছিল সমান। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে বৈষম্য দেখা দেয়, তাই রুশোর মতে সভ্যতা হল মানুষের অমঙ্গলের কারণ। তাঁর কথায় নৈসর্গিক বৈষম্য ঘটে "সভ্যতার্জিত ভোগাসক্তি পাপানুরক্তি এবং সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচারের" দোষে। অসভ্যাবস্থায় সবাইকার শারীরিক পরিশ্রমের ফলে সবলের শরীর সমান পুষ্টিলাভ করে, দেহমন হয় নীরোগ। সেই স্বর্গীয় সুখের তুলনায় সভ্য জীবন পাপ ও দুঃখে ভরা। প্রাক-সভ্য পৃথিবীর ভূমিতে রাজা ও ভিক্ষুকের অধিকার ছিল সমান। বলবান যখন দুর্বলকে অধিকারচ্যুত করতে শুরু করে তখন "সেই অপহরণের স্থায়িত্ববিধানের নাম আইন"। রুশোর অনুগামী প্রুধোঁ-র মন্তব্য উদ্ধৃত করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে উক্ত অপহরণের নাম "সম্পত্তি"। পরিশেষে রুশোর এইসকল কথা "অতি ভয়ানক" বলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তারই সমর্থনে ভলতেরের উক্তি—"এ সকল বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র"—সে কথাও বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেন।

তবে রুশো যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে তাঁর অভিমতের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে সভ্যতার দোষ দেখাতে বিরত হন এবং সম্পত্তির প্রথমাধিকারীকে মালিকানা

দিতে সম্মত হন সেকথা রুশোর *Le Contrat Social* গ্রন্থে স্বীকৃত বলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বস্তি প্রকাশ করেন। অনধিকৃত জমির প্রথম অধিকারী যদি ভরণপোষণের উপযোগী জমির বেশি অধিকার না নেয় বা বেনামেও কর্ষণ করে ভোগদখল করে তাহলে জমি তারই হওয়া উচিত।

রুশোর চুক্তিতত্ত্ব প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, নিয়মাবলী তৈরী করে যেমন কোম্পানি গঠিত হয়, তেমনি সমাজ, রাজ্যশাসন ইত্যাদির পিছনে থাকে এক সামাজিক চুক্তি। রাজা চুক্তি অনুযায়ী প্রজার মঙ্গলবিধানে ব্যর্থ হলে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। তাই তাঁর মতে ফ্রান্সে ষোড়শ লুই-এর সিংহাসনচ্যুতি ও প্রাণদণ্ডের মূলে ছিল রুশোর উল্লিখিত গ্রন্থের মর্মবাণী। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে ফরাসি বিপ্লবের ফলে ইউরোপের যাবতীয় জীবনধারা শোণিতস্রোতে ধুয়েমুছে যাবার পরে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি ও "মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ" হল। রুশোর "ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি" স্থাপিত হল; কারণ "সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই ভ্রান্তির কায়া অর্দ্ধেক সত্যে নির্ম্মিত"। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই মন্তব্যের কোনো ব্যাখ্যা করেন নি।

চুক্তিতত্ত্বের অন্যান্য প্রসঙ্গ, যেমন সমষ্টিগত সাধারণ ইচ্ছার (General Will) অধীনে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গতি, সমাজে একের প্রতি অপরের নৈতিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত মালিকানার বৈধতা ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভঙ্গির পরিচয় 'সাম্য' গ্রন্থে বিশেষ পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "ভূমি সাধারণের" বলে যে মহাবৃক্ষের বীজ রুশো বপন করেন তার নিত্য নতুন ফল ফলতে থাকে. "কম্যুনিজম ও ইণ্টারন্যাশন্যাল সেই বৃক্ষের ফল।" উক্ত ফলাফল প্রসঙ্গে তিনি ইউরোপে সাম্য তথা সমাজতন্ত্রী আদর্শের সমকালীন বিভিন্ন পথিকৃৎ বিশেষ করে রুশোর কোনো কোনো অনুগামীর মতাদর্শের কথা উল্লেখ করেন। বস্তুতে তাঁদের চিন্তা সম্পর্কে অবহিত থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ উদারতন্ত্রী আদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল-এর সাম্যচিন্তার গুণগ্রাহী ছিলেন। মিল-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, উপার্জনকর্তা উপার্জিত সম্পত্তি জীবনান্তে যাকে ইচ্ছে উত্তরাধিকারী করে যেতে পারেন। কর্তা যদি বলে না যান সেখানে পুত্র অধিকারী হবে না, সাধারণভাবে 'সমাজই অধিকারী হবে। পুত্রের অবর্তমানে জ্ঞাতি প্রভৃতির অধিকার থাকার কারণ নেই। যার সন্তান আছে তার ত্যক্ত সম্পত্তি থেকে সন্তানের আবশ্যকীয় অংশ রেখে বাকি সবটা সাধারণের হওয়া উচিত। স্ত্রী-পুরুষের সাম্যের সম্পর্কে শিক্ষায়, রাজকার্যে ও বিবিধ ব্যবসায়ে নারীর সমানাধিকার থাকা উচিত বলে তিনি মিল-এর চিন্তাকে গ্রহণ করেন।

ভারতে কৃষকদের দুর্দশা তথা সামাজিক অসাম্যের কারণ দেখাতে গিয়ে

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে ভারতের প্রজা "চিরকাল উন্নতিবিহীন" এবং জ্ঞানের অভাবই তার প্রধান কারণ। জ্ঞানার্জনের জন্যে চাই প্রচুর সময় ও অবকাশ এবং বিদ্যানুশীলনে ব্রত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিপালনের জন্যে প্রয়োজন উৎপাদন থেকে উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে সামাজিক ধনসঞ্চয়, "তখন জ্ঞানের সম্ভব" হবে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর "আদিম ধনসঞ্চয়" প্রত্যয়টি স্পষ্টতই অ্যাডাম স্মিথের চিন্তায় গঠিত হয়েছিল। ধনসঞ্চয় সভ্যতার আদিম কারণ। ধনসঞ্চয় থেকে শ্রমবিন্যাস ও সামাজিক অসাম্য দেখা দেয়। জ্ঞানান্বেষী বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতই প্রাধান্য পায়। শ্রমজীবীরা তাদের বশবর্তী হয়ে শ্রম করে। তাঁর মতে এই অসাম্য হল "প্রাকৃতিক, ইহার উচ্ছেদ সম্ভবে না। এবং উচ্ছেদ মঙ্গলকরও নহে।" বুদ্ধিজীবীর জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা শ্রমজীবী উপকৃত হয়। উৎপাদনের প্রথম ভাগ অর্থাৎ মজুরির দরুন বেতন পায় শ্রমজীবী, আর মুনাফা নামে দ্বিতীয় ভাগটির অধিকারী হয় বুদ্ধিজীবী। শ্রমজীবী সংখ্যায় যতই গরিষ্ঠ হোক না কেন মুনাফার কোনো অংশ তারা পায় না। অসাম্যের বৃদ্ধি ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ করেন যে শ্রমজীবীর সংখ্যা বেতনবৃদ্ধিকে ব্যাহত করে, অবশ্য লোকসংখ্যার অনুপাতে ধনবৃদ্ধি হলে কষ্টের লাঘব হয়। তাঁর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধিও অসাম্যের অন্যতম কারণ। এখানে তাঁর চিন্তায় ম্যালথাসের প্রভাব স্পষ্টই চোখে পড়ে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় হল দেশান্তরে গমন ও বসতিস্থাপন। দ্বিতীয় উপায় হিসেবে তিনি বিবাহ প্রবৃত্তি দমনের প্রস্তাব করেন। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিবারণের প্রচেষ্টা না থাকায় মানুষের দুর্গতি সভ্যতার সূচনাপর্বেই শুরু হয়। ধনের তারতম্য থেকে অধিকারের তারতম্য, অধিক প্রভুত্বের ফল অধিক অত্যাচার। এই প্রভুত্বই শূদ্রপীড়ক স্মৃতিশাস্ত্রের মূল বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন। অস্বাভাবিক এই বৈষম্য বা অসাম্য অমঙ্গলের উৎস। অসাম্যের তিনটি কার্যকারণ প্রক্রিয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন—

১. (ক) শ্রমের বেতনের অল্পতা ; নামান্তর দারিদ্র্য, এটা বৈষম্যবর্ধক।
(খ) পরিশ্রমের আধিক্যে অবকাশের অবলোপ, অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব। ফল মূর্খতা, এটাও বৈষম্যবর্ধক।
(গ) বুদ্ধিজীবীদের আধিপত্য। নামান্তর দাসত্ব। এটা বৈষম্যের পরাকাষ্ঠা। মোট ফল : দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব।

২. প্রকৃতির আনুকূল্যে তুষ্টচিত্ত ভারতীয়রা কায়িক সুখে পরাঙ্মুখ। আলস্য, শ্রমে অনীহা ও উদ্যমহীনতা তাদের প্রবল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে ঐহিক সুখে মানুষ ছিল নিস্পৃহ। তাই সামাজিক অসাম্য ধারাবাহিক।

৩. (ক) উৎপাদনের অনগ্রসরতার ফলে বাণিজ্যের হানি। (খ) ভারতে বৈষম্যপীড়িত নিম্নবর্ণের লোকেরা নিস্তেজ, নম্র, অনুৎসাহী ও অবিরোধী বলে রাজপুরুষেরাও দুর্বল। পারস্পরিক সংঘাত ও বিরোধে উভয় পক্ষের উন্নতি ঘটে। তা না হওয়ায় ভারত বারেবারে বিদেশীদের কাছে পদানত হয়েছে। (গ) যে জালে ব্রাহ্মণেরা অপর তিন বর্ণকে জড়ায়, ক্রমে সেই জালে নিজেরাও জড়িয়ে পড়ে সারা সমাজের অবনতি ঘটায়। শ্রমজীবীদের চিরস্থায়ী দুরবস্থা সারা সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক।

'সাম্য' গ্রন্থের শেষ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতে নারী সম্প্রদায়ের প্রতি সর্ববিধ বৈষম্যের আচরণ ও অসাম্যের কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষে মানুষে অধিকার সমান। নারীও মানুষ, অতএব "পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী", কিন্তু "সামাজিক নিয়মের দোষে" স্ত্রীপুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায়—উভয়ের প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্যে নয়। এবিষয়ে তিনি মিল-এর মতানুসারে বলেন যে "সামাজিক নিয়মের সংশোধনই সাম্যনীতির উদ্দেশ্য"। স্ত্রীপুরুষের চারটি বিষয়ে সামাজিক বৈষম্যের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—১. শিক্ষার সুযোগ ২. পুরুষদের মত বিধবাদের পুনর্বিবাহের স্বাধীনতা ৩. স্ত্রীলোকদের যথেচ্ছ পরিভ্রমণের অধিকার এবং ৪. পুরুষদের বহুবিবাহের অবসান।

এছাড়াও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে অসাম্য হিসাবে বিবেচিত হয়। উল্লেখ্য যে তিনি চাইতেন সর্বাত্মক সাম্য। খণ্ডিত ও আংশিক সাম্যে তাঁর সায় ছিল না। নারীর সমানাধিকার প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি সাধারণভাবে প্রযোজ্য—

যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ব্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না। সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতি সকল পরস্পরে দৃঢ়সূত্রে গ্রথিত…।

সাম্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তবে সাম্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার নিরসনকল্পে পূর্বেই তিনি তাঁর 'সাম্য' নিবন্ধের উপসংহারে লিখেছিলেন—

আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই, বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের মুক্তির পথ মুক্ত চাহি।[৩৩]

স মা জ ত ত্ত্ব

বঙ্কিমচন্দ্র হেনরি টমাস বাক্‌ল্‌-এর (১৮২১-৬২) চিন্তায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাক্‌ল্‌ মনে করতেন যে জলবায়ু, জমির উর্বরতা ও খাদ্যাভাস মানুষের চরিত্র গঠনের সহায়ক। ঐগুলি পর্যাপ্ত ও অনুকূল না হওয়ায় মানুষের সঞ্চয়প্রবৃত্তি ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। মননশীল ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী শুধু জ্ঞানার্জনে রত থাকে যাদের হাতে থাকে প্রচুর অবসর ; সেটা ব্যাপকভাবে সম্ভব হয় যদি উৎপাদনের একটি অংশ ভোগের পরও উদ্বৃত্ত থাকে। মননশীল ঐ গোষ্ঠী তাদের ভোগাবস্তুর উৎপাদনে অংশ নেয় না। বিত্তের সঞ্চয়ই শুধু নয়, বণ্টন ব্যবস্থাতেও প্রকৃতির প্রভাব বিদ্যমান। সঞ্চয় থেকেই ক্রমে বিত্তবান ও বিত্তহীন সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। চাহিদা ও সরবরাহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক প্রক্রিয়ায় শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয়। জনসংখ্যা বেশি হলে মজুরি যায় কমে। পক্ষান্তরে যেসব দেশে জমির উর্বরতা ও জলবায়ু অনুকূল সেখানকার মানুষের জীবন ধারণের চাহিদা কম, কিন্তু জনসংখ্যা বেশি। ঠাণ্ডা দেশের চেয়ে গরম দেশে শ্রমিকদের মজুরি কম। বাক্‌ল্‌ তাঁর তত্ত্ব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ প্রসঙ্গে বলেছেন যে ভারতীয়রা অধিকাংশই চাউলভোজী, তাদের প্রজনন প্রবণতাও অধিক ; সেখানে শ্রমজীবীদের অবনত রাখার জন্যে বর্ণবৈষম্য প্রবর্তিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাক্‌লের এই তত্ত্বটিকে ভারতীয় পটভূমিকায় বিচার করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি মিল-এর মতকেও গ্রহণ করেছেন। মিল বলেছেন যে পুঁজি ও জনসংখ্যার অনুপাতে তারতম্য ঘটলে মজুরির হেরফের হয়। শ্রমজীবীর সংখ্যা হ্রাস না হলে মজুরির পরিমাণ বাড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া মনে করতেন। বসবাসের জন্যে দেশান্তরে চলে যাওয়া কিংবা বিবাহ নিয়ন্ত্রণ ছাড়া জনসংখ্যা হ্রাসের আর কোনো উপায় নেই। দুটি পন্থাই এদেশে অপরিজ্ঞাত। খাদ্যের বিশেষ অভাব না থাকায় লোকে বিবাহ সংকোচনে যত্ন নেয় নি ; কাজেই জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ওদিকে শ্রমের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় শ্রমজীবীদের জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। তাদের জীবনে অবসর না থাকায় মনন ও চিন্তনে তারা অনুন্নত। শিক্ষিত লোকেরা সেই সুযোগটা সম্পূর্ণই গ্রহণ করে থাকে।[৩৮]

বাক্‌লের ব্যাখ্যান ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র এদেশবাসীর তুষ্টচিত্ত জীবন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মানুষকে বিষয়বিমুখ করেছে ও কৃচ্ছ্রসাধনে ইন্ধন যুগিয়েছে। মধ্যযুগের ইউরোপেও চার্চতন্ত্র অনুরূপ পথ প্রদর্শন করত। রেনেসাঁসের ধাক্কায় সে-সংস্কার নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ভারতে শাস্ত্রীয় অনুশাসন মানুষকে জীবনবিমুখ করে তোলার ফলে সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। শূদ্রের অবদমনে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য,

ক্ষত্রিয় সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হতাশা, নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয়তার ফলে শূদ্র উৎপাদনকার্যে যত্নবান হয় নি; ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতি হয়েছে; বৈশ্য হয়েছে বিপন্ন, এবং ক্ষত্রিয়রা ভোগলিপ্সায় হীনবীর্য হয়ে পড়ে; অর্থনৈতিক দুর্বিপাক ও অশিক্ষার ফলে জনগণ শাসকদের দায়িত্বপালনে বাধ্য করতে পারে নি। রোম ও ইংল্যাণ্ডে জনশক্তি প্রবল থাকায় রাজশক্তি সংযত ছিল। ভারতে শূদ্রদের অবদমনে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের অবক্ষয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রের বজ্র-আঁটুনি আরও শক্ত করে তোলে; ফলে সমাজের লাভের পরিবর্তে অবনতি ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে গুপ্ত আমলের পর থেকেই ভারতে সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক বৈষম্য দেখা দেয় ও সাম্যের সমাধি রচিত হয়। মিলের প্রভাবে তিনি এদেশে নারীজাতির প্রতি অসাম্য আচরণের নিন্দা করেন। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি স্ত্রীজাতিকে সম্পত্তির সমানাধিকারে নীতিগতভাবে সমর্থন জানান। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে ভ্রমরের মুখ দিয়ে তিনি অবিবেচক স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর বিদ্রোহ করার অধিকারকে তুলে ধরেছেন।

আর্থনীতিক চিন্তা

অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রিক দায়িত্বের উপর রামমোহন ও অক্ষয়কুমার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন; কারণ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রেরই কর্তব্য বলে তাঁরা মনে করতেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রের এই সর্বগ্রাসী চিত্রকে ভাল চোখে দেখেন নি, তিনি মনে করতেন যে ব্যক্তির যা কিছু বিকাশ তা আধ্যাত্মিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক তাতে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ অবাঞ্ছনীয়; সমাজের যে কোনো উন্নয়ন বা সংস্কারকর্মে রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজের ভূমিকাই তাঁর কাছে অধিক কার্যকর বলে মনে হয়েছিল। আইনের সাহায্যে সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয় যদি মানুষের যথোচিত বোধ ও চেতনা না থাকে। সেজন্যে তিনি শিক্ষার উপরই সর্বাধিক গুরুত্বদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তায় মিলের প্রভাব দেখা যায়।

ব্যবসাবাণিজ্যে সরকারি অনুপ্রবেশকে তিনি সমর্থন করতেন না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল। রাষ্ট্রায়ত্ত অর্থনৈতিক উদ্যম বা ব্যবসাবাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণকে তিনি জনকল্যাণের পরিপন্থী বলে মনে করতেন। অর্থনৈতিক সংরক্ষণ (protection) সেইহিসাবে অহিতকারী। এখানে তাঁর জাতীয়তাবাদী চিন্তার বিচ্যুতি লক্ষণীয়।

রামমোহন কিন্তু আমদানি-শুল্কের প্রয়োজনকে দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও রাজস্ব বৃদ্ধির দিক থেকে সমর্থন করেছিলেন। বঙ্কিম অবাধ বাণিজ্য (free trade) নীতিকে সমর্থন করেন।

তিনি মনে করতেন যে যেহেতু ভারত একটি উষ্ণদেশ ও এখানকার ভূমি উর্বর, সেইহেতু ভারতীয় সভ্যতার গোড়া থেকেই লোকে অলস ও কায়িক শ্রমে বিমুখ; এবং জ্ঞানের আলোচনায় এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অধিক প্রবণতা দেখা যায়। উষ্ণতাজনিত শারীরিক শৈথিল্য, পরিশ্রমে নিস্পৃহতা ও ভিন্ন দেশে গমনেচ্ছার অভাবে দেশের ধনোৎপাদন যথোচিত বর্ধিত হয় নি; ফলে দেশে সামাজিক তারতম্য বিস্তার লাভ করেছে—শ্রমজীবীদের দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্ব ক্রমে স্থায়ী হয়ে দেশকে অবনতির দিকে নিয়ে গেছে। প্রতিকারস্বরূপ তিনি দেশান্তর গমন ও বিবাহপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে সংকোচনের উপদেশ দিয়েছেন।

রামমোহন থেকে দাদাভাই নৌরজী পর্যন্ত অনেকেই দেখিয়েছেন যে ইংরেজ শাসনের ফলে এদেশের ধনৈশ্বর্য বহুলাংশে ইংল্যান্ডে পরিবাহিত হয়ে থাকে যা 'Drain Theory' নামে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন—

> এ সকল তত্ত্ব যাঁহারা বুঝিতে যত্ন করিবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, কি আমদানিতে, কি রপ্তানিতে, বিদেশীয় বণিকেরা আমাদের টাকা লইয়া যাইতেছেন না, এবং তন্নিবন্ধন আমাদিগের দেশের টাকা কমিতেছে না। বরং বিদেশীয় বাণিজ্য কারণ আমাদিগের দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে। যাঁহারা মোটামুটি ভিন্ন বুঝিবেন না, তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন, বিদেশ হইতে কত অর্থ আসিয়া এ দেশে ব্যয় হইতেছে।[৩৫]

তিনি একথাও মনে করতেন—

> ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত তুলনা করিতে গেলে, বাঙ্গালা দেশ নির্ধন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা বাঙ্গালা যে এক্ষণে নির্ধন, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান কাল অপেক্ষা ইতিপূর্ব্বকালে যে বাঙ্গালা দেশে অধিক ধন ছিল, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং এক্ষণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা দেশের ধন বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।[৩৬]

তবে একথা তিনি বলেছেন যে ব্রিটিশ শাসনের ফলে দেশের যে আয় বেড়েছিল, তা মুষ্টিমেয় মানুষের ভোগেই চলে যায়। দেশের এই আয়-বৃদ্ধির উপকার থেকে বৃহত্তর জনসাধারণ বঞ্চিত হয়েছে।

কৃষকদের তৎকালীন দুরবস্থা বঙ্কিমচন্দ্র সবিস্তারে উদ্ঘাটিত করেন।

বাংলার কৃষকদের সমস্যা তাঁর চেষ্টাতে সরকারের গোচরীভূত হয়। সরকারি বিধিব্যবস্থা বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তিনি সমালোচনা করেছেন; কিন্তু একেবারে রদ করতে চাননি; শাসকদের উপর তাঁর বিশেষ অনাস্থা ছিল না; তিনি চাইতেন সরকার সদয় হয়ে কৃষকদের দুর্গতি দূর করুক। কর্নওয়ালিসের আমল থেকে ডালহৌসির শাসনকাল অবধি ভূমি সংস্কারে কর্তৃপক্ষ যেটুকু উদ্যোগী হয়েছে তা সদাই জমিদারদের স্বার্থানুকূলে এবং কৃষকদের স্বার্থের বিপরীতে গিয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অতিধনবানকে জমির মৌরসি স্বত্বের অধিকার দেওয়া ইংরেজদের এক মস্ত ভুল। বস্তুত যে-ব্যক্তি জমি চাষ করে এবং আবহমানকাল ধরে জমির স্বত্ব ভোগ করে আসছে তাকেই ঐ-বন্দোবস্তে জমির মালিকানা দেওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। এবিষয়ে রামমোহনের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতভেদ সুপরিস্ফুট; বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার যা কিছু দুর্গতির মূল। তবে এক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে রামমোহনের মতের মিল ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনকালে কৃষকদের মঙ্গলার্থে যে-সব বিধিব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নি তার মধ্যে রামমোহন অধিক খাজনা আদায় করা ও প্রজাদের উৎখাত করায় জমিদারদের অধিকার যাতে না থাকে সে-সম্পর্কে নীতিগতভাবে স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন।

জমির প্রত্যক্ষ মালিকানা ত্যাগ ও ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে তিনি সরকারকে তারিফ করেন। কিন্তু সম্পত্তির বণ্টনে তিনি সরকারি হস্তক্ষেপ চান নি। তিনি একথাও অনুভব করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারদের বিত্তের বহর বেড়ে গিয়েছে এবং সংখ্যাগুরু চাষীরা ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। বিত্তকে বঙ্কিমচন্দ্র গোবরের সঙ্গে তুলনা করেন; জমে গেলে তা থেকে পচা গন্ধ বেরোয় আর তা ছড়িয়ে দিলে জমির উর্বরতা বাড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেখা না দিলে বাংলার অধিবাসীরা তাদের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার সুযোগ পেত; তিনি মনে করতেন যে তৎকালীন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কতিপয় বাবুর গুঞ্জনধ্বনির পরিবর্তে সমুদ্রের কর্ণভেদী গর্জনের মতো প্রতিবাদের আওয়াজ উত্থিত হওয়া প্রয়োজন। জমিদারি প্রথার ভালমন্দ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

১. সকল জমিদার অত্যাচারী নহেন। ছোট জমিদার কিংবা জমিদারী ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারই অধিক।

২. নায়েব গোমস্তাদের উৎপীড়ন অনেক সময় জমিদারের অজ্ঞাতসারেই ঘটে।

৩. অনেক জমিদারের প্রজাও ভাল নয়; পীড়ন না করলে খাজনা দেয় না।[৩৭]

'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থটিতেই বঙ্কিমচন্দ্রের অর্থনীতিতত্ত্বের সুগভীর চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'অর্থশাস্ত্রঘটিত ভ্রান্তি' উপলব্ধি করে তিনি কিছুকাল তাঁর ঐ-গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দেন।

শাসন ও দণ্ডনীতি

ভারতের প্রশাসন ও বিচার বিষয়ক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে রামমোহন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে সাক্ষ্যদান করেছিলেন। এ বিষয়ে রামমোহনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রেরও জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ; দুজনেই সরকারি কর্মচারি ছিলেন এবং দুজনেই সমকালীন প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছেন। জুরিপ্রথা, হেবিয়াস কর্পাস আইন, বিচারকার্যে অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে রামমোহন যা সুপারিশ করেছিলেন তা কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপায়িত হয়। তবুও তার চার যুগ পরে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঐসব বিষয়ে পুনরায় নতুন করে সোচ্চার হতে হয়। বিচারালয় ও বেশ্যালয়কে তিনি সমপর্যায়ভুক্ত করেন—যেখানে টাকা না ফেললে প্রবেশাধিকার মেলে না।

দেশীয় বিচারকদের এজলাসে ইংরেজ নাগরিকদের বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনকল্পে উত্থাপিত ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে যখন এদেশে শ্বেতাঙ্গরা আন্দোলন করে সেইসময়ে বঙ্কিমচন্দ্র "Bransonism" নামে একটি প্রহসনে প্রচলিত ব্যবস্থার নিন্দা করেন। তিনি স্পষ্টই অভিযোগ করেন যে দেশের আইন ব্যবস্থা ধনীর উৎপীড়ন থেকে দরিদ্রকে রক্ষা করতে অক্ষম। যারা উকিল নিয়োগ, সাক্ষীর ব্যবস্থা, আমলা ও চাপরাশিদের উৎকোচ দিতে পারে তাদেরই কাছে দেশের বিচারালয়ের দ্বার উন্মুক্ত। যদি কেউ নিজের সর্বস্ব পণ করেও আদালতের শরণাপন্ন হয় তাহলেও সে সুবিচার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' গ্রন্থে তিনি রায়তের উপর জমিদারি অত্যাচার ও উৎপীড়নের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন যে উত্তম আইনকানুন থাকা সত্ত্বেও আইনত অপরাধী জমিদারদের কোনো সাজা হয় না, পরিবর্তে নিরীহ দুর্বল ব্যক্তিরাই নিগৃহীত হয় ও শাস্তি পায়। আইন-আদালতের তিনি পাঁচটি ত্রুটি দেখিয়েছেন—

১. মোকদ্দমা অতিশয় ব্যয়সাধ্য…।

২. আদালত প্রায় দূরস্থিত। যাহা দূরস্থ, তাহা কৃষকের পক্ষে উপকারী হইতে পারে না। কৃষক ঘর বাড়ী চাষ প্রভৃতি ছাড়িয়া দূরে গিয়া বাস করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে পারে না…।

৩. বিলম্ব। সকল আদালতেই মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইতে বিলম্ব হয়…।

৪. বর্ত্তমান আইনের এইরূপ অযৌক্তিকতা এবং জটিলতা… ।

৫. বিচারকবর্গের অযোগ্যতা… ।[৩৮]

ইংরেজদের বিচারব্যবস্থার প্রতি তিনি যতই কশাঘাত করে থাকুন না কেন সে-ব্যবস্থা হিন্দুশাসনকালের চেয়ে যে উন্নততর তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। হিন্দুরাজত্বে ব্রাহ্মণদের দাপটে শূদ্রেরা ছিল অসহায়। সে হিসাবে ইংরেজ আমলে অব্রাহ্মণরাও বিচারকর্মে অধিকারী—প্রাচীনকালে যা ছিল অচিন্তনীয়। অবশ্য প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য না থাকায় সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলা যে শক্ত তাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

স্বাধীন ও পরাধীন ভারতের তিনি একটি তুলনামূলক বিচার করেছেন। পূর্বে অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে রাজা এখানেই বসবাস করতেন—আর এখনকার রাজা থাকেন বিলাতে। রাজা নিজ বাসভূমির স্বার্থে অধীনস্থ সুদূর দেশের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন। প্রাচীন কালে এদেশের রাজারা জনসাধারণকে অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলতেন—কাজেই উভয়ের মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। এখানে অত্যাচারী কোন্ দেশ বা জাতের লোক সে-প্রশ্ন গৌণ—তিনি দেশীয়ই হোন অথবা বিদেশী হোন প্রকৃতিতে তাঁরা সমস্থানীয়। আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনকে বঙ্কিমচন্দ্র যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন; সে-যন্ত্র তার নিজ নিয়মেই চলে। সরকারি কর্তাদের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভাল কি মন্দ তাতে কিছু যায় আসে না।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের সম্পর্কের চেয়ে ইংরেজ ভারতীয়দের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল বলেই তিনি মনে করতেন। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে কোনো ইংরেজ দেশীয় বিচারক কর্তৃক দণ্ডিত হতে পারত না বটে, কিন্তু কি ইংরেজ, কি ভারতীয়—সবাই একই নিয়মের অন্তর্গত। কিন্তু প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের প্রতি প্রযোজ্য আইন ছিল স্বতন্ত্র। ভারতীয়েরা ইংরেজদের বিচার করতে পারে না; কিন্তু শূদ্রেরা কি ব্রাহ্মণদের বিচার করতে পারত? তিনি প্রশ্ন করেছেন যে দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের একজন জজ, রামরাজ্যে তাঁর স্থান কোথায় ছিল? প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের ছিল দোর্দণ্ড দাপট, কিন্তু ইংরেজ আমলে ঐ-রূপ শ্রেণীর জোরে কেউ আধিপত্যে অধিকারী নয়।

ভারতীয়েরা রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত; ফলে প্রশাসনের যথোচিত শিক্ষা তারা পাচ্ছে না এবং তাদের সহজাত গুণগুলিও উন্মেষের পথ পাচ্ছে না বলে তিনি অনুভব করেন। রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন যে রাজনৈতিক অধিকার চলে গেলেও ইংরেজশাসন প্রবর্তিত হওয়ায় এখানকার মানুষ ব্যক্তি-স্বাধীনতা পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি উপলব্ধি করেন যে স্বাধীনতার পরিবর্তে ভারতীয়েরা আধুনিক জ্ঞানবিদ্যার অধিকারী হয়েছে। তিনি একথাও

বলেন যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ অস্তে গিয়েছে, উদয় হচ্ছে শূদ্রের প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

উনিশ শতকে ইউরোপ থেকে আগত যে-দুটি মতবাদ ভারতে নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার একটি উদারতন্ত্র, অপরটি জাতীয়তাবাদ। ঐ-শতকের দ্বিতীয়ার্ধে "ন্যাশন্যাল্" শব্দটির ব্যবহারে দ্রুত বিস্তৃতি দেখা যায়। ন্যাশন্যাল পত্রিকা, ন্যাশন্যাল্ পার্টি, ন্যাশন্যাল্ মেলা ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তাভাবনা সে সময়ে একদল শিক্ষিত লোকের মধ্যে ধোঁয়াটে বা অস্পষ্ট আবেগই মাত্র ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নব-অঙ্কুরিত ঐ-আবেগকে সুস্পষ্ট দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ ও সুসংবদ্ধরূপে উপস্থাপিত করেন। ব্যক্তি ও জাতির সর্বাত্মক কল্যাণসাধনায় তিনি সকলকে আত্মনিয়োগ করতে আহ্বান জানান। তিনি মনে করতেন যে যখন সবাই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে তখন সকলের মনোভাব ও আচরণ একই খাতে প্রবাহিত হবে।

জাতীয়তাবাদের প্রধান একটি লক্ষণ বিভিন্ন জাতির স্বার্থকে পৃথকরূপে বিবেচনা করা। এক জাতির কল্যাণ অপর জাতির পক্ষে অকল্যাণকর হতে পারে। দুটি জাতির মধ্যে সংঘাত দেখা দিলে উভয়েই অপরের ক্ষতিসাধন ক'রে স্বীয় স্বার্থের সিদ্ধি কামনা করে। এ-মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, যে-জাতি এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ তারাই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। জাতীয়তাবাদের এই লক্ষণ সমকালীন ভারতে অনুপস্থিত ছিল বলে তিনি মনে করতেন। আর্যরা এদেশে যখন এসেছিল তখন তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজ করত। পরে তারা যখন সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে ভাষাগত ও ধর্মীয় বিভেদ দেখা দেয়, পূর্বের ঐক্য আর থাকে না। সমকালীন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ও প্রদেশান্তর্গত মানুষের মধ্যে একতার অভাব তিনি অত্যন্ত অনুভব করেন; এমনকি একই জাত ও ধর্মের মধ্যেও যে যথেষ্ট অনৈক্য দেখা যায় তার কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> বহুকাল পর্যন্ত বহু সংখ্যক ভিন্ন জাতি এক বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ক্রমে জাতিজ্ঞান লোপ পাইতে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন নদীর মুখনির্গত জলরাশি যেমন সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে, আর তন্মধ্যে ভেদজ্ঞান করা যায় না, বৃহৎ সাম্রাজ্যভুক্ত ভিন্ন জাতিগণের সেইরূপ ঘটে। তাহাদিগের পার্থক্য যায়, অথচ ঐক্য জন্মে না। রোমক সাম্রাজ্যমধ্যগত জাতিদিগের এইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। হিন্দুদিগেরও তাহাই ঘটিয়াছে।[৩৯]

তাঁর মতে প্রাচীন ভারতে সাধারণ মানুষের সঙ্গে শাসকদের কোনো স্বার্থান্বিত সম্পর্ক বিরাজ করত না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সমাজের শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া ছিল, সে-শ্রেণী ছিল ক্ষত্রিয় শ্রেণী। রাজা ও প্রজার স্বার্থ এক না হওয়ায় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাবোধ বলে কিছু ছিল না; লোকে চাইত ভাল রাজা, স্বাধীনতা নয়; রাজশক্তির প্রতি সাধারণের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজতক্তে যেই বসুক না কেন, খাজনা মকুব করত না। সাধারণের চোখে তাই শাসক দেশীয়ই হোন বা বিদেশীই হোন তাতে কিছু যায় আসে না। স্বাধীনতার বাণী ও জাতীয়তাবাদের চেতনা ইংরেজরাই এদেশবাসীকে দিয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর কথায়—

> ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে; যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজদের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।[৩০]

এদেশে "জাতীয়তাবাদ" প্রত্যয়টি যে পুরোপুরি বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে সে-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসংশয় ছিলেন। এশিয়ার দুটি বৃহত্তম দেশ চীন ও ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনার অস্তিত্ব ছিল না। চীন ও ভারতের সাধনা ছিল বিশ্বজনীন। নবাগত জাতীয়তাবাদকে তিনি ধর্মের ব্যঞ্জনায় প্রচার করেন; কারণ তিনি জানতেন যে ভারতবাসীর হৃদয়জয়ের একমাত্র পথ হল ধর্ম। দেশপ্রেমকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে অভিহিত করেন। তিনি বুঝেছিলেন যে জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে এদেশবাসীর নির্বিকার মনোভাব ঘোচাতে হলে জাতীয়তাবাদের একটা ধর্মীয় আদর্শ স্থাপন করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান দেশকে জননীরূপে কল্পনা করা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে বাংলা কথাসাহিত্যে দেশকে মায়ের মর্যাদা প্রথম দিয়েছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' (১৮৫৭) এবং রূপক আখ্যায়িকা 'পুষ্পাঞ্জলি' (১৮৭৬) গ্রন্থ দুটিতে।[৩১] দেবী দুর্গাকে বঙ্কিম বঙ্গভূমির সঙ্গে একাত্মরূপে দেখেছেন; তাঁর জাতীয়তাবোধের এই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

> The third and supreme service of Bankim to his nation

was that he gave us the vision of our Mother···It is not till the Motherland reveals herself to the eye of the mind as something more than a stretch of earth or a mass of individuals, it is not till she takes shape as a great Divine and Maternal power···[৪২]

বঙ্কিমচন্দ্রকে এদেশে জাতীয় চেতনার অন্যতম জনকরূপে অভিহিত করা হয়। বহুকাল আগে ভারতমাতার যে স্বর্ণমূর্তি দীনতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল তাকে পুনরুদ্ধারের জন্যে দেশবাসীর প্রতি তাঁর ব্যাকুল আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। জাতীয়তাবাদের নবমন্ত্রে দীক্ষিত দেশবাসী তাঁর সে ডাকে সাড়া দেয়। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভে তাঁর 'আনন্দমঠ' গ্রন্থটি মানুষের মনে এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পূর্বরচিত 'বন্দেমাতরম' সংগীতকে তিনি তাঁর ঐ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন। উত্তরকালে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের কাছে এ-সংগীত প্রেরণার প্রধান উৎসস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সংগীতের প্রথম শব্দটি ("বন্দেমাতরম") স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপক "স্লোগান" হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথমযুগের শহীদ মদনলাল ধিংড়া ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন। বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম" শব্দটি জাতীয় আবেগের এক মূর্ত দ্যোতনা, যার স্পন্দন ভারতবাসীর নাড়ীতে যেন অনুভব করা যায়।

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দীক্ষাদাতা হলেও আকস্মিকভাবে ইংরেজের এদেশ পরিত্যাগ তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কারণ ইংরেজের কাছ থেকে নবলব্ধ জাতীয়তাবাদের চিন্তা শুধু শিক্ষিতদের মধ্যে নয়, সর্বস্তরের মানুষের মনে তার আগে সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উপলব্ধি করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় তাঁর বাণী দেশবাসীর কানে সম্পূর্ণ না পেঁছিলেও একদিন যে তাঁর কথা প্রণিধানযোগ্য বলে বিবেচিত হবে সে-সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ভারতবাসীর মানসনেত্রে দেশমাতৃকার রূপ ও শক্তি দর্শিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব আবেগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। দেশের শক্তি শ্রেণীবিশেষের মধ্যে সীমিত বলে তিনি মনে করতেন না; শক্তির ধারক ও ও বাহক সারা দেশ। 'আনন্দমঠ'-এ তিনি জাতীয় মুক্তিসেনা গঠনের ইঙ্গিত করেছেন, শ্রেণীবিশেষকে তিনি ক্ষমতাসীন করতে চান নি; তাঁর চিন্তায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যায়।

ব্যক্তিকে তিনি সমষ্টির অঙ্গরূপে দেখেছেন; সমষ্টিগত দেহের প্রাণ হল জন্মভূমি; মানুষের যাবতীয় মূল্যবত্তার উৎস মাতৃভূমি। ব্যষ্টি ও সমষ্টির

এরূপ সমন্বয়চিন্তা ব্যতিরেকে ঐসময়ে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়তো সম্ভব ছিল না। দেশাত্মবোধকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে অভিমত প্রকাশের সঙ্গেই তিনি দেশমাতৃকার দেবীতুল্যা রূপ বর্ণনা করেছেন। একটি কথা এখানে স্মরণ করা দরকার যে বঙ্কিমচন্দ্র নিরাকারবাদী হলেও অনগ্রসর উপাসকদের কাছে রামমোহনের মতো তিনিও মূর্তিপূজার প্রয়োজনকে মানতেন। কারণ মূর্তিপূজায় অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী লোকের কাছে বিমূর্ত উপাসনার প্রস্তাব গ্রহণ-যোগ্য হয় না। সেজন্যে দেবীমূর্তির সাহায্যে তিনি দেশমাতৃকার বন্দনা করেন। উত্তরকালে অনেকের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালও তাঁর এই চিন্তায় প্রভাবিত হন।

'আনন্দমঠ'-এ বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভবানন্দের মুখ দিয়ে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে সন্তানদের কাছে দেশ ছাড়া আর কোনো জননী নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লবীদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। 'অনুশীলন দল'-এর নামকরণ হয়েছিল তাঁরই "অনুশীলন-তত্ত্ব" থেকে। স্বামী বিবেকানন্দও বঙ্কিমচন্দ্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। অরবিন্দ একসময়ে 'আনন্দমঠ'-এর অনুকরণে 'ভবানী মঠ' গঠনের চেষ্টা করেছিলেন।

'আনন্দমঠ' সম্পর্কে লর্ড রোনাল্ডশে লিখেছেন—

> ...the secret societies modelled themselves closely upon the society of the children of *Ananda Math*, 'Bandemataram'; the battle cry of the children became the war cry not only of the revolutionary societies, but of the whole of nationalist Bengal...[৪৩]

'আনন্দমঠ' রচনার পরিকল্পনা কোন্ সূত্রে হয়েছিল সে-সম্পর্কে প্রচলিত মত এই যে ১৭৭২ সালের সন্ন্যাসীবিদ্রোহ এবং ঐ সময়কার দুর্ভিক্ষ থেকেই গ্রন্থটির উপকরণ সংগৃহীত হয়। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তে বলা হয়েছে—

> His outstanding work, however, is the *Ananda Math* a story of the sannyasi rebellion of 1772. The rebels gained a crushing victory over the 'British' and Mohammedan forces.[৪৪]

এ-বিষয়ে বিমানবিহারী মজুমদার এক তথ্যপূর্ণ আলোচনায় দেখিয়েছেন যে 'আনন্দমঠ' রচনার উদ্ভাবনা বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্কে নামক এক বিপ্লবীর সশস্ত্র বিদ্রোহ প্রচেষ্টার বিবরণ থেকে ঘটে। বঙ্কিমের সমসাময়িক কালে দাক্ষিণাত্যে নিজামের রাজ্যে ফাদ্কের বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার কথা জানা যায়।[৪৫] রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ফাদ্কে ভারতের জঙ্গি জাতীয়তাবাদের প্রথম পথপ্রদর্শক।[৪৬]

তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেবল বিপ্লববাদের তত্ত্বগুরু মনে করা ভুল। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিবর্তে গঠনমূলক সমাজোন্নয়নচিন্তা ও প্রচেষ্টায় তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। গোখলের 'সার্ভ্যান্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে রচিত হয়েছিল।

আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত রাখার জন্যে তিনি জাতীয়তাবাদকে একটি সুস্পষ্ট দার্শনিক পটভূমিতে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। তাঁর 'ধর্ম্মতত্ত্ব' গ্রন্থটি এ-কথার প্রমাণ। তাঁর উপর কোঁৎ-এর প্রভাব ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। সমস্ত জৈবিক প্রবণতা ও উন্নত বৃত্তির সামঞ্জস্যসাধনের মধ্যে দিয়ে "মানব দেবী"-র পূজাই ছিল উভয়ের আদর্শ। পার্থক্য এই যে যেখানে কোঁৎ-এর নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টবাদ "has love for its principle, order for its basis, and progress for its end", সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মের প্রত্যয় পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী। শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্র বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে তিনি সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরাভিমুখী করার সময় মানবহিতের প্রশ্নকেও সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মানবপ্রেমই প্রকারান্তরে আত্মোপলব্ধি তথা ঈশ্বরোপাসনা।

দেশপ্রেমের পশ্চাতেও তাঁর সেই মানবপ্রেমের কথাই পাওয়া যায়। সর্বভূতেই ঈশ্বর বিদ্যমান। সেজন্যে সকল জীবকেই নিজের মতো করে ভালবাসা দরকার। আত্মরক্ষার চেয়ে সমাজরক্ষা অধিক প্রয়োজন; কারণ সমাজবহির্ভূত ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব। ব্যক্তি ও পরিবার সমাজেরই অংশ। সেজন্যে সমষ্টির মঙ্গলার্থে ব্যক্তির স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে তিনি দেশ, জাতি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে একই আকারে কল্পনা করেছেন। অন্য জাতির আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা প্রতি জাতির মৌল কর্তব্য; তখন ধর্ম ও সুনীতি অন্তর্হিত হয়; সেই বিষয়ে সজাগ থেকে তিনি মানবিক দৃষ্টিকোণে দেশপ্রেমকে রূপায়িত করেছেন; তাঁর কাছে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রভেদ নেই; বিশ্বপ্রেমকে আদর্শ করলে স্বদেশভক্তিকে জলাঞ্জলি দিতে হবে এমন কথা তাঁর মতে অর্থহীন। তিনি চেয়েছিলেন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের সমমর্যাদা ও সমানাধিকার; একে যেমন অপরের অনিষ্টসাধন করবে না, তেমনি অপরকেও নিজ অনিষ্টসাধনের সুযোগ দেওয়া অনুচিত। নিঃস্বার্থ স্বাদেশিকতা মানুষের মনে ও কর্তব্যে সঞ্চারিত হলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে আর সংঘাত দেখা দেবে না।

সকল জীবের প্রতি প্রীতিকেই তিনি আদর্শ করেছিলেন। কিন্তু বিবদমান বিশ্বে স্বাদেশিকতার প্রাবল্য অনস্বীকার্য। কোঁৎ-এর দেশাত্মবোধ ছিল সংকীর্ণ। উদারতন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে প্রেম ও প্রীতির সঞ্চারকরূপে দেখেছিলেন: মানুষ নির্বিশেষে সবারই মঙ্গল ছিল তাঁর কামনা। ব্যক্তিবিশেষের কাছে বৈশ্বিক বোধ

ও চেতনা আয়ত্ত করা আয়াসসাধ্য বলে দেশভক্তিই তার কাছ থেকে আশা করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই দেশভক্তিকে আধ্যাত্মিক আলোক ও আত্মোপলব্ধির সাহায্যে পরিশীলিত করেন।

এক সময়ে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় ধারায় ধর্মের প্রতাপ ছিল খুবই প্রবল। ক্রমে ধর্মের স্থান অধিকার করে জাতীয়তাবাদ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের সমন্বয় সাধন করেন। হিন্দুধর্মের ঔদার্যে পরিমার্জিত বঙ্কিমমানস জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা সম্পর্কে যথোচিত সচেতন ছিল। পাশ্চাত্যের দেশপ্রেমিকতা তাঁর কাছে আদৌ রুচিকর ছিল না। তিনি বলেছেন—

> ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য-ধর্ম্ম না লিখেন।[৪৭]

হিতবাদীরা "greatest good of the greatest number"-এর যে-আদর্শ তুলে ধরেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বৈশ্বিক চেতনায় গ্রহণ করেন। দৃষ্টবাদীরাও "মানব দেবী"র বন্দনা করেছেন। কিন্তু ঐসব মহান আদর্শ ইউরোপীয় মনকে স্পর্শ করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র গ্রীক, রোমান ও ইহুদি সভ্যতা এবং খ্রীষ্টধর্মের ব্যর্থতার কথাও উল্লেখ করেছেন, যেজন্যে ইউরোপে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সমন্বয় ঘটে নি বলে তাঁর মনে হয়েছে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে নির্ভুল বলা যায় না; কারণ ইউরোপের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের বিভিন্ন সময়ে বৈশ্বিক আদর্শ ঘোষিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে ইউরোপীয় রেনেসাঁসই সেখানকার জাতীয়তা-বাদের উৎস। রেনেসাঁসের প্রভাবে বিভিন্ন দেশে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে ভাষা, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। তারই মধ্যে দিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল জাতীয় আবেগ ও উদ্দীপনা। এদেশেও রেনেসাঁসের প্রবর্তনে বঙ্কিমচন্দ্রের সাগ্রহ উৎসাহ ছিল। সেজন্যে প্রথমে তিনি রামমোহনের মতো ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষবিধানে তৎপর হন। ঐসময়ে এদেশের বিদগ্ধ সমাজ ইংরেজি ভাব ও ভাষার বন্যায় ভেসে চলেছিল; সে-বন্যাকে বঙ্কিমচন্দ্রই সুপটু প্রয়াসে রোধ করেন। তিনি সকল কাজে বাংলাভাষা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন; জাতীয় জীবনের ঐক্যবন্ধনকল্পে বাংলাভাষার উন্নতি বিধানের জন্য সোচ্চার হন। তবে তিনি সর্বভারতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজির পক্ষপাতী ছিলেন। সেইসঙ্গে একথাও উপলব্ধি করেন যে ইংরেজির মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষ নিজেদের

চিন্তা-ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতে অক্ষম এবং একটি বিদেশী ভাষা জাতীয় ঐক্যেরও অন্তরায়। তাই তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বাংলাভাষায় সর্বস্তরের মানুষকে সমাজসচেতন করে তোলার প্রয়াসী হন।

জাতীয় বোধ ও চেতনা সৃষ্টির জন্যে তিনি ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হন। তবে সে-ইতিহাস রাজপুরুষদের প্রতাপ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা নয়—দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, অর্থনীতির কালানুক্রমিক মূল্যায়নই তাঁর ইতিহাস রচনার বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাভাবনা মূলত প্রাদেশিক বিষয়েই সীমিত ছিল; শুধু বাংলার কথাই তিনি বলেছেন। অবশ্য প্রাদেশিক সংকীর্ণতা তাঁর ছিল না এবং স্বতন্ত্র বঙ্গরাষ্ট্র গঠনের কথা তিনি ভাবেন নি। তবে সর্বভারতীয় জাতীয় আবেগ ও ঐ সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পত্র সূচনায় তিনি লিখেছেন—

> ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ

ইসলামধর্মী তথা মুসলমানদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ ও পরস্পরবিরোধী মনোভাব তাঁর বিভিন্ন রচনায় ছড়িয়ে আছে। স্বভাবতই তার পক্ষাপক্ষে বিস্তর বাদানুবাদ দেখা যায়। অনুরূপ স্ববিরোধ তাঁর হিন্দু ধর্ম ও লোকাচার সম্পর্কেও কম নেই। বস্তুত তিনি নিজস্ব যুক্তিতে ধর্ম শব্দটির এক নতুন সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে তিনি রামমোহনের মতো আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন বটে, কিন্তু সর্বধর্মসমন্বয়কারী কোনো ধর্মমত প্রচার করেন নি। সমকালীন বিভিন্ন ধর্মান্দোলন থেকে তাঁর ধর্মচিন্তা ছিল স্বতন্ত্র। মানুষের কল্যাণ ও মনুষ্যত্বের বিকাশই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু হিন্দুত্বের আবরণে তাঁর নব্যচিন্তা প্রকাশ পায়, হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব ফুটে ওঠে। সেটা অসঙ্গত কিছু নয়।

তত্ত্বগতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র ইসলাম ধর্মের প্রতি অন্য সমস্ত ধর্মের মতো সমান শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। মহম্মদের প্রতি বারেবারে তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব

লক্ষিত হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রশাসন, ইতিহাসচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে পূর্বতন মুসলমান আমলের রীতিনীতি, সমাজব্যবস্থা ও মুসলমান লেখকদের সম্পর্কে অযথা কটূক্তি তাঁকে মুসলিম-বিদ্বেষী বলে প্রতিপন্ন করে। সাহিত্যেও সেই মনোভাব ফুটে ওঠে। সাহিত্যে অবশ্য রসোত্তীর্ণতা ও রসবোধের প্রশ্ন থাকে। কিন্তু প্রবন্ধাদিতে মুসলমানদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব সমালোচকদের কাছে ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মুসলিম বিদ্বেষী না হলেও হিন্দুত্বের পুনরুত্থানের চিন্তা তাঁকে হিন্দু সমাজের একজন মুখপাত্র হিসাবে খাড়া করে।

দেখা যায় যে একদা যুক্তিবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে হিন্দু রক্ষণশীলতা কালক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে তাঁদের হিন্দু রক্ষণশীল মনোভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি গীতার ভাষ্য রচনা ও হিন্দু-ধর্ম ও দর্শনের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেন এবং আদর্শ হিসাবে কৃষ্ণচরিতকে তুলে ধরেন। সর্বোপরি সনাতন হিন্দুত্বের মহিমাকে বড় করে দেখান। তাতে কোনো অসংগতি কিংবা আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু তারই পাশাপাশি বিভিন্ন রচনায় মুসলমানদের সম্পর্কে অশোভন কটূক্তি ছাড়াও বিভিন্ন উপন্যাসে কল্পিত কিংবা ঐতিহাসিক কোনো মুসলমান চরিত্রকে হেয় করে চিত্রিত করেন। অবশ্য অনেক মুসলমান চরিত্রে মহত্ত্ব অরোপও করেছেন। সাহিত্যে নৈতিকতা অপেক্ষা রসসৃষ্টির বিচারটাই বড়। কিন্তু পাঠকদের কাছে মুসলমানদের সম্পর্কে স্থূল কটূক্তির প্রতিক্রিয়া তিক্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক যেখানে জটিল, বিশেষ করে ভারতে মুসলমান শাসনের অবসানের সঙ্গে ভূমি, রাজস্ব, প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে যখন মুসলিম সমাজ সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে ও তাদের মধ্যে হীনমন্যতা দেখা দেয়, তখন পূর্বতন শাসক ও শাসনব্যবস্থার প্রতি কটূক্তির সংগে হিন্দুত্বের এক তরফা মহিমাকীর্তনের ফলে মুসলমান পাঠকদের স্বতন্ত্রখাতে প্রবহমান মুসলিম জাত্যাভিমান ও ধর্মীয় আবেগে আঘাত লাগে।

হিন্দু ও মুসলমানেরা যে একই সামাজিক ঐতিহ্যের শরিক ছিল না এবং বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচিত হয় নি, সেকথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বিবরণ নাকচ করে দেন এবং সেই সংগে মুসলমান লেখকদের প্রতি কটূবাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করেন।

'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় নেশন বলতে হিন্দু নেশন বোঝাতে চেয়েছেন। ইতিহাসে ভারতীয় তথা হিন্দু নেশন প্রতিষ্ঠার দুটি

সার্থক নিদর্শনের কথা তিনি উল্লেখ করেন। একটি মহারাষ্ট্রে শিবাজীর প্রয়াস এবং অপরটি পাঞ্জাবে রণজিৎ সিং-এর নেতৃত্ব। উভয়েই ছিলেন মুসলমান শাসকদের প্রতিদ্বন্দ্বী। হিন্দুদের এইভাবে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা এবং মুসলমান আমলকে উপেক্ষার পরিণাম হিন্দু ও মুসলমান জনচিত্তে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভাবনায় ইন্ধন যোগায়।

শিক্ষাচিন্তা

সামাজিক অসংবদ্ধতাকে তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার 'অন্তরায় বলে মনে করতেন ; প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থায় দেশবাসী জর্জরিত ছিল ; তাই তিনি সাম্যের জয়গান করেছিলেন ; চেয়েছিলেন মানুষ নির্বিশেষে সকলের সমান সুযোগ ও অধিকারের প্রতিষ্ঠা ; তবে আইনের পথ বেয়ে সাম্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না—তাতে লোকের দুর্গতি ঘোচে না—মানুষে-মানুষে বৈষম্যও বিদূরিত হয় না। সেজন্যে তিনি সমস্যার আরও গভীরে গিয়ে তার সমাধানের পথ খুঁজেছেন। সে সমাধানের পথ ব্যাপক শিক্ষাবিস্তারের মধ্যেই রয়েছে বলে তিনি অনুভব করেন। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তানায়কেরাও অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যে-শিক্ষার তাগিদ অনুভব করেন সে-শিক্ষা পুঁথিগত নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার নিরঙ্কুশ বিকাশ, কার্যকুশলতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যে যথোচিত চেতনাই সে-শিক্ষার মূলকথা। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ তিনি মানুষের চতুর্বিধ বিকাশের রূপ ও পদ্ধতি দর্শিয়েছেন। বলা বাহুল্য ঐ শিক্ষাতত্ত্ব এবং তার প্রয়োগ পুঁথিগত নয়। নজির হিসাবে তিনি এদেশের ধাত্রীদের কথা বলেছেন যারা তথাকথিত শিক্ষিত বাবুদের চেযে কোনো অংশে কম শিক্ষিত নয়। প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষার প্রচার ও প্রসার তাঁর মতে অনুন্নত ছিল না। মহাভারতকে তিনি উদাহরণ হিসাবে দেখিয়েছেন। সে-যুগে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ এমনকি স্ত্রীলোকেরাও যে শিক্ষার আলোকে বঞ্চিত ছিল না সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় দেখা যায়।

রামমোহন থেকে সমকালীন সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবিষয়ে তেমন যত্ন নেন নি বলে বঙ্কিমচন্দ্র অভিযোগ করেছেন। বস্তুত লোকশিক্ষার বিষয়ে কেরি, হেয়ার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ অনেকেই যথেষ্ট যত্নবান হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে শিক্ষিত লোকেরা কৃষক ও সাধারণ মানুষের শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন।

তাঁরা বক্তৃতামঞ্চে বড় বড় কথাই শুধু বলে থাকেন, পত্রপত্রিকায় গালভরা কথাও লেখেন অনেক—উদ্দেশ্য আর কিছু নয়—কর্তাদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করা। অথচ আসল সমস্যাটি অবহেলিতই থেকে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন দেশের ছ-কোটি মানুষের অন্তর্নিহিত অসীম সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করেন; কিন্তু সে-সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ পায় না। তাঁর মতে দেশের আপামর মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই নয়, নিপীড়ন থেকেও তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পাবে। যথোচিত শিক্ষা পেলে স্ত্রীলোকেরাও স্বাবলম্বী হতে পারে। সেজন্যে তিনি লোকশিক্ষার ব্যাপক বিস্তার কামনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ শিক্ষার চেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। উনিশ শতকের ষাটের দশকের শেষদিকে উচ্চশিক্ষার ব্যয়সংকোচ করে নিম্নতন শিক্ষাবিস্তারের প্রস্তাব ওঠে। তাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উচ্চবিত্ত সদস্যরা সরকারি প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা বলেন উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হলে অধঃশ্রেণীর লোকেদের পৃথক শিক্ষিত করার প্রয়োজন হবে না। শিক্ষা উপর থেকে নিচের দিকে স্বতঃই "ফিলটার ডোন" করবে। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তার উল্লেখ করে বলেন যে "বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোধিবে"। তবে কৃতবিদ্য একাংশের সংসর্গে অন্যাংশের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে, যদি বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝতে পারে। কিন্তু এদেশের পরিস্থিতি তার অনুকূল নয়। নিম্নশ্রেণীর প্রতি উচ্চশ্রেণীর সহৃদয়তার অভাবকে তিনি বড় বাধা বলে মনে করতেন।[৯৮]

জনসাধারণকে সংস্কৃতিবান করার কাজে নিরক্ষরতার অসুবিধা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। বিকল্প ব্যবস্থাস্বরূপ কথকতার সাহায্যে সাধারণ মানুষকে জ্ঞাতব্য নানা কথা শোনানো যায়। শিক্ষিত লোকদেরও লোকশিক্ষায় সযত্ন উৎসাহ থাকা প্রয়োজন। চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদির সাহায্যে ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষিতরা শিক্ষাহীনদের সহজেই জ্ঞানের আলো দেখাতে পারেন। সংবাদপত্রগুলিকেও লোকশিক্ষার বাহন হতে হবে। শিক্ষার বিস্তারে গুরু ও সন্ন্যাসীদের কর্মপন্থা অবলম্বনের তিনি সুপারিশ করেছেন। তাঁর প্রায় সকল গ্রন্থেই শিক্ষাদাতার ভূমিকায় গুরু বা সন্ন্যাসীর চরিত্র দেখা যায়।

প্রশাসন ও উচ্চশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে সেইসঙ্গে মনে করতেন যে মাতৃভাষার চর্চা ও বিকাশের প্রতিও সমধিক যত্ন নেওয়া উচিত। শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ও লোকের মননশীলতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে তিনি মাতৃভাষায় জনপ্রিয় বইয়ের অভাব

অনুভব করেন। মাতৃভাষায় উন্নতমানের পর্যাপ্ত সংখ্যক বই লেখা ও ছাপা হলে লোকের সহজবোধ্য পাঠ্যবস্তুর চাহিদা মিটবে। বইয়ের সুচারু বিপণন ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গোড়াপত্তনের এবং সেজন্যে প্রয়োজনে গ্রামের বিদ্যালয় গৃহে গ্রন্থাগার স্থাপনের তিনি প্রস্তাব করেন।[৪৯]

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে পূর্ণ অনুরাগ থাকলেও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে সেটা মূলত ইহবিমুখ ও আধুনিক ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। সেই-নিরিখে টোল-চতুষ্পাঠীর প্রচলিত পঠনপাঠন তাঁর কাছে নিষ্ফল ও অর্থহীন বলে অনুভূত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে সেখানে দর্শনচর্চার নামে চলে কথার মারপ্যাঁচ আর নিরর্থক বাদবিতণ্ডা। তাই তিনি মন্তব্য করেন—"The sum of useful human knowledge would in no way be diminished, if by some fortunate accident, the philosophy of *tols* disappeared from the face of the earth." রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর এ-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য দেখা যায়।[৫০]

উপসংহার

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সময় ও সমাজকে সামনে রেখে নতুন সমাজবোধ ও জীবনাচার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। যুক্তির সাহায্যে তিনি নবাগত জীবনবোধকে উপলব্ধি করেন, কিন্তু সমসাময়িক সমাজমনে আবদ্ধ ধারণায় নবকলেবরে হিন্দু-অতীতকেই চলমান করে তুলতে চান। পরাধীনতার গ্লানিময় জাতির অনিশ্চিত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিকল্পস্বরূপ অতীতমুখিতাই তাঁর কাছে ছিল সহজতর পথ।

রামমোহনের ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত বিদ্রোহী চিন্তা, সমাজবিপ্লবী নব্যবঙ্গদলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ইহলৌকিক বস্তুবাদী জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তিনি। পাশ্চমী সংস্কৃতির যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শও বঙ্কিমচন্দ্রের মনে প্রথম দিকে রেখাপাত করে। কিন্তু তাঁর চোখের দেখা মনের জড়তায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় সেই উত্তরাধিকার নিষ্ফল হয়ে যায়। জীবনের প্রথমার্ধে তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী, ঐহিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন। পরিণত জীবনে বিমূর্তভাব ও সর্ববিষয়ে পরমত্বের আতিশয্য ঘটিয়ে পূর্ব-অনুসৃত মত ও পথ থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। চিন্তা ও প্রযুক্তির মধ্যে বিরোধ ছিল যথেষ্ট। যুক্তিবিরোধী যুক্তিজালের সাহায্যে তিনি গুরুবাদ ও সমষ্টিবাদের পথ সুগম করে দেন। রামমোহনের রেফর্মেশন আন্দোলন বঙ্কিমচন্দ্রের কাউণ্টার-রেফর্মেশনে পরিণতি লাভ করে।

রামমোহনের মতো তিনিও মননশীল দৃষ্টিতে ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করেন। খ্রীষ্টানদের সমালোচনা, ভিন্নমুখী ব্রাহ্মদের ক্রিয়াকলাপ, দয়ানন্দ ও শশধর তর্কচূড়ামণি কর্তৃক সনাতন আদর্শের প্রচার প্রভৃতির মধ্যে থেকে তিনি পৃথক পথ কেটে স্বতন্ত্র সমাজাচার এবং ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের বিরোধ ও অসংগতি দূর করে সমন্বিত জীবনাদর্শ স্থাপনকল্পে যুগোপযোগী এক তত্ত্বের সন্ধান করেন। তিনি মনে করতেন—"কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে"।[৫১] এই বিশ্বাসের পিছনে ছিল তাঁর অনুশীলন-তত্ত্ব, যার মূলকথা হল ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বর সর্বলোকে বিরাজমান, কাজেই সর্বলোকে প্রীতিই ধর্মের প্রধান নির্দেশ। তারই প্রেক্ষাপটে তিনি নতুন জীবনাচারের চিত্র অংকন করেছেন। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে চাই সর্বলোক ও আত্মার অভিন্নতা বোধ—একমাত্র সেই চেতনাতেই জ্ঞান, কর্ম ও ধর্মাচরণ নির্ভরশীল। সেই জ্ঞান থেকেই আসে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সুখ ও শান্তি। হিন্দুধর্মের মধ্যেই তিনি সেই চেতনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

প্রাচীন মূল্যবোধের সাহায্যে নতুন জীবনাদর্শে তিনি সমকালীন শিক্ষিত মানুষের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি এবং দেশগরিমা সৃষ্টির প্রয়াসী হয়েছিলেন। আত্মশক্তি ও গরিমায় মানুষকে ঐভাবে উদ্বুদ্ধ করে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনাসৃষ্টির ভিন্ন কোনো পথ তিনি সেসময়ে খুঁজে পান নি। জাতিবিদ্বেষকে তিনি ভিন্নার্থে দেখেছিলেন—"বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।"[৫২]

তাঁর প্রাচীনতার চিত্র ছিল আধুনিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত। অনেকটা যেন নতুন পাত্রে পুরানো মদিরার মতো। দেশের প্রাচীন স্থিতিকে তিনি প্রতীচ্যের জ্ঞানবিদ্যায় গতিশীল করতে উদ্যোগী হন। বর্তমানের সাহায্যে অতীতের ভালমন্দ গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে দিয়ে তিনি যে-নতুনের সন্ধান দিয়েছিলেন তা প্রকারান্তরে ভবিষ্যতের এক ভিন্ন নিশানা দেখায়। তাঁর প্রচারিত হিন্দুধর্মের জাগরণ ও হিন্দুসাম্রাজ্যের চিত্র উত্তরকালে হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপ পরিগ্রহ করে।

বিমূর্ত ভাবের আতিশয্যে তিনি স্বদেশচিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে খর্ব করে ফেলেন ; দেশের প্রতি দৈব ব্যঞ্জনার প্রয়োগ এবং ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বিত

চিন্তা পরবর্তীকালে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার পথে নিয়ে যায়। তাঁর স্বদেশপ্রীতি, জগৎপ্রীতি, আত্মপর ভেদ-শূন্যতা প্রভৃতি প্রত্যয় পরম অর্থে (absolute) ব্যবহৃত। অর্থাৎ দেশ, কাল ও সমাজের অতীত ও ঊর্ধ্বে ঐ পরমতত্ত্ব চিরন্তন—মানুষ তার ক্রীড়নক মাত্র। সাম্যের প্রথম প্রবক্তারূপে রুশোকে তিনি আদর্শ করেছিলেন। রুশো সমষ্টির ইচ্ছায় (General Will) পরমত্ব আরোপ করেন। রুশোর মতে সমষ্টির ইচ্ছাধীন নয় এমন কোনো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব অসহনীয়। সমষ্টির ইচ্ছাকে মানতে অনিচ্ছুক সবাইকে সমষ্টি তার নির্দেশ মান্য করতে বাধ্য করবে। সমষ্টিকে বলীয়ান করার তাগিদে রুশো ব্যক্তিকে সমষ্টির উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল করেন। সমষ্টির কাছে ব্যক্তির নির্বিচার আনুগত্য রুশোর দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ সমাজের পরিচায়ক। রুশোর প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র সমাজকে ভক্তি করার উপদেশ দেন ; ভক্তি ভিন্ন উপায় নেই। ভক্তির পাত্র সমাজই শিক্ষাদাতা, দণ্ড-প্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। রাজাই হল সমাজ এবং সমাজ আমাদের শিক্ষক। এখানে হেগেলীয় চিন্তার সঙ্গেও তাঁর মিল দেখা যায়। হেগেলের মতে রাষ্ট্র দিব্য অভীপ্সার প্রতীক। ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও বিচারের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের নির্দেশ ঈশ্বরেরই নির্দেশ। জাতীয় ব্যক্তিত্বের (National Spirit) মধ্যে নিজের ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বকে নির্বিচারে মিশিয়ে দেওয়াই নাগরিকমাত্রের মহান কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকৃতি পুরোপুরি কলাকৈবল্যবাদী নয়। তবে উদ্দেশ্য-মূলক বা প্রচারধর্মী আখ্যা না দিয়ে বরং তাকে নীতিধর্মমূলক বলাই ভাল। শিল্পিমনের সঙ্গে সমকালীন সামাজিক ভণ্ডামি ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অসারতার সংঘাত তাঁর বিভিন্ন রচনায় সুপরিব্যক্ত। তখনকার প্রকাশ্য কোনো আন্দোলনেই তিনি নিজেকে জড়াতে চান নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি মনে করতেন জনজীবনের সাংস্কৃতিক বনিয়াদ শক্ত না হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নয়নপ্রয়াস নিষ্ফল হবে। তাই জনমনকে পরিশীলিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা ও বহুবিবাহের অপকার সম্পর্কে তত্ত্বগত চেতনা ও উদার মনোভাব থাকলেও প্রয়োগের দিক থেকে তিনি ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। এখানে তাঁর যুক্তিবোধ ও প্রচলিত নীতিবোধের সংঘাত সুপরিস্ফুট। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবেই হয়তো তিনি ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং জমিদারদের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেও তাদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের চিন্তায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীদের দুঃখদুর্দশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা অনুক্ত রয়ে গিয়েছে। তিনি কেবল বাঙালির সমস্যাকেই প্রত্যক্ষ

করেছিলেন। সেদিক থেকে রামমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র প্রমুখ তদানীন্তন নায়কবৃন্দ ভারতের অন্যান্য প্রদেশবাসীর সঙ্গে সমসূত্রে বাঙালিকে যুক্ত করেন।

মহাপুরুষদের চরিত্র ও প্রতিভায় প্রায়শঃই এক বর্ণবৈচিত্র্য দেখা যায়। তাঁর কোন্ বর্ণটি যে সমসাময়িক যুগচিত্তে প্রতিফলিত হবে তা শুধু তাঁর উপরেই নির্ভর করে না, যুগচিত্তের উপরেও করে। ইতিহাসে মহামানবদের যে-চিত্র ফুটে ওঠে তা তাঁর ও সেই সময়ের সংমিশ্রিত পরিচিতি। বর্ণবৈচিত্র্যের ফলেই মহান নায়কদের রূপ ও পসার যুগের দাবিতে আকৃতি লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি ও সাম্যের বাণী একদা সমাজচিত্তে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছিল। কিন্তু তাঁর দেশাত্মবোধের আধ্যাত্মিক আবেদন ও দেশমাতৃকার মন্ত্রমুগ্ধ কল্পনা জনমনে স্থায়ী আসন অর্জন করে। উত্তরকালে তা ভাবাবেগসর্বস্ব, উচ্ছ্বাসপ্রবণ, উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়।

উ ৎ স নি র্দে শ

১. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী: 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশীযুগ', ১৯৫৬, ১১১ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের উক্তিটি উদ্ধৃত।

২. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: 'রবীন্দ্রজীবনী', খণ্ড ১, পৃ. ১৮৫।

৩. কালীনাথ দত্ত: "বঙ্কিমচন্দ্র", সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ২৩৭ পৃষ্ঠা।

৪. বিপিনচন্দ্র পাল: 'নবযুগের বাংলা', ১৩৬৪, পৃ. ১৯০।

৫. 'বঙ্কিম রচনাবলী', সংসদ সংস্করণ, খণ্ড ২, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬৮।

৬. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত: 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র', ২০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৭. 'বঙ্কিম রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃ. ১৩৩২।

৮. তদেব। পৃ. ৬৩৩।

৯. বিপিনচন্দ্র পাল: 'নবযুগের বাংলা', পৃ. ১৩৯।

১০ ভবতোষ দত্ত: "বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন", অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সাময়িক পত্র ও বাংলা সাহিত্য', ১৩৭০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৫-৩৩।

১১. 'রবীন্দ্র রচনাবলী', পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সংস্করণ, খণ্ড ১০, পৃ. ৫৫।

১২. *Bengal Past and Present*. vol. 8, part 2, no 16, April-June 1914, p. 279.

১৩. 'বঙ্কিম রচনাবলী', খণ্ড ১, পৃ. ১০

১৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ঃ 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়', সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ২২, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯১।
১৫. 'বঙ্কিম রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃ. ৪৪৩।
১৬ Bipin Chandra Pal. *Beginning of Freedom Movement in India*. 1959. p. 52.
১৭. 'বঙ্কিম রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃ. ৪৩৩।
১৮. তদেব। পৃ. ৭৬১, ৬৯৭ ৬৯৪।
১৯. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র', পৃ. ৪৩।
২০. 'বঙ্কিম রচনাবলী' ঃ খণ্ড ১, পৃ. ৬৬৬।
২১. তদেব। পৃ. ৫৭।
২২. তদেব। পৃ. ৬৫৩-৫৪।
২৩. তদেব।
২৪. তদেব। পৃ. ৬৫৯
২৫. তদেব। পৃ. ৫৯২, ৫৯৪-৫।
২৬. বিপিনচন্দ্র পাল ঃ 'নবযুগের বাংলা', পৃ. ১৯০-১৯১।
২৭ ভবতোষ দত্ত ঃ 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯৬১, পৃ. ৬৮-৬৯।
২৮. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ঃ "বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ", সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সংকলিত 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', পৃ. ১৯৪।
২৯. B. B. Majumdar. *History of Political Thought*. p. 402.
৩০. 'বঙ্কিম রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃ. ৬৭১।
৩১. তদেব। পৃ. ৬১৯।
৩২. তদেব। পৃ. ৬১৬।
৩৩. তদেব। পৃ. ৪০৬।
৩৪. তদেব। পৃ. ৩০১।
৩৫. তদেব। পৃ. ৩১৩।
৩৬. তদেব। পৃ. ৩১০।
৩৭. তদেব। পৃ. ২৯৭-৮।
৩৮. তদেব। পৃ. ৩০৭ ৮।
৩৯. তদেব। পৃ. ২৪০।
৪০. তদেব। পৃ. ২৪০-১।
৪১. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 'আনন্দ মঠ' ঃ রচনার প্রেরণা ও পরিণাম, তৎসহ বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠের প্রথম সংস্করণের ফটোকপি, ১৯৮৩।

৪২. Sri Aurobindo. *Bankim-Tilak-Dayananda*. 1970. p. 10.

৪৩. Earl of Ronaldshay. *The Heart of Aryavarta*. 1927. p. 114.

৪৪. *Encyclopaedia Britannica*. 1960. vol. 5.

৪৫. B. B. Majumdar. *Militant Nationalism in India*. 1966. Appendix.

৪৬. R. C. Majumdar. ed. *The History and Culture of the Indian People*. vol. 10, part 1, *British Paramountcy and Indian Renaissance*. 1965. p. 908-914.

৪৭. 'বঙ্কিম রচনাবলী', খণ্ড ২, পৃ. ৬৬১।

৪৮. তদেব। পৃ. ২৮২।

৪৯. *Bankim Rachanavali*. Sansad Ed. 1969. p. 101.

৫০. *Ibid*. p. 143.

৫১. বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃ. ৫৯৬।

৫২. তদেব। পৃ. ৮৮৫।

রমেশচন্দ্র দত্ত ।। ১৮৪৮—১৯০৯

ভারতীয় রাজনীতির উদারতন্ত্রী মতাদর্শের অর্থনৈতিক ভাবভূমি রচনায় যাঁরা অগ্রগণ্য হিসাবে বিবেচিত রমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ব্রিটিশ শাসনের সরাসরি বিরোধিতা না করলেও, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও জনবিরোধী প্রশাসনের চরিত্র রমেশচন্দ্রের তথ্যসমৃদ্ধ রচনাদিতে উদ্ঘাটিত হয়। আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার আগে লণ্ডনে রাজনৈতিক সভাসমিতিতে তাঁর যাতায়াত দেখে পাছে তাঁর আসন্ন কর্মজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে সেই আশংকায় দাদাভাই নৌরজি রমেশচন্দ্রকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য সত্ত্বেও কর্মজীবনে তিনি সরকারি বিধিব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন নি। স্বভাবতই কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হবার ফলে তাঁর পদোন্নতি বাধা পায়। তাই সময় উত্তীর্ণ হবার আগেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। নিজের রচনাদিতে সবকিছু ছাপিয়ে উঠত তাঁর দেশের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবেগ তথা দেশাত্মবোধ। তিনি নিজেকে "a band of patriotic workers"-এর একজন বলে মনে করতেন।[১]

ছাত্রজীবনে অসাধারণ মেধার অধিকারী রমেশচন্দ্র আই-সি-এস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন (১৮৭১)। বিলাতে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত। শিক্ষানবিশির সময়ে তিনি ও বিহারীলাল ব্যারিস্টারি পাঠও সাঙ্গ করেন।

সরকারি চাকরিতে প্রথমে তিনি আলিপুরে সহকারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। পরে কৃষ্ণনগরে যখন জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলি হন সেই সময়ে বিবেকের তাড়নায় তিনি নিপীড়িত রায়তের পক্ষ অবলম্বন করেন। তাতে নীলকর ইংরেজরা একযোগে রমেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে কমিশনারের কাছে নালিশ জানায়। আরও পরে যখন অস্থায়ীভাবে মাস দুয়েক বাঁকুড়া ও বালেশ্বর জেলার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল তখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে ইংরেজ অপরাধীদের বিরুদ্ধে আনীত ফৌজদারি মামলায় তাঁর বিচারের কোনো অধিকার নেই। জুনিয়ার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটদের সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁর অনুরোধে কলকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট বি. এল. গুপ্ত এই বৈষম্য দূর করার জন্যে একটি প্রস্তাব পেশ করেন; লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর অ্যাসলি ইডেনের সমর্থনে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে যে বিল উত্থাপিত হয়েছিল সেটি ইলবার্ট বিল নামে অভিহিত। ইংরেজদের বিরোধিতায় বিলটির নিষ্ফলতার কথা পরে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রপত্রিকার বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্মকুশলতার জোরে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম একটি জেলার (বাখরগঞ্জ) শাসকপদে নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল পরে তাঁকে বর্ধমান ও উড়িষ্যার অস্থায়ী কমিশনার পদে দেখা যায় (১৮৯৪-৯৭)। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে ভারতীয়দের কাছে কমিশনারের পদে স্থায়ী নিয়োগের পথ রুদ্ধ তখন তিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন (১৮৯৭)। ১৮৯৫ সালে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। কিন্তু তিনি সরকারপক্ষকে নির্বিচারে সমর্থন করতেন না।

সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে রমেশচন্দ্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে তাঁর বহুমুখী বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি হিসাবে তিনি লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট, রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচার সংস্থা তিনটির সদস্য-পদে নির্বাচিত হন। এই সময়ে স্বদেশের জীবনযাত্রার মানোন্নতির চিন্তা তাঁর মনে সদাই বিরাজ করত। ভারতীয়দের দাবি ও অধিকার সম্পর্কে সহানুভূতিশীল ইংরেজদের নিয়ে তিনি একটি দল গঠন করেন। তাঁর লেখা 'ইংল্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া' (১৮৯৭) বইটি ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও ভারতীয়দের অভাব অভিযোগের প্রতি শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও জনমত গঠনের পক্ষে কার্যকর হয়।

লণ্ডনে অবস্থানকালে বছর তিনেক রমেশচন্দ্র ভারতের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা কাজে তৎপর থাকেন। ১৮৯৮ সালে কার্জনের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের এক সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে কলকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয়কৃষ্ণ দেব তুমুল আন্দোলন শুরু করেন। উক্ত বিলে কর্পোরেশনের বার জন সদস্যবিশিষ্ট কর্মসমিতিতে করদাতাদের নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্যে থেকে মাত্র চার জন প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে বিলের বিরুদ্ধে কলকাতার নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে রমেশচন্দ্র প্রচার চালান। পার্লামেন্টের কোনো কোনো সদস্যকে তিনি স্বমতে তাঁদের বক্তব্য উত্থাপনে সমর্থ হন। শেষাবধি সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রতিবাদে কর্পোরেশনের ২০-জন নির্বাচিত প্রতিনিধি পদত্যাগ করেন।

বিলেতে স্বদেশের জন্যে তাঁর কর্মতৎপরতায় প্রীত হয়ে কংগ্রেস থেকে বিলাত প্রবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে রমেশচন্দ্রকে কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে আহ্বান জানানো হয়। তিনি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভারতে আসেন। শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ।

রমেশচন্দ্র জাতীয় কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে (১৮৯৯) সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে দেশবাসীর স্বার্থ ও চাহিদার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সরকারের আশু কর্তব্য। সেজন্যে সরকারি বিধিব্যবস্থা প্রণয়নকালে যথোচিত জনপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকা একান্তই আবশ্যক। প্রতিটি প্রাদেশিক কর্মসমিতিতে অন্তত একজন এবং বড়লাটের কর্মসমিতিতে কমপক্ষে তিনজন ভারতীয় প্রতিনিধি থাকা উচিত। দেশের দুর্বিষহ দারিদ্র্য, বারংবার দুর্ভিক্ষ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজস্বের হার সম্পর্কেও তিনি তীব্র মন্তব্য করেন।

পরের বছর যখন তিনি বিলেতে ফিরে যান তখন হাউস অফ কমন্স-এ উইলিয়াম ওয়েডাবার্ণ প্রস্তাব তোলেন যে ভারতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে কৃষকদের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। বিতর্কসূত্রে রমেশচন্দ্রের সভাপতির ভাষণ অনেকে উল্লেখ করেন এবং পরে তাই নিয়ে সংবাদপত্রে বাদানুবাদ দেখা দেয়। ঐবছরে প্রকাশিত তাঁর কার্জনকে লেখা পত্রাবলী 'ফেমিনস্ ইন ইণ্ডিয়া' বইটি তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। লণ্ডনে তিনি দুর্ভিক্ষ বিরোধী একটি সংস্থা গঠন করেন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষর সমন্বিত একটি স্মারকপত্র সরকারের কাছে পেশ করেন।

১৯০২ সালে রমেশচন্দ্রের 'ইকনমিক হিস্ট্রি অফ্ ইণ্ডিয়া' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সেই বছর তিনি আবার দেশে ফিরে আসেন। জাহাজে পরিচয় ঘটে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে। পরে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ গড়ে ওঠে। এই সময়ে ভারতে ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব সম্পর্কে লর্ড কার্জন এক নতুন ব্যবস্থার পত্তন করেন। স্বভাবত রমেশচন্দ্র সেটির সমালোচনায় ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। সরকার নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকে।

সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ১৯০২ সালে কার্জন সাড়ম্বরে দিল্লীর দরবারের আয়োজন করেন। দরবার থেকে ফিরে এসে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেন যে বিগত আড়াই দশকের ইতিহাস হল এদেশে শোষণ ও নিপীড়নের বিস্তার এবং বহির্ভারতে এদেশের অর্থে যুদ্ধ চালানোর সাম্রাজ্যবিস্তারী কাহিনী। ভারতের ঘাড়ে জাতীয় দেনা ও উচ্চহারে কর চাপিয়ে যুদ্ধের খরচ উসুল করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, পৌর ও স্বায়ত্তশাসন সংস্থায় আধিপত্য বজায় রাখা, উচ্চপদে অভারতীয়দের কর্মসংস্থান এবং সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের সাক্ষী হল ভারত ইতিহাসের এই পর্ব। সেই দৃষ্টিতে তিনি বলেন যে দিল্লীর দরবার ছিল ভারতীয়দের কাছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমত্তার পরাকাষ্ঠা।

ঔপনিবেশিক শাসনের মূলে অর্থনৈতিক শোষণের নগ্ন চেহারা রমেশচন্দ্রের তথ্যবহুল বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে প্রকাশ পায়। ভারতীয় সমাজের যাবতীয় দুর্গতির অবসান একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সম্ভব এবং সেজন্যে উপযোগী একটি চিত্র তিনি তুলে ধরেন। কংগ্রেসের বেনারস অধিবেশনে (১৯০৫) ও সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) সঙ্গে আয়োজিত শিল্প সম্মেলন দুটিতে তিনি ছিলেন সভাপতি। স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি স্বাগত জানান যাতে ভারত শিল্পোন্নয়নে অগ্রসর হতে পারে এবং বিদেশী অর্থনৈতিক নাগপাশ থেকে মুক্তি পায়।

দীর্ঘ প্রবাসজীবনে তাঁর ছেদ পড়ে যখন বরোদার গাইকোয়াড়ের অনুরোধে রমেশচন্দ্র সেখানকার রাজস্ব সচিবের পদে যোগ দেন (১৯০৪ ৭)। এরপর তাঁকে আবার লণ্ডনে ফিরে যেতে হয়; সরকার তাঁকে রয়াল (ডিসেণ্ট্রালিজেশন) কমিশনের সদস্যপদে নিয়োগ করেন। সরকারি শাসন কাঠামোর সংস্কার সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়াই ছিল কমিশনের কাজ। ১৯০৯ সালে তিনি আবার বরোদায় ফিরে আসেন ও সেখানকার দেওয়ানপদ গ্রহণ করেন। সেখানে সেবছরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্ব ছাড়াও ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম ও সাহিত্যেও রমেশচন্দ্রের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে তাঁর বিপুল রচনাবলী। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রেরণায় তিনি ছ'টি উপন্যাস রচনা করেন। ভারতের অতীত গৌরবের ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্যে সমকালীন জনচিত্তে জাতীয় আবেগ ও আত্মগরিমা সঞ্চার করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। একই তাগিদে প্রাচীন ভারতের সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের তিনি নতুন মূল্যায়ন করেন তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে।

মননকর্মের বহুবিধ ক্ষেত্রে বিচরণ করলেও ইতিহাসচর্চাই তাঁকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এই মানসিকতার পিছনে ছিল ম্যাক্স মুলারের পরোক্ষ প্রভাব। আই সি-এস শিক্ষার্থীদের কাছে ম্যাক্স মুলার কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলি 'ইণ্ডিয়া: হোয়াট ক্যান ইট টিচ আস্' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ভারতে পাশ্চাত্ত্য ধ্যানধারণা চাপিয়ে না দিয়ে মুক্তমন ও সহানুভূতির সঙ্গে ভারতীয় জীবন ও আদর্শের ধারা অনুশীলন এবং সেজন্যে অবসর সময়ে সংস্কৃত ভাষা শেখার উপদেশ দিয়েছিলেন। পরোক্ষে সেই উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে রমেশচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসাবে বাংলায় 'ঋগ্বেদ' অনুবাদ করেন (১৮৮৫-৮৭)। সেই সময়ে তিনি প্রাচীন ভারতের পূর্ণাঙ্গ একটি ইতিহাসের বিশেষ অভাব অনুভব করতেন;

সেই অভাব পূরণের কাজে নিজেই অগ্রসর হন। সংস্কৃত সাহিত্যেই তিনি প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পান। তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় তাঁর 'এ হিস্ট্রি অফ্ সিভিলাইজেশন ইন এনসিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া' (১৮৮৯-৯০)। প্রায় বছর দশেক পরে লণ্ডন থেকে তাঁর 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ইংরেজি ও বাংলা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে তাঁর মৌলিক চিন্তাভাবনা ও গবেষণামূলক সৃজনশক্তির পরিচয় মেলে।

দেশের সমসাময়িক সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও তার প্রভাব তাঁর রচনাদিতে ফুটে ওঠে। তিনি জাতপাতের বিচার, বাল্যবিবাহ ও পর্দা প্রথার ছিলেন প্রবল বিরোধী। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে প্রাচীন ভারতে একদিকে যেমন নারী সম্প্রদায় পুরুষের সমান মর্যাদা ও স্বাধিকার ভোগ করত, অন্যদিকে সেদিনের সমাজ জাতপাতের ভেদাভেদে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি। 'সংসার' উপন্যাসে তিনি বিধবাবিবাহের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন, অন্যদিকে 'সমাজ' উপন্যাসে তাঁর অসবর্ণ বিবাহের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। অসবর্ণ বিবাহকে তিনি উৎসাহিত করার অভিমত পোষণ করতেন, তাতে দুর্বল ও বিভেদবিচ্ছিন্ন জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে বলে তাঁর ছিল একান্ত বিশ্বাস। বিবাহে সম্মতির বয়স সংক্রান্ত খসড়া আইনের (Age of Consent Bill) পক্ষাপক্ষে আলোচনা ও আন্দোলনের সময় তিনি শাস্ত্রের নানান নজির দেখিয়ে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতায় বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না।

ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য জানালেও তিনি ইংরেজদের বর্ণবৈষম্য নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তেমনি চরমপন্থীদের সঙ্গে যদিও তিনি যুক্ত হন নি, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে ভিক্ষার প্রবৃত্তিতে তাঁর সায় ছিল না। তাঁর ছিল শান্তিপূর্ণ অথচ সংগ্রামী মনোভাব। তাঁর কথায় "Englishmen understand fighting, and they will yield to persistent fighting—not to begging."[২]

দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

বাঙালির সমকালীন মননশীল ধারার একাংশের প্রভাবে রমেশচন্দ্র দৃষ্টবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের অনুশীলন করতে গিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বাক্‌ল্-এর বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করেন। বাক্‌ল্ ছিলেন দৃষ্টবাদের অনুরাগী। ইতিহাসের একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তাগিদে রমেশচন্দ্র কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদী চিন্তা সীমিতভাবে

গ্রহণ করেন। ধর্মকে সামাজিক নিরিখে বিচার করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য; তাই তিনি কোঁৎ-এর তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত দৃষ্টবাদের সাহায্য নেন। অবশ্য দৃষ্টবাদকে তিনি পুরোপুরি মেনে নেন নি। ভারতীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্যে যতটা প্রয়োজন, দৃষ্টবাদকে তিনি ততটাই গ্রহণ করেন। ভারতীয় বস্তুবাদ তথা চার্বাক দর্শনকে তিনি "হিন্দু দৃষ্টবাদ" বলে অভিহিত করেন।[৩]

ইতিহাস ও ধর্মের বৈজ্ঞানিক এবং কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণ থেকে ক্রমে সরে এসে তিনি আধ্যাত্মিক মনোভঙ্গিকে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধর্মই জাতীয় মানসের পুষ্টিকারক তথা জাতীয় জীবনের প্রাণসঞ্চারী। যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিচারের পরিবর্তে তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় যে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের রহস্য মানুষের মননশীলতা অথবা বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত হবে না। কারণ মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব উন্নত একটি প্রাণীমাত্র নয়, দেহস্থ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা মস্ত ভুল। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ধর্মই হচ্ছে সদয়, নিঃস্বার্থ ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ তথা নৈতিকতার উৎস।[৪]

রমেশচন্দ্রের মানসিকতায় ব্রাহ্ম সমাজের ঔপনিষদ ধারার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। উক্ত ধারায় হিন্দু ধর্মের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যানের সঙ্গে যুগপৎ সমাজ সংস্কারের প্রয়াস ছিল স্পষ্ট। কিন্তু তিনি কোনো সংস্কারকামী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হন নি। সনাতন ধারার সঙ্গে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ও দেশের সমাজসংস্কার প্রয়াসে তিনি স্বাধীনভাবে অগ্রসর হন।

ইতিহাসচিন্তা

রমেশচন্দ্র ইতিহাসকে শুধু কালপ্রবাহের অতীত সম্পর্কে কৌতূহল নিবৃত্তির উৎস হিসাবে দেখেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে বর্তমান কালের প্রয়োজন মেটাতেও ইতিহাসচর্চার বিশেষ গুরুত্ব আছে। অতীতের বিভিন্ন ভাবান্দোলনের পর্যালোচনা এবং ঐতিহাসিক কার্যকারণের পশ্চাতে বিদ্যমান শক্তি-সমূহের বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমান কালের নায়কেরা ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে সমর্থ হন। কোনো দেশের প্রাচীন ইতিহাসের জ্ঞান উত্তরকালের ভাবান্দোলনে উৎসাহ সঞ্চার করে এবং জাতির অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করে। অতীতের কাজ হল বর্তমানকে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ করা আর বর্তমানের কাজ হল অতীতকে সবিস্তারে জানা।[৫]

বিশ্ব-ইতিহাসকে সাতটি-পর্যায়ে "উন্নতির যুগ" হিসাবে বিন্যাস ও বিশ্লেষণ সূত্রে তিনি বলেন—

কেবল যুদ্ধবর্ণনা ও সম্রাটদিগের নামাবলী প্রকৃত ইতিহাস নহে।… প্রত্যেক পাঁচ কি ছয় কি আট শতাব্দীর পর এক একটি বিশেষ উন্নতির যুগে মনুষ্যসমাজের উন্নতি…আলোচনা করিলে মনুষ্যসমাজের উন্নতির সমস্ত ইতিহাস বুঝিতে পারা যায়।[৬]

বঙ্গদেশের যথার্থ একটি ইতিহাসের অভাব এবং ইতিহাস লেখার উপযোগী তথ্য ও উপকরণ যে দুর্লভ সেকথা তিনি অনুভব করেন। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেও বিভিন্ন কালপর্বে সেদেশের আচারানুষ্ঠান ও চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়। কাজেই লিখিত ইতিহাস পাওয়া না গেলেও প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে মননের বিকাশ, সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও পর্যায়ক্রমে বিকশিত সভ্যতার নির্ভুল চিত্র পাওয়া যায়। 'দ্য লিটরিচার অফ্ বেঙ্গল' (১৮৭৭) বইটির রচনাসূত্রে তিনি তাই মন্তব্য করেন: "to trace as far as possible the history of the people, as reflected in the literature of Bengal."। বইটিতে তিনি বঙ্গদেশের তিনটি যুগ চিহ্নিত করেছেন। প্রথম যুগ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক অবধি বিস্তৃত—যুগটি ছিল জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের। দ্বিতীয় যুগ ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য থেকে যথাক্রমে রঘুনাথ শিরোমণি, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সময় অবধি বিস্তৃত। আর উনিশ শতকের শুরু থেকে, অর্থাৎ রামমোহন, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম প্রমুখের সময় অবধি তৃতীয় বা আধুনিক যুগ বিস্তৃত।

দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জাতীয় আবেগের পরিপুষ্টির তাগিদে রমেশচন্দ্র হিন্দু অতীতের গরিমা তুলে ধরার প্রয়াসী হন। বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদিতে তিনি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে প্রাচীনকালে হিন্দুরা সর্বাপেক্ষা উন্নত ছিল। সেই সময়ে ইউরোপীয়ানরা ছিল আদিম জীবনযাত্রায় আবদ্ধ। তারা তখন গুহায় বাস করত এবং যাযাবরের জীবন যাপন করত। হিন্দু গরিমাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্যে তিনি বলেন যে শৌর্যবীর্যেও হিন্দুরা ছিল যথেষ্ট উন্নত। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও ঐশ্বর্যে উন্নত থাকার ফলে বিভিন্ন সময়ে ভারতভূমিতে বহিরাগত অনেক জাতি সামরিক অভিযানে প্রবৃত্ত হয়। মুসলিম বিজয়ের পর থেকে হিন্দুদের সেই ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করে। বর্তমানে যদিও হীনবীর্য, কিন্তু অতীতে বাঙালি জাতির অনুরূপ সামরিক দক্ষতা ছিল বলে তাঁর স্থিরবিশ্বাস দেখা যায়।[৭]

রমেশচন্দ্র দেখাতে চেষ্টা করেন যে প্রাচীনকালে হিন্দুরা কি পরিমাণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অগ্রসর ছিল। মনুর অনুশাসন তথা হিন্দুর

আচারানুষ্ঠানের পশ্চাতে তিনি দৃষ্টবাদী ব্যঞ্জনা আরোপ করেন। বৌদ্ধধর্মের অন্তর্নিহিত মানবতন্ত্রী আবেদন এবং উদারতন্ত্রী রীতিনীতির প্রাধান্য দেখা যায়। দৃষ্টিবাদী মনোভঙ্গিতে তিনি সামাজিক বিধিব্যবস্থার পিছনে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির ক্রিয়া লক্ষ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রগতি হল মানবমনের অগ্রগতি তথা মানবধর্মের সারবত্তা। এবং সেটা বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ।[৮]

ভারতীয় ইতিহাসের বৈদিক যুগকে (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-১৪০০) তিনি স্বর্ণযুগ হিসাবে অভিহিত করেন। সেই সময়ে উত্তর ভারতে আর্যদের আগমন ঘটে। তাঁর মতে সে-সময়ে ভারতীয় সমাজে পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য কিংবা বর্ণবিভেদ দেখা দেয় নি। মন্দির বলে কিছু ছিল না, তেমনি ছিল না মূর্তিপূজার প্রচলন। পূজাপার্বণ থাকত পরিবার ও গৃহেই সীমাবদ্ধ। গোমাংস আহার ও সমুদ্রযাত্রা সেদিনের সমাজে নিষিদ্ধ ছিল না। বৈদিক ঋষিরা যেমন স্তোত্র রচনা করতেন, তেমনি প্রয়োজনে যুদ্ধযাত্রায় ও কৃষিকর্মেও তাঁদের অংশ নিতে দেখা যেত।[৯]

রমেশচন্দ্রের বিশ্লেষণ অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে আর্যরা গাঙ্গেয় সমভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে ও বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। সময়টা তাঁর মতে তখন রামায়ণের যুগ। পুরোহিত ও যোদ্ধৃসম্প্রদায়ের উত্থান ও আধিপত্য দেখা দেয়। অচিরে বৈশ্য সম্প্রদায় দেখা দিলেও পেশাগত জাতিভেদ তখনও মাথা চাড়া দেয় নি। ভিন্ন জলবায়ুতে আর্যদের ক্ষয়িষ্ণু কর্মশক্তি ও কায়েমি স্বার্থের পুরোহিত সম্প্রদায়ের উত্থানের পিছনে রমেশচন্দ্রকে বাকলের বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। আর্যদের মধ্যে থেকে উদ্ভূত বৈশ্যরা সব ধরনের সুবিধা ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। কিন্তু শূদ্র বর্ণে পরিগণিত দেশের আদিবাসীরা অন্ত্যজ বলে গণ্য হয়।[১০]

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন পর্বের তৃতীয় পর্যায়কে (খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৩০০) রমেশচন্দ্র যুক্তিবাদী কাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে হিন্দু ইতিহাসের এই পর্বটি সর্বোত্তম। এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ঘটে। বুদ্ধের সার্বজনীন ও মানবতাবাদী আবেদনের গুণগ্রাহী হলেও তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূত্র সমুদয়কে সুষ্ঠু ও কার্যকর বলে বেশি গুরুত্ব দেন।

অশোকের সাম্রাজ্যবিস্তার ও কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় রমেশচন্দ্রের বিভাগ অনুযায়ী প্রাচীন ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায়। গাঙ্গেয় সমভূমিতে বসবাসের পর থেকে বৈদিক জীবনযাত্রার অবক্ষয় সূচিত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে তেমনি মঠ ও বিহার স্থাপনের মধ্যে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিস্তার ও বুদ্ধের উপাসনাসূত্রে বৌদ্ধধর্মের অবনতি দেখা দেয়। তাঁর মতে ভারতে তখন বর্ণাশ্রম প্রথা ছিল সীমিত। শাস্ত্রচর্চায় যাজক সম্প্রদায়ের মৌরসিস্বত্ব

তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বৈশ্য হিসাবে বিবেচিত কামার, কুমোর, বৈদ্য, স্বর্ণকার, তন্তুবায়দের তখন আর্যদের সাহিত্য ও শাস্ত্র আলোচনায় সমান মর্যাদা ও অধিকার ছিল।[১১]

প্রাচীন হিন্দু ইতিহাসের পঞ্চম ও শেষ পর্যায়কে তিনি পৌরাণিক যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫00 থেকে ১000 খ্রীষ্টাব্দ) হিসাবে অভিহিত করেন। সেইসময়ে শিল্প ও সাহিত্যের উৎকর্ষের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাবল্য দেখা দেয়। এইসূত্রে তিনি ভারত ও ইউরোপের সমকালীন ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে ভারত ও ইউরোপের প্রাচীন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমূহ নতুন শক্তির উত্থান ও পরাক্রমে ভেঙে পড়ে। ইউরোপে জার্মান ও ভারতে রাজপুত শক্তির উত্থান ঘটেছিল। উভয়কেই নবোত্থিত মুসলিম শক্তির সম্মুখীন হতে হয়। ইউরোপ তার স্বাধিকার রক্ষা করে, কিন্তু সংগ্রাম করেও ভারতে হিন্দুশক্তি পরাভূত হয়। ভারতীয় শক্তির পরাজয়ের পিছনে রমেশচন্দ্রের দৃষ্টিতে বর্ণবিভেদ ছিল প্রধান কারণ। মুসলিম বিজয়ের দরুন আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলার ফলে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বৃদ্ধি পায় ও হিন্দুসমাজে বর্ণবিভেদ প্রকট হয়ে পড়ে।[১২]

তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মোগল আমলের পরবর্তীকালের অরাজকতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ভারতীয়রা আইন, নিরাপত্তা ও শান্তির তাগিদে ইংরেজদের স্বাগত জানায়। ইংরেজ সরকার বহুবিধ দোষত্রুটির মধ্যেও দেশবাসীর কাছে সততা ও উপকারিতার পরিচয় দেয়। তাঁর মতে—

> The history of British conquests is the history of popular support, which has never wavered in the cause of a civilized administration.[১৩]

তাঁর মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অনুকূলে জোরালো জনসমর্থনের মূলে কাজ করেছে পরিশীলিত প্রশাসনব্যবস্থা। সেটাই লোকের সহানুভূতি ও সহযোগিতা অর্জনে সাহায্য করে। ইংল্যান্ডের উন্নয়ন ভারতের উন্নয়নকে উদ্দীপিত করে। ইউরোপে নানাবিধ সংস্কার আন্দোলন ইংরেজ প্রশাসিত ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় প্রভাব বিস্তার করে।

সমাজতত্ত্ব

রমেশচন্দ্র সমকালীন নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের গবেষণা-পদ্ধতি অনুসারে সামাজিক আচারবিচারের উৎপত্তি ও বিকাশের পিছনে মানুষের আদিম জীবনের ধারা খোঁজার চেষ্টা করেন। নৃতাত্ত্বিকদের মতে সামাজিক বিবর্তন আদিম কাল

থেকে একটি একরৈখিক (unilinear) উন্নয়নের ধারা বেয়ে আজকের পরিশীলিত অবস্থায় উপনীত। তিনি তিনটি বিষয়, যথা বিবাহ, ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে উক্ত পদ্ধতি তিনটি প্রয়োগ করেন। তিনি লিখেছেন যে যখন আমরা আদিম বর্বরদের জীবনের দিকে তাকাই এবং আমাদের চোখের সামনে থেকে যেন একটা মোটা পর্দা সরে যায়, তখন দেখি পূর্বপুরুষদের চালচলন ও রীতিনীতি। সুদূর অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ, আমাদের সভ্যতা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও আচারবিচারের বিবর্তন যেন আমাদের মানসনেত্রে ভেসে ওঠে।[১৪]

প্রাচীন সভ্যতায় বিবাহরীতির তিনটি পর্যায় তিনি লক্ষ করেছিলেন। বোর্নিও-র দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন যে সেখানে একটি উপজাতির সবাইকে বিবাহিত বলে ধরে নেওয়া হত এবং সন্তানসন্ততিদের সমগ্র উপজাতির সন্তান বলে গণ্য করা হত। উপজাতি ক্রমে পরিবারে বিভক্ত হয় এবং পারিবারিক সম্পত্তির সঙ্গে স্ত্রীলোকদের পৃথক করা শুরু হয়। স্ত্রীলোকেরা কেনাবেচা কিংবা যুদ্ধ-জয়ের মধ্যে দিয়ে অধিকৃত হত। বিবাহের তৃতীয় পর্যায়ে সভ্যতার অগ্রগতির ফলে স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের উপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়; জীবনের রীতি-নীতিকে রমণীয় করে তোলে এবং অবিচ্ছেদ্য সঙ্গিনীতে পরিণত হয়। মহাভারতের কালেও এই উপজাতিগত বিবাহের প্রচলন ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন যে মনুস্মৃতিতে স্ত্রীলোক পুরুষের কেনা অথবা জয় করা সম্পত্তির মতো বিবেচিত। এই বিশ্লেষণে প্রাচীন বিশ্বের সকল জাতিকেই তিনি সমগোত্রে বিচার করেন। সংস্কৃতিও অনুরূপভাবে বিশ্বের সর্বত্র একই ছাঁদে গড়ে ওঠে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৫]

ধর্মকে রমেশচন্দ্র মানুষেরই চিন্তন ও মননের ফসল হিসাবে দেখেছিলেন। তাঁর মতে সমাজ ও সভ্যতার প্রতিটি স্তরে ধর্ম মানুষের মননক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। ধর্মের বিবর্তনকে তিনি তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রথমটিতে তিনি দেখিয়েছেন যে আদিমকালে প্রকৃতির যা-কিছু তার জীবনের সঙ্গে জড়িত তার উপর মানুষ আধিভৌতিক শক্তি আরোপ করে। কারণ বিপদসঙ্কুল জীবনে আদিম মানুষ মনে করত যে অশুভ কোনো শক্তি দ্বারা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রিত। এবিষয়ে দার্শনিক কোঁৎ মনে করতেন যে আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল যে জীব ও জড়জগতের মধ্যে একটা সমন্বিত শক্তি আছে। সেই কারণে নৈসর্গিক শক্তি সমূহকে তারা প্রণতি জানাত। অনুরূপ দৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র আদিম আধিভৌতিক ধারায় কল্পিত ভুত ও অশরীরি আত্মা উত্তরকালে দেব-দেবীতে পরিণত হয় বলে মন্তব্য করেছেন। এই অনুমানের বিস্তারিত কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।[১৬]

ধর্মীয় বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি দেখিয়েছেন যে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে মানুষ অনেক পরিমাণে স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার আস্বাদ পায় এবং তাতে মানুষ নৈসর্গিক পরিবেশে শুভ ও অশুভ শক্তির যুগপৎ অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তৃতীয় পর্যায়ে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সমাজ আরও সুসংবদ্ধ হয়ে ওঠে। রাজা, শাসনকর্তা অথবা কোনো বীরের উত্থানের মধ্যে দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় অধিকর্তা উদ্ভূত হয়। দৈব বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি পরম সত্তা কল্পনায় রূপ পরিগ্রহ করে। ক্রমে একটি দেবতার স্থানে বহুদেবতার রূপ কল্পিত হয়। তাঁর মতে আর্যরা উপাস্য দেবদেবীকে শুভশক্তির উৎসজ্ঞান করে। উপনিষদের কালে সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্ম ও দর্শনচর্চার মধ্যে দিয়ে এদেশের লোকেরা নানারকম নৈসর্গিক শক্তির মধ্যে একটি সমন্বিত রূপ উপলব্ধির চেষ্টা করে। রমেশচন্দ্রের মতে সাধারণ মানুষ বহু দেবদেবীর উপাসনা করে, কিন্তু মননশীল শিক্ষিতজনেরা একেশ্বরে আস্থাবান।[১৭]

এবিষয়ে তাঁর দ্বিমত ছিল না যে আর্য হিন্দুরা বহির্ভারত থেকে এদেশে এসে বসবাস শুরু করে। আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ইউরোপ। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে দিয়ে দেখা যায় যে ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন জাতের মধ্যে একই রক্ত প্রবহমান। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে তিনি উইলিয়াম হাণ্টারের অভিমতকে সম্প্রসারিত করে বলেন যে বাঙালিরা প্রধানত বঙ্গদেশের আদিম অনার্য অধিবাসীদের বংশোদ্ভূত। কালক্রমে বঙ্গের অধিবাসীরা হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম অনুযায়ী বাঙালিরা ক্রমে উচ্চ ও নিম্নবর্ণে বিন্যস্ত হয়। বঙ্গদেশের উপজাতিদেব ধারা অনুযায়ী পূর্বতন পূজারীরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করে। নব্যহিন্দু সমাজও সেটা মেনে নেয়। অনুরূপভাবে জনসাধারণের একাংশ যারা সামরিক ও রাজকীয় কাজে যুক্ত ছিল তারা ক্ষত্রিয় বর্ণে পরিণত হয়। সমাজের অন্যান্য স্তরের অধিবাসীরা সংশ্লিষ্ট এক-একটি হিন্দু সম্প্রদায়ে নিজেদের গোত্রীভূত করে। যে তাঁত বুনত সে তন্তুবায় কিংবা মাটির পাত্র তৈরি যার জীবিকা সে কুম্ভকার জাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। আদিম উপজাতিরা এক-একটি নিম্নবর্ণের জাতি সৃষ্টি করে। গ্রামাঞ্চলে রমেশচন্দ্র হিন্দু ও আধাহিন্দু উপজাতিদের স্বতন্ত্র ধারা প্রত্যক্ষ করেন। নিম্নবর্ণের লোকেরা অমিতব্যয়ী, উচ্ছৃঙ্খল ও নিষিদ্ধ পানাহারে আসক্ত। তারা গ্রামের একান্তে বসবাস করে। তাই তিনি লক্ষ করেন যে আদিম উপজাতিরা বিভিন্ন বর্ণে বিন্যস্ত এবং তাদের হিন্দুধর্ম গ্রহণ, হিন্দু দেবদেবীর উপাসনা ও আচার বিচার সমান নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। আদিম ও লৌকিক দেবদেবী হিন্দু ধারায় উপাস্য হিসাবে স্থান পায়।[১৮]

উপজাতি হিন্দু সমাজের কিছু কিছু বিষয় রমেশচন্দ্রের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। যেমন তাদের মেয়েদের পাশ্চাত্ত্যের মতো স্বাধীন ও সাবলীল জীবন। হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের জীবন যেমন ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ, উপজাতি মেয়েরা সেদিক থেকে মুক্ত। রমেশচন্দ্র নতুন বর্ণবিভাগের একটি যুক্তিবহ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। চারটি প্রচলিত বর্ণের অন্তর্ভুক্ত লোকেদের বিবাহসূত্রে বহুবিধ জাতির উদ্ভব ঘটে। পক্ষান্তরে তাঁর মতে আদিম অধিবাসীদের হিন্দুধর্মে পরিমিশ্রণের ফলে নানাধরনের জাতপাত গড়ে ওঠে।[১৯]

সভ্যতা সম্পর্কে রমেশচন্দ্র তুলনামূলক নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে বাকলের অভিমতকে সম্প্রসারিত করেন। সেই দৃষ্টিতে সভ্যতার অগ্রগতি মূলত প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ ভুপ্রকৃতি ও জলবায়ু সারা বিশ্বের সমুদয় সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাকলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে রমেশচন্দ্র বাঙালির চরিত্রগঠনের পশ্চাতে যে পরিস্থিতি কাজ করে তার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াসী হন। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লোকের জড়তা ও দুর্বলতার পিছনে তিনি দেখেছিলেন প্রতিকূল জলবায়ু। উষ্ণ ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং লোকে চাউলভোজী হবার দরুন শরীরের পুষ্টি হয় বটে কিন্তু শক্তিবৃদ্ধি হয় না। জমির উর্বরতার ফলে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ লোকের চিন্তার অতীত। ফলে লোকের আত্মনির্ভরতা দেখা দেয় না, মন কুসংস্কারের দিকে ঝোঁকে। বাকলের মনোভঙ্গি অনুসরণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জমির উর্বরতার জন্যে বঙ্গদেশে সভ্যতার উদ্ভব ঘটলেও সেই অনুকূল পরিবেশ পক্ষান্তরে স্বনির্ভরতা ও প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্যে প্রয়োজনীয় উদ্যমকে খর্ব করে।[২০]

তিনি অনুভব করেন যে মানুষ প্রকৃতির কাছে পরাভূত হলেও, প্রকৃতি মানুষের প্রতি সদাই নির্দয় নয় এবং অনুকূলই বেশি। ফলে মানুষ প্রকৃতিকে জয় না করে তার উপর চিরকাল নির্ভরশীল থেকেছে। মাঝে মাঝে প্রকৃতি রুষ্ট হলে এদেশের মানুষ ত্রস্ত ও অসহায় হয়ে পড়ে। লোকের প্রতিরোধ শক্তি নেই যেটা ইউরোপীয়দের মধ্যে দেখা যায়। সেখানে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে লোকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে ও প্রগতির পথে অগ্রসর হয়।[২১]

বঙ্গদেশের ইতিহাসে তিনি উল্লিখিত লক্ষণ দেখতে পান। শত শত বছর ধরে বঙ্গদেশের মানুষ একদিকে প্রকৃতির কাছে পরাভূত, অন্যদিকে বহিরাগত বিভিন্ন জাতির কাছেও পদানত হয়েছে। চোখের সামনে গৃহ ও ধনসম্পত্তি ভস্মীভূত কিংবা লুণ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা বিশেষ দেখা যায় নি। ম্যালেরিয়া রোগের মতো বর্গীর হাঙ্গামা ভয় ও কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ঘরে ঘরে দেবদেবীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। শত শত বছর ধরে

বাঙালিরা উৎপীড়ন সহ্য করে এসেছে। প্রতিরোধের চিন্তা তাদের জাগে নি। এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়েছে বিভিন্ন শক্তিধরেরা— কখনও সুবেদার, কখনও জমিদার, আবার কখনও বা গোমস্তা কিংবা পুলিশের লোকেরা।[২২]

বাঙালির পশ্চাৎপদতার কারণ হিসাবে তিনি দেখেছিলেন শত শত বছর ধরে উৎপীড়িত লোকের প্রতিরোধশক্তির অবক্ষয়। ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার অভাব বাঙালিকে হীনবীর্য করে তোলে। এই চিন্তাসূত্রে তিনি ইতিহাস সম্পর্কে নির্দেশ্যবাদী হয়ে বলেন ইতিহাসের কার্যকারণ পূর্বনির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্তে তিনি নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেন নি। এখানেও তিনি বাক্‌লের বক্তব্যকে অনুসরণ করেন। এই বিষয়ে বাক্‌লের বক্তব্য ছিল যে ইউরোপীয় সভ্যতায় যখন বোঝা যায় যে প্রকৃতিকে কিভাবে মানুষের অধীনে আনা সম্ভব তখন থেকে প্রাকৃতিক বিধানের পরিবর্তে উন্নত মননশীলতা সভ্যতার গতিপ্রকৃতির নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির শক্তি সীমিত। কিন্তু মানুষের চিন্তন ও মননের উন্নয়ন ও বিকাশের সম্ভাবনা অসীম। এখানেই রমেশচন্দ্র বাঙালির মুক্তির পথ খুঁজে পান। উন্নতির তিনি তিনটি পথের নিশানা দেখান। প্রথমত কাজ ও চিন্তার স্বাধীনতা, যেবিষয়ে শাসকেরা নিজেরাই সক্রিয়। দ্বিতীয়ত সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং তৃতীয়ত শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতার মানোন্নয়ন ও চেতনাসম্পন্ন জনমত গঠন।[২৩]

রাজনৈতিক চিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

ইংল্যাণ্ডের ছাত্রজীবন থেকেই রমেশচন্দ্র সেখানকার লিবার‍্যাল দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষাবধি সেই আদর্শে তাঁর অনুরাগ অক্ষুণ্ণ থাকে। ১৮৬৮ সালে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নির্বাচনব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মনোভঙ্গি গড়ে ওঠে। নির্বাচন সংক্রান্ত নতুন আইনে (১৮৬৭) ইংল্যাণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও দক্ষ শ্রমিকেরা ভোটাধিকার পেয়েছিল। গ্ল্যাডস্টোনের নেতৃত্বে লিবার‍্যাল দল প্রথম ক্ষমতায় আসে। সাধারণ মানুষ ভোটাধিকারের মাধ্যমে কিভাবে সরকার গঠন ও নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হয় এবং তাদের প্রশাসন সম্পর্কে চেতনা দেখে তিনি উপলব্ধি করেন যে: "improvements emanate from the people, for the people are the Government."[২৪]

জনমতের গুরুত্ব দেখে তাঁর এই বিশ্বাস জন্মায় যে জনমতের কাছে রাজশক্তি, রাজন্যবর্গ ও সাধারণ প্রতিনিধিরাও নতি স্বীকার করতে বাধ্য। তাঁর

দৃষ্টিতে জনগণের মতামতই যথার্থ আদর্শ সরকারের উপকার সাধন করে। ভারতের ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে যেসব অঞ্চলে প্রশাসন ব্যবস্থা নির্মল সেখানকার জনমত সদাই জাগ্রত ও সবল। ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন যে, প্রভাবশালী রাজনৈতিক সংগঠনকে মর্যাদা দেওয়া ও তাদের বক্তব্য প্রণিধান করা সমীচীন, জনসমক্ষে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার প্রবণতা সরকারের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না।[২৫]

জনমতের উপর যথার্থ গণতন্ত্র নির্ভর করে। তাই তিনি বিভিন্ন সময়ে জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এদেশের মানুষ পশ্চিমী উন্নত মানের নৈতিক মূল্যবোধ আয়ত্তের সুযোগ পায়। সেই মূল্যবোধ চেতনাসম্পন্ন জনমত গঠনের সহায়ক। লোকের নৈতিক মান বজায় রাখার জন্যে জনমতের প্রতি সরকারের মর্যাদাপ্রদর্শন একান্তই কাম্য। কিন্তু এদেশে জনমত গঠন অভিজাত ও মধ্যবিত্ত বা এককথায় যাকে ভদ্রলোক শ্রেণী বলে তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শহরে শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিরা এবং গ্রামাঞ্চলে জমিদারেরা জনমত তৈরি করে। জমিদারদের শক্তিশালী সংগঠন ও সংবাদপত্র থাকায় তারা নিজেদের দোষ ঢাকতেই ব্যস্ত। তারা নেতৃত্ববিহীন মূক রায়তকেই যাবতীয় বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করে।[২৬]

লখনৌ কংগ্রেসে (১৮৯৯) সভাপতির ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন যে উনিশ শতকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সরকার জনগণের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে জনগণের জন্য পরিচালনের যে ব্যবস্থা অনুসৃত হয় তা পরিণামে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। কারণ তাঁর মতে—

> it is an immutable law of nature that you cannot permanently secure the welfare of a people, if you tie up the hands of the people themselves.[২৭]

তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ভারতে সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণের সুযোগদান দেশবাসীর সামনে উন্নতির একটিই মাত্র সম্ভাব্য পথ; সেই পথে ভারতীয়রা অগ্রসর হবার বিশেষ সুযোগ পায় নি; বছরগুলি তাই তাদের দুর্বিপাক, দুর্ভোগ আর আতঙ্কে কাটে। তিনি উল্লেখ করেন যে অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক সংস্কারচিন্তা ও কথাবার্তা অপরাধ বলে বিবেচিত হত। ব্যক্তিস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮৩২ সালে শাসনসংস্কার শুরু হয়। সেই ধারায় এদেশেও জনগণের প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি না করে আপসে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন ইংরেজ সরকারের একটি কর্তব্য বলে তিনি মন্তব্য করেন।[২৮]

রমেশচন্দ্র যদিও চাইতেন ইংরেজ সরকারের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে,

সেইসঙ্গে তিনি এটাও চাইতেন যে যথার্থ সমালোচনার মাধ্যমে জনসাধারণের মনোভাব ও চাহিদার কথা সরকারের গোচরে আনতে ; আর সরকারেরও উচিত জনমত নির্ণয় করা। দ্বিতীয়ত তিনি চাইতেন জনগণের অভাব-অভিযোগ নির্ণয়ের সঙ্গে প্রতিকার হিসাবে শাসনক্ষমতায় যথোচিত জনপ্রতিনিধিত্ব। প্রশাসনে পূর্ণ ক্ষমতার দাবি না করলেও তিনি দাবি করেন শাসনক্ষমতায় দেশবাসীর পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রতিনিধিত্ব। স্বায়ত্তশাসনে দেশবাসীর অধিকার মেনে নিয়ে তাদের নিজ ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দিলে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রবর্তিত হলে দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সন্তোষ বিরাজ করবে।[২৯]

তাঁর দৃষ্টিতে ইংরেজ আমলে ভারতে যেসব রাজনৈতিক মূল্যবোধ সঞ্চারিত হয় তার অন্যতম হল পশ্চিমী ধাঁচে মানব অধিকার বিষয়টির প্রতিষ্ঠা। তাতে অপরিবর্তনীয় কোনো প্রথার স্থান নেই যদি সে-প্রথা কালক্রমে একটি সর্বগ্রাহ্য অধিকারে পরিণত না হয়ে থাকে। আইনের শাসনে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদার, রায়ত ও এমন কি সরকারেরও অধিকার ও দায়িত্ব আইনের শাসনে সুচিহ্নিত। পূর্বতন ধারায় শক্তিধর ব্যক্তিরা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিত। তিনি তাই চাইতেন নতুন বিচারব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার বজায় রাখার উপযোগী নানা স্তরে আদালতের ব্যবস্থা।[৩০]

তবে নিছক আইন পাশ করে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মানোন্নতি যে সম্ভব নয়, সেকথাও তিনি অনুভব করতেন। বাঞ্ছিত কোনো পরিবর্তনের দাবি জনগণের মধ্যে থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত হওয়া উচিত। বাক্‌লের অভিমত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে বিগত শতকে স্পেনে জনস্বার্থের অনুকূল উদারনৈতিক আইন প্রবর্তন সত্ত্বেও সেখানকার জনজীবনে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। কারণ লোকের মানসিক প্রস্তুতি ছিল না। আইনসভায় বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে যাঁরা লোকচরিত্র পরিবর্তনের ধারণা পোষণ করেন তাঁদের সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, জাতিগত চরিত্রগঠনের অন্তরালে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর কথায়—

> The wisest and best legislation will not make us a free nation, like the free nations of Western Europe. The spirit of freedom and self-reliance is wanting in us ; such spirit may emanate from within, but can never be imparted by legislation.[৩১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইংল্যাণ্ডের আইনকানুনের অন্ধ অনুকরণে তাঁর আদৌ সায় ছিল না। সেখানকার আইনকানুন সর্বরোগহর বলে যাঁদের ধারণা তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেন যে এদেশের পরিস্থিতি ও পরিবেশ ইংল্যাণ্ডের

সমতুল নয়। ওদেশে যে ব্যবস্থা কার্যকর সেটা এদেশে ভিন্ন রূপ নিতে পারে। দেশের মাটি অনুযায়ী বিধিব্যবস্থা রচিত না হলে শিব গড়তে বাঁদর তৈরি হবে। আইনকানুন সাময়িক উপকারে আসতে পারে; কিন্তু শক্তিহীনকে শক্তিবান করতে পারে না।[৩২]

তাঁর মতে পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাস হল জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাস। আর এশিয়াবাসীদের প্রকৃতি হল রাজা, রাজপ্রতিনিধি ও জমিদার শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ। সময় বিশেষে জাতীয় স্বাধীনতা থাকলেও সেটা ছিল এক-একটি গোষ্ঠীতন্ত্র; ব্যক্তি সেখানে নগণ্য। ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা ছিল অজ্ঞাত ও অস্বীকৃত। নেশান হিসাবে দেশ স্বাধীন হলেও সাধারণ মানুষ ছিল স্বৈরতন্ত্রী উৎপীড়নে শৃঙ্খলিত।

স্বভাবতই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে একটা দাসত্বের পরিবেশ বিরাজ করত। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে শীতপ্রধান দেশে শ্রমিকদের উৎপাদন কম হলেও জীবনধারণের জন্যে উৎপন্ন সামগ্রীর অনেকাংশের অধিকার তারা ভোগ করত। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হবার সুযোগ ছিল অনেক কম, ব্যক্তিমানুষের অধিকার ও গুরুত্ব সমাজে স্বীকৃতি পেত। ফলত রাজনৈতিক স্বাধিকার সে সব দেশে ছিল সংরক্ষিত। তাছাড়া সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে ব্যক্তিস্বাধীনতা দৃঢ়মূল ছিল। পক্ষান্তরে এশিয়ায় দাসত্বের ধারায় ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা সংকুচিত, ফলে উৎপীড়নের অবকাশ বিস্তর।[৩৩]

তিনি মনে করতেন যে ভারতে ইংরেজ শাসনসূত্রে লোকে কাজ ও চিন্তার স্বাধিকার পায়, তাতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা দানা বাঁধে। তাঁর মতে ইংরেজ শাসনের সুফল হল শ্রমিকের নিরাপত্তা বিধান। পূর্বতন মুসলিম শাসনকালে নিরাপত্তার অভাবে লোকের উদ্যম ও দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বিঘ্নিত হত। তাই জন স্টুয়ার্ট মিলের একটি বক্তব্যের উদ্ধৃতি ও সেটিকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে, শিল্পোদ্যম ও মিতব্যয়িতা সম্ভব নয় যদি উৎপাদক বা শ্রমিকেরা ভোগের সুযোগ না পায়। নিরাপত্তার সম্ভাবনাদৃষ্টে উক্ত গুণাবলী মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ইংরেজ শাসনে সেই নিরাপত্তাবোধ গড়ে ওঠায় লোকের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও বাণিজ্যের উদ্যম বৃদ্ধি পাচ্ছে।[৩৪]

রায়তের জীবনে বিচারব্যবস্থার উপকারিতা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র পূর্বতন গ্রামীণ সমাজে পঞ্চায়েত প্রথার বিপুল প্রভাবের উল্লেখ ও প্রশংসা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে আগেকার কালে পঞ্চায়েতগুলির কাজ ছিল স্থানীয় বিবাদবিরোধের নিষ্পত্তি সাধন। ইংরেজ আমলে পঞ্চায়েত প্রথা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আগেকার কালে পঞ্চায়েত গঠিত হত গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে। বিবাদ-বিসংবাদের খুঁটিনাটি তাঁদের নখদর্পণে থাকত। জনপ্রিয় ও

নেতৃস্থানীয় লোকেদের উপস্থিতিতে এবং বিচারবিতর্কের পরিশেষে সর্বসমক্ষে মামলার রায় ঘোষণা ছিল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রীতি।

পঞ্চায়েত প্রথার কার্যকারিতা উপলব্ধি করে রমেশচন্দ্র উক্ত প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তাতে প্রতি গ্রামে বছরে অন্যূন বারজন ব্যক্তিকে নিয়ে একটি করে পঞ্চায়েত গঠনের প্রস্তাব থাকে। ছোটখাট মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হবে সেগুলির কাজ। উচ্চতর আদালত পঞ্চায়েতের রায় মেনে নেবে যদি আইনবিরোধী কোনো কারণ না থাকে। তিনি চাইতেন ইংরেজ প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থার অর্থহীন নিয়মকানুনের অবসান। পঞ্চায়েত প্রথার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজকে প্রশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করাও ছিল তাঁর অন্যতম সুপারিশ। লোকের মনেও সুবিচারের প্রতি আস্থা ও অনুরাগ এবং নিজ গ্রামের প্রশাসনে ও প্রতিনিধি নির্বাচনে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের অবকাশ মিলবে।[৩৫]

বিচার ব্যবস্থাকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার নীতি ও দাবিকে তিনি সমর্থন জানান। কারণ তা না হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। চিন্তা ও বাকস্বাধীনতাকেও তিনি যথোচিত গুরুত্ব দিতেন।

আর্থনীতিক চিন্তা

বহুবিধ বিষয়ে মৌল চিন্তাভাবনার মধ্যে ভারতের অর্থনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে রমেশচন্দ্রের অবদান অসামান্য। তাঁর বিপুল রচনাবলীর মধ্যে 'দ্য পেজান্ট্রি অফ বেঙ্গল' (১৮৭৪), 'ফেমিনস ইন ইণ্ডিয়া' (১৯০০), 'দ্য ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া' (১৯০২), 'ইণ্ডিয়া ইন দ্য ভিকটোরিয়ান এজ : অ্যান ইকনমিক হিস্ট্রি অফ দ্য পিপল' (১৯০৪) ছাড়াও ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লেখা বিস্তর প্রবন্ধ, চিঠি ইত্যাদি আজও উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের আকৃষ্ট করে।

তিনি অবশ্য অর্থনৈতিক তত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ প্রবেশ করেন নি। সমকালীন ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারবিশ্লেষণসূত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে অর্থনৈতিক তত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। তবে একথা স্মর্তব্য যে আঠার ও উনিশ শতকে ইংরেজ প্রশাসনকালে ভারতীয় অর্থনীতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিচারবিশ্লেষণের সূত্রপাত করেন। অর্থনৈতিক চিন্তায় যেসব বিষয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন সেগুলি ছিল জমির ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব, ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, শুল্কের পরিমাণ ও সঙ্গতি নিরূপণ, অযথা সরকারি ব্যয় নিবারণ— বিশেষ করে ভারতের প্রয়োজন ও স্বার্থানুসারী না হলে ব্যয়হ্রাসের সুপারিশ এবং ভারত ও

ইংল্যান্ডের পারস্পরিক আর্থিক দায়দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ। তাঁর লেখনীতে ভারতের দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও রায়তের করুণ জীবনের কথা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে।

'পেজ্যান্ট্রি অফ বেঙ্গল' বইটি প্রকাশের (১৮৭৪) আগে নদীয়া ও পাবনায় নীল বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। বইটিতে অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে জমিদার ও রায়তের বিরোধের বিষয়টি তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেন। রায়ত শ্রেণীর প্রতিভূ না হলেও, বইটিতে রায়তের অনুকূলে রমেশচন্দ্রের দরদী মনোভঙ্গি ফুটে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন যে বঙ্গদেশে জমিদারি প্রথা জলবায়ু ও জাতীয় চরিত্রসূত্রে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত। ব্রিটিশ শাসনের আগে দেশের ভূমিব্যবস্থা আরও উন্নত ও রায়তের স্বার্থের অনুকূল ছিল। আগে রায়ত অবশ্য অসহায় ও জমিদারদের উপর নির্ভরশীল থাকলেও তারা নানাবিধ অধিকার ভোগ করত। তখন তাদের অবস্থা পরবর্তী ইংরেজ আমলের চেয়ে ভাল ছিল।[৩৬]

অনুগত রাজকর্মচারি রমেশচন্দ্রের লেখনীতে কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র মনোভাব ফুটে ওঠে। আগে যেসব জমিদার কেবল খাজনা আদায় করত তারা কর্নওয়ালিসের বিধানে ভূমির মালিকানা পেয়ে যায়। তাই তিনি খেদ প্রকাশ করেন যে ভূমির মালিকানা রায়তের উপর না বর্তিয়ে তাদের চিরদিনের উৎপীড়কদের উপর গিয়ে পড়ে। একটি উর্বর দেশের বিরাট রাজস্বের উৎস চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়; চাষবাসের প্রসার ঘটলেও চাষীর ভাগ্য ফেরে নি, বরঞ্চ পরিশ্রমজীবী এক শ্রেণীর সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দরিদ্র মানুষের প্রতি চরম অবহেলায় তিনি ব্যথিত হয়ে পড়েন। তাই নদীয়ায় নীল বিদ্রোহ এবং পাবনা ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ তাঁর চোখে একটি সময়োচিত শুভলক্ষণ হিসাবে দেখা দেয়। বাঙালি রায়তের সেই নবচেতনাকে তিনি স্বাগত জানান।[৩৭]

রায়তের স্থায়ী কল্যাণবিধানের উপায় হিসাবে তিনি যে-জমি তারা চাষ করে তার মালিকানা অথবা রাজস্বের নির্দিষ্ট হারে দীর্ঘমেয়াদী ইজারা বা পত্তনি দেবার প্রস্তাব রাখেন। তাঁর মতে শত শত বছরের উৎপীড়নের অবসান ঘটিয়ে জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধনই ছিল ভাল। অবশ্য একজন সংস্কারবাদী হিসাবে ঐ প্রথাকে সহসা রদ করে দেওয়াও তাঁর কাছে বাস্তবানুগ বলে মনে হয় নি। কারণ প্রথাটির পিছনে ছিল দীর্ঘকালের নানা অভ্যাস ও সামাজিক ধারা। সেজন্য তিনি কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত আইনের পরিবর্তে লর্ড ক্যানিংয়ের শাসন সংস্কারসূত্রে (১৮৫৯ সালের দশ আইন) ভূমিব্যবস্থার

একটি বিকল্প পরিকল্পনা পেশ করেন। তিন শ্রেণীর রায়তের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর যেসব রায়ত হাল আমলে অল্প পরিমাণ জমির অধিকার পেয়েছিল তাদের কখনই যাতে উচ্ছেদ করা না হয় এবং তাদের খাজনা যাতে না বাড়ে সেই মর্মে গুরুত্ব দিয়ে তিনি প্রস্তাবটি রচনা করেছিলেন।[৩৮]

১৮৯৭ সালের নিদারুণ দুর্ভিক্ষ এবং বছর দুয়েক পরে দুর্ভিক্ষের আবার উপক্রম দেখে তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। ১৭৭০ সাল থেকে উনিশ শতকের শেষাবধি ভারতে যতগুলি দুর্ভিক্ষ ঘটে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ লর্ড কার্জনকে লেখা তাঁর পাঁচটি খোলা চিঠি 'ফেমিনস ইন ইণ্ডিয়া' (১৯০০) নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে (১৮৯৯) সভাপতির ভাষণে তিনি দুর্ভিক্ষের বিষয়টি সবিস্তারে তুলে ধরেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কিংবা লোকের মিতব্যয়িতার অভাবকে তিনি দুর্ভিক্ষের কারণ হিসাবে দেখেন নি। তাঁর হিসাব অনুযায়ী উনিশ শতকের শেষ চল্লিশ বছরে ভারতে দশবার দুর্ভিক্ষ হয়, দুঃসহ দারিদ্র্য ছাড়াও অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার আগে যুদ্ধ, দেশজয়, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে দেশের জনসংখ্যার বড় একটা অংশ নিঃশেষ হয়ে যেত। ইংরেজ শাসনে দেশে শান্তি স্থাপিত হয়। সামান্য একজন কৃষকও জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা লাভ করে।[৩৯] প্রচলিত ধারণা যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক যাবতীয় অন্তরায় অপসারিত হওয়ায় জন্মহার বেড়ে গেছে এবং জন্মসংখ্যা অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় দারিদ্র্য ও অনাহার অনিবার্য হয়ে পড়েছে। এই ধারণা খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি ম্যালথাসের জনতত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগকে অর্থহীন বলে মন্তব্য করেন। ম্যালথাসের তত্ত্ব অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ না করলে দারিদ্র্য, অকালমৃত্যু, মহামারী ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির প্রতিশোধ প্রকাশ পায়।[৪০]

উল্লিখিত প্রসঙ্গে তিনি মনে করতেন যে ভারতে সারা বছর স্বাভাবিক অবস্থাতেই দুঃখ ও দারিদ্র্যের ফলে মৃত্যু ঘটে এবং সেটা দুর্ভিক্ষের সময়েই সীমাবদ্ধ নয়। জীবনভোর দারিদ্র্য এবং মৃত্যুর ব্যাপকতা বিত্তহীন মানুষের জীবনে এমনই স্বাভাবিক ব্যাপার যে তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো অবকাশ থাকে না। কাজেই খাদ্যাভাব জনিত কারণটা বড় নয়। দুর্ভিক্ষের ফলে জনসংখ্যা যতটা কমে যায়, স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়ে যায়। নদীর পাড় ভাঙাগড়ার মতো চলে বটে, তবে বছর কয়েকের মধ্যে সমস্যাটা প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে দুর্ভিক্ষ যদি রোধ করা যায় এবং প্রতি বছরেই খাদ্যশস্যের যোগান সমান থাকে তাহলে জনসংখ্যার এই হ্রাসবৃদ্ধির

অবসান হবে। দারিদ্র্য ও মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রিত হলে জনসংখ্যা আনুপাতিক হারে সীমিত থাকবে।

তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিবাহ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যম লোকের নেই। সুদিন ও দুর্দিনের মধ্যে পার্থক্যটা তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন। জনসংখ্যার নবজাত যে অংশ মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়, দুর্ভিক্ষের পরে সেই সংখ্যা শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জনে বৃদ্ধি পায়। দুর্ভিক্ষ না হলে দারিদ্র্য, অনাহার ও মৃত্যুর হার স্বাভাবিক থাকে, জনসংখ্যা উক্ত হারে বৃদ্ধি পায় না। সেজন্যে যে স্বচ্ছলতা দেখা দেয় সেটা সাময়িক এবং পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সময়ে মৃত্যুহার যথারীতি বাড়ে। তাঁর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্থায়ী নিষ্পত্তির একমাত্র পথ হল স্বাভাবিক সময়ে দারিদ্র্য ও মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা।[৫১]

দেশে বারংবার দুর্ভিক্ষের প্রতিকার হিসাবে রমেশচন্দ্র ভূমিকর হ্রাস, ব্যাপক সেচ ব্যবস্থা ও ভারত থেকে টাকা রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেন। সেচ বাবদ ব্যয়বাহুল্যের যদি প্রয়োজন ঘটে সেটা খরা ও দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার দিক থেকে নগণ্য। সেচের জন্যে কর কিংবা রাজস্ব ধার্য করলে খরচের টাকা উঠে আসবে। বঙ্গদেশে সেচ ব্যবস্থার সুবিধাযুক্ত নির্বাচিত কিছু এলাকার জন্যে দীর্ঘমেয়াদী এক পরিকল্পনা তিনি পেশ করেন।[৫২]

দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে বঙ্গদেশে গঙ্গার উপকূল ধরে বিভিন্নস্থানে শস্যভাণ্ডার স্থাপনও ছিল তাঁর অন্যতম সুপারিশ। প্রতিরক্ষার জন্যে সেনাবাহিনী রাখতে সরকার যে বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয় করে সেই অনুপাতে দেশের আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা হিসাবে জনদরদী সরকারের কাছে প্রস্তাবিত শস্য-ভাণ্ডার স্থাপন ও পরিচালনের ব্যয় তাঁর মতে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। মহামারীর কবল থেকে দেশ রক্ষার সরকারি দায়িত্বের প্রশ্নটিকেও তিনি তুলে ধরেন। ডিসপেনসারি স্থাপন ও রিলিফ দানের সরকারি প্রচেষ্টার প্রশংসা করে তিনি দাবি জানান যে রোগ ও মহামারীর উৎপত্তি যাতে নিয়ন্ত্রিত হয় তার সুচারু ব্যবস্থা গৃহীত হোক।

ইংরেজ আমলে লোকের দারিদ্র্য কি পরিমাণে ও কি কারণে বৃদ্ধি পায় তারও একটি তথ্যবহুল চিত্র তিনি তুলে ধরেন। তিনি দেখান যে ভারত একসময়ে কেবল বৃহৎ একটি শস্যপ্রসু দেশই শুধু ছিল না, বহুবিধ শিল্পেও সমৃদ্ধ ছিল। ইংরেজদের স্বার্থান্ধতায় ভারতীয় শিল্প বিশেষ করে রেশম ও সুতিবস্ত্রের শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ভারত কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে।[৫৩] দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের প্রদত্ত কর ও রাজস্বের অর্থে এশিয়া, আফ্রিকা ও এমন কি ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার ও সামরিক অভিযান বাবদ ব্যয়নির্বাহ করা হয়।

এইসূত্রে তিনি যে-বিষয়ে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেটি হল ভারতে নির্বাহিত ব্যয়বাবদ ইংল্যান্ডের পাওনা হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থের নিষ্কাশন যেটি economic drain হিসাবে সুবিদিত। ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে ব্যবসাবাণিজ্য করার চার্টার নবীকরণের সময়ে স্থির হয় যে অতঃপর কোম্পানি ব্যবসাবাণিজ্য থেকে বিরত থাকবে। ভারতে ব্যয়বাবদ অর্থ ফেরত ও লগ্নীকৃত মূলধনের লভ্যাংশ পরিশোধ ভারতের উপর বর্তাবে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানির অস্তিত্ব যখন চলে যায় তখন তার মূলধন ও অন্যান্য পাওনা অর্থ ঋণ করে মেটানো হয়। সেটাকেই বলা হয় ভারতের জাতীয় ঋণ। বছরে বছরে ভারতকে তার রাজস্ব ও রপ্তানীর অর্থ থেকে সেই ঋণের সুদ যোগাতে হত। বস্তুত ক্লাইভের আমল থেকেই বঙ্গদেশের রাজস্বের একাংশ ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হত। ভারতীয় অর্থভাণ্ডার থেকে এই আর্থিক নিষ্কাশনের বিরুদ্ধে দাদাভাই নৌরজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তার অনেক আগে জর্জ টমসন, জন শোর, মাদ্রাজ সরকারের সদস্য জন সুলিভ্যান প্রমুখ ইংরেজ সিভিলিয়ানরা ভারতের উপর এই ঋণ আরোপের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।[১৪]

ইংরেজ শাসনের পত্তনকাল থেকে উনিশ শতকের শেষাবধি কাল পর্যন্ত এক বিবরণে রমেশচন্দ্র দেখান যে ভারত সরকারের অর্থভাণ্ডারে চিরকাল উদ্বৃত্ত দেখা যেত। কিন্তু ইংল্যাণ্ডকে প্রদেয় জাতীয় ঋণ ও সুদ পরিশোধ করতে ভারতের অর্থভাণ্ডারে ঘাটতি দেখা দিত। এছাড়াও প্রশাসনের উচ্চপদে ভারতীয়দের পরিবর্তে ইংরেজদের নিয়োগের ফলেও প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিষ্কাশিত হয়ে যায়। ভারতের রাজস্ব যার বেশিটা আসত কৃষিভূমি থেকে তারও একটা মোটা অংশ এই ঋণ মেটাতে চলে যেত। রাজস্ব দিতে রায়তের উৎপন্ন ফসলের অনেকাংশ তার বেচে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। দুর্ভিক্ষের সময়েও খাদ্যশস্য রপ্তানী থাকত অব্যাহত।[১৫]

বঙ্গদেশের সমকালীন গ্রামীণ অর্থনীতিতে মহাজনদের ভূমিকার প্রসঙ্গ রমেশচন্দ্রের আলোচনায় বিশেষ স্থান পায়। তিনি দেখান যে বঙ্গের রায়তেরা মুসলিম আমল থেকেই জীবনযাত্রায় আদৌ মিতব্যয়ী ছিল না। মূলত নিরাপত্তার অভাব এবং দারিদ্র্যের তাড়নায় লোকের সঞ্চয়বোধ ছিল ক্ষীণ। সেই কারণে তাদের জীবন মহাজনদের উপর নির্ভর করত। চড়া হারে সুদ সমেত ঋণ পরিশোধ করতে রায়তের দুর্গতির পরিসীমা ছিল না। রায়ত ছাড়াও জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি উচ্চবর্গের লোকে বহু সময়ে মহাজনদের মুখাপেক্ষী থাকত। আইনের সাহায্যে মহাজনদের সুদী কারবার নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস নিষ্ফল

হবে বলে তিনি মনে করতেন। স্বল্পসুদহারে সুদ অথবা ধানের বিনিময়ে সরকারের উচিত ঋণ দেবার সুব্যবস্থার পত্তন।[৪৬]

কৃষির উপর বেশি দৃষ্টি দিলেও দেশে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনকে তিনি সমান গুরুত্বদান করেন। বেনারসে অনুষ্ঠিত প্রথম শিল্প সম্মেলনে (১৯০৫) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে কৃষির উন্নয়নের পরিপূরক হল ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন। একদা শিল্পে উন্নত ভারত কিভাবে একটি কাঁচা মাল রপ্তানীকারী দেশে পরিণত হয়েছে সেকথার তিনি উল্লেখ করেন। ভারতে শিল্পোন্নয়নের তিনটি প্রতিবন্ধকতা তাঁর চোখে পড়ে—

> ১. আধুনিক শিল্পের প্রযুক্তিগত ক্রিয়াকৌশলের অভাব, ২. দেশের শুল্কব্যবস্থায় দেশবাসীর নিয়ন্ত্রণের অধিকার না থাকা এবং ৩. পুঁজির অভাব।

শেষোক্ত বিষয়ে অর্থাৎ দেশবাসীর সঞ্চয় প্রবণতার অনুকূল পরিস্থিতির অভাবে ভারতীয়দের শিল্পোদ্যমে মূলধনের অভাব এক মস্ত বাধা। আর শুল্কব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে না থাকার ফলে বিদেশী ব্যবসায়ীদের স্বার্থে আমদানি শুল্ক রদ করে রপ্তানী শুল্ক বাড়ানো হয়। তাই তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার যাতে দেশের উদ্যম ও অনুকূলে আধুনিক কলকারখানা গড়ে ওঠে। তাতে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রশস্ত হবে। গ্রামাঞ্চলে কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবনে তুলো ও পাট চাষীর সঙ্গে তাঁতীরও অন্নসমস্যা মিটবে।[৪৭]

ইংল্যাণ্ডে এক বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদের সমকালীন চরিত্র বিশ্লেষণসূত্রে তিনি বলেন—

> It is an age of imperialism we live in; all over Europe there is the unending struggle for material interest, for conquests, annexations, extension of markets increase of profits.[৪৮]

বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তারের বেপরোয়া মনোভাব তখন ইংল্যাণ্ডের খুবই প্রবল। নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য, প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য দেশের সঙ্গে বৈরিতা ও পদানত দেশগুলিতে অন্যায় আচরণের তীব্রতা তিনি অনুভব করেন। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ভারতের মতো উপনিবেশের প্রশাসনে বলপ্রয়োগ ও দমনমূলক আইনের আশ্রয় নিতে হয়। রাজনৈতিক দাপট ও শুল্কনীতির সাহায্যে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির একাধিপত্য চলে। সেই শোষণ ও নিপীড়নের গোড়ায় প্রকারান্তরে আঘাত হেনে দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্যে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হন।

শিক্ষা চিন্তা

ইংল্যাণ্ডে থাকার সময়ে উদারনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবে রমেশচন্দ্র অনুভব করেন যে স্বদেশের দুঃখমোচন ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের মুক্তির অন্যতম পথ হল শিক্ষার বিস্তার। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের পশ্চাৎপদতার অবসান সম্ভব। গ্রামীণ জীবনের দুর্গতি, জমিদার ও গোমস্তার উৎপীড়ন এবং ম্যালেরিয়া ব্যাধিতে গ্রামবাসীদের উৎসাদন ঘোচাবার অন্যান্য বিধিব্যবস্থার সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষাবিস্তারের প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর জর্জ ক্যাম্বেল পরিকল্পিত গ্রামীণ পাঠশালা শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্যমকে সমর্থন করে তিনি বলেন—

> Knowledge is power and nowhere is power more needed than among the villages of Bengal.[৭৯]

প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণের ব্যাপারে তিনি যে চিরাচরিত সমস্যাটি প্রত্যক্ষ করেন সেটা হল বিদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠানোতে গ্রামীণ অধিবাসীদের অনাগ্রহ। কারণ ছেলেদের চাষবাসের কাজে সহায়তা কিংবা রেশম ও নীলের কারখানায় তখন তাদের কাজে লাগানো হত। গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনকেই লোকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখত। তাহলেও শিক্ষার উপকারিতা অনুভব করলে গ্রামের লোকেরা নিজেদের স্বার্থেই ছেলেদের বিদ্যালয়ে পাঠাবে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর দ্বিতীয় আশঙ্কা ছিল ছেলেরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের পারিবারিক পেশার পরিবর্তে উচ্চতর জীবিকার সন্ধান করবে। কিন্তু সেখানে এমনিতেই প্রচণ্ড বেকার সমস্যা, কর্মসংস্থান না হলে তাদের মনে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য দেখা দেবে। তাঁর মতে সবাই শিক্ষার সুযোগ পেলে এই বৈষম্যের অবকাশ থাকবে না। তাছাড়া কেবল অক্ষরজ্ঞান সম্বল করে শহরে গিয়ে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হওয়া দুষ্কর।

একথাও তিনি অনুভব করেছিলেন যে গ্রামে শিক্ষার প্রসারকে জমিদার ও শিক্ষিত ভদ্রলোক সম্প্রদায় সুনজরে দেখে না। কারণ তাতে গোমস্তাদের হাতে রায়ত ও গ্রামবাসীদের প্রতারণার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে অল্প বেতনে গোমস্তা নিয়োগও চলবে না। সেই কারণে জমিদার পক্ষ থেকে প্রবল বাধা দেখা দেয়। তিনি লক্ষ করেন যে উচ্চ শিক্ষা পেয়ে লোকে ছোটে চাকরির সন্ধানে, সেখানে যদিও বেতনের পরিমাণ অল্প। তাছাড়া সব ধরনের চাকরির ক্ষেত্রই সংকুচিত। তাই তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিকল্প কর্মসংস্থান হিসাবে শিল্প ও কৃষিকর্মে যুক্ত হবার পরামর্শ দেন।

১৮৭০ সালে উচ্চশিক্ষার খাতে সরকারি অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়। রমেশচন্দ্র মন্তব্য করেন যে উচ্চশিক্ষা তথা ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন সংকুচিত

করার সরকারি সিদ্ধান্ত আত্মঘাতিতার সামিল। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিরাই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণে উদ্যোগী হয়েছে। সরকারি অনুদানে তাঁরা যেসব বিদ্যালয় স্থাপন করেন সেখানে মাতৃভাষার উন্নয়ন ঘটে। ইংরেজি ভাষার চর্চা অব্যাহত থাকলে এদেশের ভাষা ও সাহিত্য উন্নত হবে। তিনি এদেশের যুবকদের বিলেতে পাঠাতে চাইতেন যাতে তারা সেখানে সাম্য ও স্বাধীনতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতে পারে। কিন্তু সেখানকার সবকিছুকে নির্বিচারে অনুকরণের প্রবণতাকে তিনি নিন্দা করেন। ইংরেজি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে স্বদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নই ছিল তাঁর কাম্য।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে রমেশচন্দ্র আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কৃষিকর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তিনি চাইতেন একদল শিক্ষিত কৃষক যারা কৃষিকর্মে বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রণালী প্রয়োগে সক্ষম হবে। শিক্ষিত কৃষকেরা নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত সার, সেচ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির সাহায্যে ভূমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে। কৃষকেরা বারংবার দুর্ভিক্ষের কবল থেকে দেশকে রক্ষার কাজে সহায়ক হবে। অনাবৃষ্টির সময়ে সেচের সুব্যবস্থার কাজ একমাত্র উপযোগী শিক্ষার সাহায্যেই সম্ভব। শিক্ষিত লোকেরা নিভৃত গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লে তাঁদের সংস্পর্শে গ্রামবাসীরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন জীবনধারণ পদ্ধতি, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও কর্মকৌশল আয়ত্তের সঙ্গে নিজেদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের অভিলাষী হবে। সবচেয়ে বড় কথা শিক্ষিত মানুষের সংযোগে কৃষকেরা পুলিশ, জমিদার প্রভৃতি চিরাচরিত নিপীড়কদের হাত থেকে আত্মরক্ষায় সক্ষম হবে।[৫০]

উপসংহার

দেশ ও বিদেশের জনসমক্ষে ভারতমহিমা তুলে ধরার প্রয়াস যাঁদের সার্থকতা লাভ করে তাঁদের মধ্যে রমেশচন্দ্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁর এই প্রয়াসকে উদ্দীপিত করেছিল একদিকে দেশের পরাধীনতার গ্লানি, আর অন্যদিকে দেশের পূর্বতন ঐতিহ্যের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার তাগিদ, যাতে দেশ সার্বিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে।

বিলেতে ছাত্রাবস্থা থেকেই সেখানকার সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির প্রতি তাঁর যে অনুরাগ গড়ে উঠেছিল, তারই সংমিশ্রণে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় আদর্শের নবরূপায়ণ এবং নব মূল্যবোধে দেশের আধুনিকীকরণ। ইংল্যাণ্ডের বিদগ্ধ জনচিত্তে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবগতি সৃষ্টির

সঙ্গে যুগপৎ এদেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্গতির অবসানের জন্যে জনমত গঠনই ছিল তাঁর লক্ষ্য। প্রচেষ্টা ছিল তাঁর সম্পূর্ণ একক ও নিজস্ব। পিছনে কোনো সুস্পষ্ট মতাদর্শ কিংবা সংগঠন ছিল না। তিনি নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণী, সম্প্রদায় কিংবা প্রদেশের প্রতিভূ হন নি। তবে সারা দেশের দরিদ্র গ্রামবাসী ও রায়তের দুঃসহ জীবনপ্রসঙ্গ তাঁর লেখায় প্রাধান্য পায়। তাঁর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে যাবতীয় সমস্যার বাস্তবানুগ উপলব্ধির সঙ্গে কার্যকর সমাধানের পথ খোঁজা। তাই তাঁর প্রবণতা ছিল তথ্যাদির পূর্ণ ব্যবহার।

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের পিছনে তাঁর ধর্মীয় আবেগের পরিবর্তে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নসাধনই ছিল প্রধান। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও চেষ্টা করেন শাস্ত্রের নজিরে জাতিভেদ, কুসংস্কার ও নানান অচল প্রথার অবসান। সমকালীন বাংলার সমাজ সংস্কার প্রয়াস তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি ছিলেন মূলত একজন যুক্তিবাদী ও আধুনিক মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তি।

হিন্দুধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্নের অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। শাস্ত্রের সাহায্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি বেদকেই প্রামাণ্য বলে তুলে ধরেন। বৈদিক আমলে নারীর সমানাধিকার ছিল, এবং সমুদ্রযাত্রা, অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল না সেসব কথা তিনি প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী হন। যাবতীয় শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ বেদোত্তর কালে প্রক্ষিপ্ত হয় বলে তিনি মনে করতেন।

তাঁর রচনাবলী থেকে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি দেশের হিন্দুসমাজকেই তাঁর পাঠক বা শ্রোতৃমণ্ডলী হিসাবে সামনে রেখেছেন। তাঁর ইতিহাসচিন্তায় একদিকে প্রাচীন হিন্দু-ভারত ও অন্যদিকে আধুনিক ব্রিটিশ-ভারত যে পরিমাণে স্থান পেয়েছে সেই অনুপাতে তাঁর আলোচনায় মুসলমান আমলের স্থান খুব অল্প। ভারতীয় সমাজের অবনতির জন্যে তিনি মুসলিম শাসনের সমালোচনা করেছেন, তবে হিন্দু জাতিভেদ প্রথা তাঁর দৃষ্টিতে ছিল বেশি দায়ী। সামাজিক সাম্যের সমর্থক হিসাবে হিন্দুদের জাতিভেদ ও শূদ্রদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের ফলে তারা যে ক্রমে বৌদ্ধ, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে সেটা তাঁর মতে ছিল স্বাভাবিক ও সঙ্গত। আকবরের গুণগ্রাহী হলেও শিবাজীর মুসলমান বিরোধটাই তাঁর লেখায় প্রাধান্য পায়। মুসলমান আমলের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা সূত্রেই কেবল দেখা যায়। অর্থাৎ মুসলমানেরা বাহিরাগত হলেও কালক্রমে তারা ভারতীয় নেশানেই একীভূত হয়ে যায়। ইংরেজদের মতো এদেশকে শোষণ করে মুসলিম শাসকেরা এদেশের সম্পদ অন্যদেশে পাঠাত না।

রমেশচন্দ্রের লেখায় কিছু কিছু স্ববিরোধ চোখে পড়ে। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে আবহমান কাল ধরে শান্তি ও সাম্য বিরাজ করত বলে তিনি লিখেছেন। অথচ জাতিভেদ ও সাম্যের সহাবস্থান সম্ভব নয়। জমিদারদের অত্যাচারের কথা তিনি নানা প্রসঙ্গেই উল্লেখ করেছেন, আবার ইংরেজ শাসনের সমালোচনা-সূত্রে জমিদার শ্রেণীর প্রতি তাঁর সমর্থন ফুটে ওঠে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের সুফল সম্পর্কে তিনি যে উজ্জ্বল চিত্র তুলে ধরেন সেগুলি তাঁর অপরিণত বয়সের রচনা। বয়স বেড়ে যাবার সঙ্গে এবং বিশেষ করে ভারতীয় বলে পদোন্নতি না হওয়ার দরুন সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেবার পরে সরকারের সমালোচনা তাঁর লেখনীতে তীব্র হয়ে ওঠে।

তিনি চাইতেন ভারতের সামাজিক ধারা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে নতুন রাষ্ট্রকাঠামোর প্রবর্তন, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার পৃথকীকরণ, প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্বশাসন, গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পত্তন ইত্যাদি বিধিব্যবস্থা। দাবি আদায়ের ব্যাপারে তিনি মডারেট ধারার নরমপন্থী পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন। নরমপন্থী প্রয়াসের সুফল যে রাতারাতি ফলে না সেবিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। ধীরে চলনীতির মধ্যে দিয়ে ও ইংরেজের ছত্রছায়ায় তিনি চাইতেন প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্বশাসন। জাতীয় স্বাধীনতার কথা না বললেও বিশ্ব পরিস্থিতি যে ক্রমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার ও স্বাধীনতার অভিমুখী এবং ভারতও যে একদিন স্বাধীন বিশ্বসভায় স্থান পাবে সে-আশা তাঁর ছিল। স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্যে তিনি চাইতেন সাম্য ও ঐক্যের মানসিকতা। তবে রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত জানা যায় না।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনকে তিনি অর্থনৈতিক স্বাধিকারের দিক থেকে সমর্থন করেন। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় তাঁর বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে জাতীয় আবেগ ফুটে ওঠে। উল্লেখ্য যে সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বর্ণনায় তাঁর বিচারভঙ্গি ছিল মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সমগোত্রীয়। মার্কসের মতাদর্শ ও মার্কসীয় আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর পরিচয়ের কথা জানা যায় না। অর্থনীতি ও প্রশাসনের ব্যাপারে তিনি ইংরেজ সরকারের যতই সমালোচনা করে থাকুন না কেন, অন্যান্য মডারেট নেতাদের মতো তাঁরও সরকারের প্রতি আনুগত্য থাকায় তাঁর সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য দেখা যায়। তবে তাঁর সময় ও পরিস্থিতির দিক থেকেই তাঁকে দেখা উচিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রমেশচন্দ্রের মননশীলতায় ও কর্মজীবনে শ্রীঅরবিন্দ কোনো মৌলিকতা দেখতে পান নি। তিনি রমেশচন্দ্রের প্রতিভায় রানাডে কিংবা সুরেন্দ্রনাথের সংগঠনশক্তি ও বাগ্মিতার অভাব প্রত্যক্ষ করেন, অর্থনীতি চর্চায় গোখলের সমকক্ষতাও তাঁর ছিল না। ঋগ্বেদ, রামায়ণ ও মহাভারতের

অনুবাদ অথবা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস রচনায় রমেশচন্দ্রের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ একজন সুপটু সাহিত্যিক ও গবেষকের সাক্ষাৎ পান নি। তবে দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে কার্জনকে লেখা রমেশচন্দ্রের পত্রাবলী ও ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস শ্রীঅরবিন্দর দৃষ্টিতে খুবই প্রশংসনীয়। ভারতে ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক ও শুল্কনীতির স্বরূপ রমেশচন্দ্রের লেখার মধ্যে দিয়ে উদ্‌ঘাটনের ফলে বয়কট আন্দোলনে জনসাধারণের মানসিক প্রস্তুতি ঘটে। তার জন্যে শ্রীঅরবিন্দ স্বীকৃতি হিসাবে লিখেছেন যে—

In this one instance it may be said of him that he not only wrote history but created it.[৫১]

বস্তুত মৌলিক পাণ্ডিত্যের কোনো দাবি রমেশচন্দ্রের ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল সরল ও সহজ কথায় ভারতের মননশীল ঐতিহ্যকে নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের সাহায্যে দেশ ও বিদেশের উৎসুক মানুষের কাছে তুলে ধরা। সেদিক থেকে তাঁর প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে সার্থকতা লাভ করে।

উৎস নির্দেশ

১. J. N. Gupta. *Life and work of Romesh Chunder Dutt.* London, 1911, p.394.

২. Quoted in R. C. Dutt. *Romesh Chunder Dutt.* Publication Division, Delhi, 1974, p.170.

৩. Una. "Hindu Philosophy", *Bengal Magazine.* August, 1877.

৪. R. C. Dutt *A history of civilization in ancient India.* V. I, p.198.

৫. Una. "Civilization in ancient India" *Bengal Magazine.* April, 1877.

৬. রমেশচন্দ্র দত্ত : 'প্রবন্ধ সংকলন', ১৯৫৯, পৃ. ৫৭।

৭. Una. *op. cit.*

৮. R. C. Dutt. "Recent investigations into archaic forms of religion", *Calcutta Review.* V. 19, July 1879, p. 11.

৯. R. C. Dutt. *A history of civilization in ancient India.* V. I, p.106.

১০. রমেশচন্দ্র দত্ত : 'প্রবন্ধ সংকলন,' পৃ. ১৯০।

১১. তদেব। পৃ. ৮৭।
১২. R. C. Dutt. *op. cit.* V. 2, p.333.
১৩. Romesh Chunder Dutt. *England and India ; a record of progress during a hundred years* ; 1785-1885. London, 1897. p.117.
১৪. R. C. Dutt. "Modern researches into the origins and early phases of civilization", *Calcutta Review.* 1882, p.132.
১৫. Anon. "Recent investigations into archaic forms of marriage" *Calcutta Review.* V. 68, January 1879, p.57.
১৬. Anon. "Recent investigations into archaic forms of religion", *Calcutta Review.* V. 69, July 1879, p.11.
১৭. *Ibid.* p.7.
১৮. R. C. Dutt. *The peasantry of Bengal.* 1980, p.14.
১৯. R. C. Dutt "The aboriginal element in the population of Bengal", *Calcutta Review.* V. 75, October 1882, p.236.
২০. Arcydae. "The past and future of Bengal", *Bengal Magazine.* January 1883, p. 231.
২১. R. C. Dutt. The *Peasantry of Bengal.* pp. 133-4
২২. *Ibid.*
২৩. Arcydae. *op. cit.*
২৪. R. C. Dutt. *Three years in Europe* (being extracts from letter sent from Europe) By a Hindu. p.14.
২৫. R. C. Dutt. *England and India.* p.123.
২৬. R. C. Dutt. The *Peasantry of Bengal.* pp.62, 137.
২৭. R. C. Dutt. *Speeches and Papers on Indian Questions.* Calcutta, 1902. p.144
২৮. *Ibid.* p.147.
২৯. *Ibid.* p.145.
৩০. R. C. Dutt. The *Peasantry of Bengal.* p. 88.
৩১. *Ibid.* p.139.
৩২. *Ibid.* p. 140.

৩৩. *Ibid.* p.136.
৩৪. *Ibid.* p.137.
৩৫. *Ibid.* pp. 139-140.
৩৬. *Ibid.* pp. 21, 42.
৩৭. *Ibid.* p. 63.
৩৮. *Ibid.* pp. 3, 41.
৩৯. রমেশচন্দ্র দত্ত : 'প্রবন্ধ সংকলন', পৃ.৭৬-৮৫।
৪০. R. C. Dutt. The *Peasantry of Bengal.* p.144.
৪১. *Ibid.* p.145.
৪২. রমেশচন্দ্র দত্ত : 'প্রবন্ধ সংকলন' পৃ.৭৯-৮৫।
৪৩. তদেব। পৃ.৬৬-৭৫।
৪৪. R. C. Dutt. *The Economic History of India* (1757-1837). Publication Division, Delhi, V.1, p.276.
৪৫. *Ibid.*
৪৬. R. C. Dutt. The *Peasantry of Bengal.* pp.96-98.
৪৭. Quoted in Dutt. *Romesh Chunder Dutt.* p.244.
৪৮. Quoted in *Ibid.* p.62.
৪৯. Arcydae. "The village population of Bengal", *Bengal Magazine.* V. 1, November 1872, p.159.
৫০. R. C. Dutt. The *Peasantry of Bengal.* pp.141-3, 176-7.
৫১. Sri Aurobindo. *Bankim-Tilak-Dayananda.* Pondicherry 1970, p.48.

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ॥ ১৮৬৪—১৯৩৮

আধুনিক ভারতের মননজীবনে ব্রজেন্দ্রনাথ একজন অসামান্য ব্যক্তি; অনেকের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন এক চলমান বিশ্বকোষ বিশেষ। ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের বুদ্ধিবিভাসিত আন্দোলনের মনীষীদের মতো তিনিও চাইতেন জ্ঞানরাজ্যের সমস্ত বিষয়ে অবগাহন। প্রসঙ্গত তাঁর দুটি উক্তি স্মরণীয়—"I have taken all knowledge for my province" এবং "I am a man and nothing human is alien to me"[১] বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার বহুবিধ শাখাপ্রশাখার সমন্বিত জ্ঞানের অধিকারী ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থই একজন দর্শনবিদ।

রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্রজেন্দ্রনাথ সরাসরি কখনও যোগ দেন নি বটে, তবে তাঁর চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ দেশনায়কেরা। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের কাছে তিনি ছিলেন একজন বন্ধু ও পরামর্শদাতা। অন্যদিকে দেশবিদেশের দার্শনিক ও পণ্ডিতমহলে তাঁর সম্পর্কে এক ব্যাপক প্রশস্তি দেখা যেত একজন দর্শনগুরু হিসাবে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাইকেল স্যাড্‌লার ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

> May one of his pupils (for pupil I was during the year 1917-19 and shall always revere him as one of my gurus) express in a few words of love and admiration···He was indeed a guide, philoospher and friend to me.[২]

ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম উত্তর কলকাতার হেদুয়া অঞ্চলে। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে পড়ায় ছাত্রজীবন তাঁর আর্থিক দুর্বিপাকে কাটে। পাঠশালার লেখাপড়া সাঙ্গ করে স্থানীয় জেনারল অ্যাসেমব্লিস ইনস্টিটিউশনের বিদ্যালয় ও কলেজে পড়াশোনা করেন। কলেজে পড়ার সময়ে গণিতে তাঁর পারদর্শিতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বি. এ পাশ করার পরে তাঁকে ঐ কলেজের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়। ঘটনাটি নিয়মের ব্যতিক্রম এবং আশ্চর্যেরও বটে। গণিত অথবা দর্শন, কোন্ বিষয়ে তাঁর এম. এ. পড়া উচিত— তাই নিয়ে যখন ব্রজেন্দ্রনাথের শিক্ষকেরা জল্পনাকল্পনায় ব্যস্ত, তখন দেখা যায় তিনি জীববিদ্যা ও নৃতত্ত্বের গভীরে অধ্যয়নে মগ্ন। শেষাবধি ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শনে এম. এ. পড়া শুরু করেন এবং পরীক্ষায় চমকপ্রদ সাফল্য দেখান। এরপর শুরু হয় তাঁর শিক্ষকতার জীবন। প্রথমে কলকাতার সিটি কলেজে, অধ্যাপনার বিষয় কিন্তু ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। পরের বছরে তাঁকে দেখা যায় নাগপুর

মরিস কলেজে, প্রথমে অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষের দায়িত্বে। বছর তিনেক সেখানে কাটিয়ে তিনি চলে আসেন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষপদে (১৮৮৭-৯৭)। এইসময়ে তাঁর মুখ্য কাজ ছিল হেগেলীয় দর্শনের পুনর্মূল্যায়ন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সাহিত্যচর্চায় তিনি সমধিক ব্যস্ত থাকতেন। ইতিমধ্যে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় তাঁর—"দি নিও রোমাণ্টিক মুভমেণ্ট ইন লিটরেচার" নামে একটি প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় (১৮৯০-৯১)। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা-পদ্ধতি ছিল প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্য। সেটি পরে তাঁর 'নিউ এসেস ইন ক্রিটিসিজ্ম' (১৯০৩) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উক্ত প্রবন্ধ ছাড়াও গ্রন্থটির অপর পরিচ্ছেদে 'কীট্স: মাইণ্ড অ্যাণ্ড আর্ট: এ স্টাডি' নামে আর একটি প্রবন্ধ সংযুক্ত হয়। হেগেলের সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রজেন্দ্রনাথ ভারত ও ইউরোপের বিভিন্ন সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেন। বাংলাসাহিত্যে নব্যরোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা সেদিনের প্রেক্ষাপটে ছিল যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ছাত্রজীবন থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের মানসিক প্রবণতা অদ্বৈত বেদান্ত, হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক পরমতত্ত্ব এবং ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আবেগমণ্ডিত ত্রিবিধ ধারায় গঠিত হয়ে ওঠে। ছাত্রজীবনে তাঁর সহপাঠী ছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)। উভয়ে একসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ মানসিক টানাপোড়েনে বিচলিত হয়ে পড়লে বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণ করতেন। তাই রামকৃষ্ণের কাছে নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা ব্রজেন্দ্রনাথকে বিস্ময়াভিভূত করে। তিনি লিখেছেন—

> The Spectacle of a born iconoclast and free thinker like Vivekananda, a creative and dominating intelligence, a tamer of souls himself, caught in the meshes of what appeared to be an uncouth supernatural mysticism was a riddle which my philosophy of Pure Reason could scarcely read at the time.[৩]

ব্রজেন্দ্রনাথের সর্ববিষয়ে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কুচবিহারের মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর আহ্বানে ব্রজেন্দ্রনাথ কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন (১৮৯৭-১৯১২)। ঐ পদে নিযুক্তদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয়। তখন সেখানে এম. এ. ও আইন পড়ানো হত। সেখানকার পাঠক্রমের নানা পরিবর্তন ঘটে ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্যমে। তাঁর কাছে ১৮৯৯ সালে রোমে ওরিয়েণ্টালিস্ট কংগ্রেসে যোগদানের আমন্ত্রণ আসে।

মহারাজার আগ্রহে ব্রজেন্দ্রনাথের রোম কংগ্রেসে যোগ দেবার যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেছিলেন। রোম যাত্রার আগে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর 'বৈষ্ণবইজম্ অ্যান্ড ক্রিসটিয়ানিটি' বইটি লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। বইটির মূল বিষয় ছিল তুলনামূলক দর্শন ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ইতিহাস। মানবমনের ইতিহাস বিশ্লেষণে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে তিনি ত্রুটিপূর্ণ বলে অভিযোগ করেন। হেগেলের ইতিহাসচিন্তা ও স্পেনসারের জৈব বিবর্তনের নিরিখে বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস তাঁর কাছে ভ্রান্ত বলে মনে হয়।

১৯০২ সালে লর্ড কার্জন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যধারা ও শিক্ষাক্রমের মূল্যায়ন ও সংস্কারসাধনের জন্যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। সদস্য হিসাবে ব্রজেন্দ্রনাথ তাতে মনোনীত হন। সেই সময়ে বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথের কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। একই সময়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে সতীশচন্দ্রের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ রামমোহন সম্পর্কে আলোচনার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত করেন। রামমোহনের চিন্তায় বিশ্বজনীন মানবতন্ত্রী আদর্শের এক অভিনব ব্যাখ্যা তিনি তুলে ধরেন। ডন সোসাইটিতে তাঁকে ঘিরে সেই সময়ে এক বিদ্বৎমণ্ডলী গড়ে উঠেছিল।

স্বাস্থ্যের তাগিদে ব্রজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান ১৯০৫ সালে। তখন বহু পণ্ডিত ও মনীষীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। ১৯১১ সালে লণ্ডনে ইউনিভার্সাল রেসেস কংগ্রেস প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। ভাষণে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রদর্শনে তাঁর নানাবিধ মৌলিক চিন্তাভাবনা প্রকাশ পায়। মহারাজার আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ১৯১২ সালে তাঁকে কুচবিহার ছেড়ে চলে আসতে হয়। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপকপদে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক নানা বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে আশুতোষ কাজে লাগিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (স্যাডলার) কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত প্রতিবেদনে ব্রজেন্দ্রনাথের বহু মূল্যবান অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯১৫ সালে লণ্ডন থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের 'দ্য পজিটিভ সায়েন্সেস অফ দ্য এইন্শ্যন্ট্ হিন্দুস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভারতের প্রাচীন দর্শন সমূহে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতি কি পরিমাণে প্রতিফলিত হয় সেটাই ছিল উল্লিখিত বইটির মূল বিষয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের

'হিন্দু কেমিস্ট্রি' গ্রন্থে অনুরূপ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়।

১৯২১ সালে ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনে এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। সেই বছরে মহীশূরের দেওয়ান মীর্জা ইসমাইলের আগ্রহে তিনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে যোগদান করেন এবং তখন থেকে বছর দশেক তাঁর মহীশূরে কাটে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ ছিল। কবিগুরুর আহ্বানে ১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করেন। উৎসবে প্রদত্ত তাঁর সেদিনের ভাষণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান।

মহীশূরের রাজদরবারে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। রাজ্যের সাংবিধানিক সংস্কার ও উন্নতির জন্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেটির সভাপতিপদে ব্রজেন্দ্রনাথ মনোনীত হন। কমিটির প্রতিবেদন 'কনস্টিটিউশনাল ডেভলাপমেণ্ট ইন মাইশোর' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তাতে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহীশূর রাজ্যের আইন সভায় তিনি একজন সদস্য ছিলেন। মহীশূরে থাকতে তাঁর বহুবিধ রচনার একটিতে তিনি দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক ধারার নতুন মূল্যায়ন করেছিলেন। সেইসময়ে লিখিত 'সিলেবাস অফ ইণ্ডিয়ান ফিলজফি' গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের পাঠক্রম ও গবেষণা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ অনেক নতুন বিষয় ও পদ্ধতির সন্ধান দেন। রামমোহনের জীবনদর্শন সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ আজীবনকাল উৎসাহী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা রামমোহন রায়ের জীবনী গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ একটি পরিচ্ছেদ সংযোজন করেন (৩য় সংস্করণ, ১৮৯৭)। ১৯২৪ সালে বাঙ্গালোরে রামমোহন সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর একটি ভাষণ 'রামমোহন দ্য ইউনিভার্সাল ম্যান' নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়ানস-এর উদ্বোধক ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ। বহুভাষাবিদ ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন ধারায় অবগাহনের সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও কাব্যজগতেও সমধিক বিচরণ করতেন। দর্শন ও ইতিহাসে নিজের মৌল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি রূপক কাব্যের আকারে 'দ্য কোয়েস্ট ইট্যারনল' (১৯৩৬) গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থটিকে একটি মহাকাব্য বলা চলে। ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ছ'সাতটির বেশি নয়। অবশ্য পত্রপত্রিকা, প্রতিবেদন প্রভৃতিতে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় নি।

দ র্শ ন চি স্তা র প রি প্রে ক্ষি ত

জীবনের প্রথম দিকে ব্রজেন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক পরব্রহ্মের চিন্তা এবং অদ্বৈত বেদান্তের পরিমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল। অচিরেই তিনি উপলব্ধি করেন যে—

> Hegel's view of historic development as a unilinear series, a position to which his dialectic of the categories commits him, can no longer be maintained.[৭]

তিনি কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদে প্রভাবিত হয়েছিলেন। আগেই আলোচিত হয়েছে যে বাঙালির সমকালীন মননজগতে তখন কোঁৎ-এর ছিল বিশেষ প্রভাব। ব্রজেন্দ্রনাথের পিতা মহেন্দ্রনাথও ছিলেন কোঁৎ-এর অনুরাগী। কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির উপর স্থাপিত। এবং ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

দর্শন ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি মনে করতেন যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন, কিন্তু দার্শনিকেরা বিশেষ করে যাঁরা বিশ্বজনীন হতে চান, তাঁদের সেই স্বাধীনতা নেই। কারণ চূড়ান্ত কোনো দর্শনতত্ত্বে উপনীত হতে গেলে তার ঝুঁকি থাকে বিস্তর। জ্ঞানরাজ্যের তথা বিজ্ঞানজগতের সমন্বিত জ্ঞানের সাহায্যেই কেবল দর্শনতত্ত্বে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কথাটা তিনি নিজের দিকে তাকিয়েই ব্যক্ত করেন, এইজন্যে যে জ্ঞানবিজ্ঞানের নিয়ত প্রসারের ফলে নিজস্ব কোনো দর্শনতত্ত্ব রচনার কাজে তিনি সদাই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাই দার্শনিক চিন্তাভাবনা তাঁর বিশেষ লিপিবদ্ধ হয় নি। দর্শনতত্ত্ব রচনা সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল যে—

> ...there must be in the end scientific generalisations which embrace the whole field of knowledge and reality.[৮]

গবেষণা ও বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথই সম্ভবত প্রথম দেখাতে চেষ্টা করেন যে ভারতের প্রাচীন মনন ও সাধনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রচলন ছিল। 'দ্য পজিটিভ সায়েন্সেস অফ দি এইনশন্ট্ হিন্দুস' (১৯১৫) গ্রন্থে তিনি প্রাকৃতিক রহস্যভেদে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি কোনো অন্ধ স্বাদেশিকতা ও হীনমন্য আবেগকে প্রশ্রয় দেন নি। ন্যায়দর্শনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে তাতে কার্যকারণ বিশ্লেষণে কেবল সূক্ষ্ম যুক্তিজালই বিস্তার করা হয় নি। বরং তাতে আরোহী পদ্ধতিতে (inductive) প্রমাণ, পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছনর প্রয়াস লক্ষ করা যায়। তবে গবেষণা ও আবিষ্কারের তথ্যাদি সেইসময়ে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা

হত না বলে চিন্তার ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য অনুধাবন করা আজকের দিনে অসুবিধাজনক। প্রাচীন ভারতের চিকিৎসা শাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্বের পিছনে যুক্তিশাস্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগপদ্ধতির যে যথেষ্ট প্রচলন ছিল সেকথা 'চরক সংহিতা' কিংবা 'পতঞ্জলির' মহাভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। সাংখ্যদর্শনের ভিতর প্রাকৃতিক বিবর্তনের কল্পিত বর্ণনাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাতে পদার্থবিদ্যার ভিত্তিতে উপনীত বিশ্বতত্ত্বের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৬]

ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের দর্শনকে সমন্বিত করে তিনি একটি synthetic philosophy গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন বলে তাঁর কোনো কোনো অনুরাগী উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার কোনো লিখিত বক্তব্য তিনি রেখে যান নি। 'বৈষ্ণবইজম অ্যান্ড ক্রিসটিয়ানিটি (১৯১২) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র ধারায় সংস্কৃতির পুনর্মূল্যায়ন এবং এক বিশ্বসংস্কৃতির মানসিকতা সৃষ্টির প্রস্তাবনা করেন। ভারতীয় দর্শনের পরব্রহ্ম তত্ত্বেই তিনি বিশ্বসংস্কৃতির ভাবভূমি করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে হিন্দুদের speculative চিন্তার আবেগ, অধিবিদ্যার ক্ষমতা এবং পরব্রহ্মের তত্ত্ব ইউরোপীয় দর্শনের ধমনীতে নতুন রক্তপ্রবাহ ও নিশ্চলতায় গতিসঞ্চার করতে সক্ষম। কারণ তাঁর কথায়—

> The Hindu sees the species in the individual, the essence in the appearance, the intelligence in the intelligible, the ideal in the real. Above all, he has a sense of cosmic unity, which enables him to see the whole in part, and connected with this is the Hindu's supreme gift of unifying thought and life, speculation and practice, philosophy and religion.[৭]

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ব্রজেন্দ্রনাথ শেষাবধি ভারতীয় অতীন্দ্রিয় ভাবধারাকেই আশ্রয় করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ঈশ্বরবিমুক্ত ধর্ম অর্থাৎ ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে মানবতন্ত্রী চিন্তায় উৎসাহী ছিলেন। ব্যক্তিগত অমরত্বের পরিবর্তে মানবজাতির মহান ভবিষ্যৎই ছিল তাঁর কাছে কাম্য। সহসা মানসিক দিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে নিজেই বলেছেন যে একসময়ে তিনি যখন গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েন তখনই তাঁর মনে এক পরিবর্তন সূচিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল এক মানসিক দোটানায় ভোগেন। একদিকে নাস্তিক্যবাদমণ্ডিত অজ্ঞাবাদ, অন্যদিকে আস্তিক্যচিন্তা।

পরিশেষে আস্তিক্যচিন্তাই তাঁর মনকে জয় করে। তার স্বরূপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> My condition at this time had no doubt some deep affinity with the experiences of the mystic and the saint, but it was not on the theistic lines that my spiritual experience developed at the time.[৮]

উক্ত মানসিক পটপরিবর্তনের ফলে ব্রজেন্দ্রনাথের মনে যে নতুন প্রত্যয় দানা বাঁধে তার মর্মকথা হল মানুষের মাঝারে জগৎ এবং জগৎ মাঝারে মানুষের অবস্থিতি। জগৎ ও ঈশ্বর ক্ষুদ্রাকারে মানুষের মধ্যেই নিহিত। এই দৃষ্টিতে মানুষ দূরান্তর থেকে উপনীত কোনো আগন্তুক নয়, কিংবা নিছক প্রকৃতির দাস অথবা ব্যাখ্যাতা মাত্র নয়। বরং মানুষকে বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলা চলে এবং সে মহাবিশ্বের ক্রমিক আত্মপ্রকাশের সর্বশেষ নিদর্শন। এখানে ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর বৈশ্বিক মানবতার মধ্যে একটি অভিনব নৃতাত্ত্বিক ব্যঞ্জনা দেবার চেষ্টা করেছেন, যার পিছনে তাঁর অতীন্দ্রিয় মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের নিরন্তর দুঃখকষ্টে তাঁর মনে জগৎ সম্পর্কে এক নতুন ভাবের উদয় হয়, তিনি সেটাকে স্বয়ং ঈশ্বরের যাতনা বলে উপলব্ধি করেন; বস্তুত সেটা খ্রীষ্টধর্মেরই মর্মকথা। তিনি ভগবানকে দুঃখময়রূপে কল্পনা করেন, যিনি তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের দুঃখের ভাগী ও তাদের বেদনার সাথী।[৯]

ইতিহাসচিন্তা

হেগেলের প্রভাব ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে কাটিয়ে উঠেছিলেন সে-প্রসঙ্গ এর আগের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। হেগেলের প্রভাবাধীনে ইতিহাসকে তিনি দেখতেন বিশ্বচেতনার (universal reason) ক্রমিক উন্মোচনের মাধ্যমে মানবাত্মার মুক্তি হিসাবে। পরে মানসিক পরিবর্তনের ফলে হেগেলের বিশ্ব-বিবর্তনের বিশ্লেষণে তিনি আর সায় দিতে পারেন নি। তাঁর কথায়—

> the Hegelian conceives the history of civilisation as a single line of progress which, in realising the successive stages of the Absolute Idea, flows continuously from one race or nation to another, each representing a single phase of the Absolute, a single moment in the dialectic process. This punctual conception of races and this linear view of development are essentially false.[১০]

ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম, ভারত, চীন ও জাপানের সাংস্কৃতিক বিবর্তন একই সূত্রে গ্রথিত হয় নি. উৎপত্তি ও বিকাশে সেগুলি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। বিশ্বের ইতিহাস ধারা অখণ্ড নয় এবং বিভিন্ন খণ্ড ধারাকে একরৈখিকসূত্রে বিবর্তিত বলে মনে করা ভুল।

অবশ্য উৎপত্তি ও বিকাশ স্বাধীনভাবে হলেও বিভিন্ন দেশের সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ধারার নিচে অন্তঃসলিলা একটি বিশ্বজনীন ফল্গুধারা (emanent world movement) প্রবহমান, যার সঙ্গে সকল ধারাই স্বাধীন আকার ও প্রকারসহ যুক্ত। ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বজনীন সেই যুক্তধারায় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে বলেন, যাতে সেগুলির নিজস্ব প্রকারবৈশিষ্ট্য ও সমন্বয়ী ভাবের পিছনে বিদ্যমান স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রণবিধি সমূহের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সঠিক প্রয়োগ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি বিচ্ছিন্ন ও বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে বিশ্বজনীন মানবতার ঐকতান সৃষ্টির অভিলাষ পোষণ করতেন। গাণিতিকসূত্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সমন্বিত দৃষ্টিতে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে—

> ...history is susceptible of a like treatment, with the aid of statistics, scientific generalisations and philosophic ground principles...to represent not only the entire movement of history, but also the history of particular movements.[১১]

সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে হার্বার্ট স্পেনসারের বিচারপন্থীতকেও ব্রজেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। জীববিজ্ঞানের নিরিখে স্পেনসারের ইতিহাস বিশ্লেষণ তাঁর কাছে অনৈতিহাসিক বলে অনুভূত হয়। বৈচিত্র্যময় জীব ও প্রকৃতিকে একই ছাঁচে ব্যাখ্যার প্রয়াসকে তিনি অতিসরলীকৃত এবং অবাস্তব বলে খণ্ডন করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা 'দা কোয়েস্ট ইট্যারনল' (১৯৩৬) নামে তাঁর একটি রূপক কাব্যগ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে। দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' ও গ্যয়টের 'ফাউস্ত' গ্রন্থের সঙ্গে সেটির সাদৃশ্য দেখা যায়। কল্পনার আশ্রয়ে লেখা হলেও ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের দৃশ্য গ্রন্থটির তিনটি অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে, যথা প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কাল। বিশ্ব ইতিহাসের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সাংকেতিক বিবরণ এবং বিভিন্ন পর্বের কালোপযোগী আদর্শের চিত্র উক্ত চিরন্তনী সন্ধানের তিনটি পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়। পর্বান্তরে আদর্শের উত্তরণ ও রূপান্তরের কার্যকারণ ব্যাখ্যা ব্রজেন্দ্রনাথের ইতিহাস সম্পৃক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় দেয়। কালান্তরে নানা দেশ ও জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে সংগৃহীত উপাদানের সাহায্যে উল্লিখিত তিনটি পর্বের আদর্শ তিনি কল্পনা করেছিলেন।

প্রাচীন পর্বের আদর্শটি কাব্যিক আকারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিশেষ করে ভারত ও গ্রীসের সাংস্কৃতিক ধারার মিশ্রণে রচিত। ভারত ও গ্রীসের মিশ্রিত সাংস্কৃতিক রূপটিকে তিনি বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র হিসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর কল্পিত চিত্রে একজন গ্রীক পুরোহিতকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে দেখা যায়, যিনি দীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ভারতীয় দর্শন, পুরাণ, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছেন। বিশ্বের প্রাচীন সংস্কৃতির অর্ধাঙ্গ গ্রীসের প্রকৃতিবাদ ও বাকি অর্ধাঙ্গ ভারতের সনাতন অতীন্দ্রিয় ভাবধারা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রাচীনকালে যাবতীয় চিরন্তন আবেগের মূলে থাকত রহস্যাবৃত প্রকৃতি কিংবা দিব্যশক্তির অনুভূতি।

মধ্যপর্বে ব্রজেন্দ্রনাথ একজন ভ্রাম্যমাণ বীরযোদ্ধার চরিত্র অঙ্কন করেছেন; তিনি ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিভূ নন; তিনি প্লেটোনিক, সীরিয় ও পারস্যের ম্যাজি সম্প্রদায়ের অতীন্দ্রিয় মানবতন্ত্রী ভাবধারায় সমন্বিত ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। ইসলামের জাতীয়তাবাদী অভ্যুদয় থেকে এনসাইক্লোপিডিস্টদের কাল অবধি একটি যুক্তিবাদী আদর্শ গড়ে ওঠে, সেটি মধ্যযুগের ক্যাথলিক ধারার পরিপন্থী ছিল। চিরন্তনী সন্ধানের মধ্যপর্বের আদর্শ হল যুক্তিবাদী সংস্কৃতি, কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে মধ্যযুগের মূল্যবোধ ও প্রবণতার প্রধান উৎস ছিল বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিবাদ। অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় আপ্তবাক্যের পরিবর্তে মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর সত্যের আদর্শ ছিল মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য।

চিরন্তনী সন্ধানের তৃতীয় অর্থাৎ আধুনিক পর্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনো সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারা ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বসংস্কৃতিতে পরিণত হয় নি। আধুনিক পর্বে উপনীত পূর্বোক্ত ভ্রাম্যমাণ নায়ক একজন ঘরছাড়া যাযাবর। তিনি বিশ্বের ক্রমিক পর্যায়ে উন্মোচিত চিত্রমালা তথা তাবৎ চিন্তাসম্ভারের ইতিহাস বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি উপনিষদের নচিকেতার মতো অমরত্বের সন্ধানী। সময়ের প্রবাহে ও বিবর্তনের ধারায় প্রকৃতি আপন ছন্দে এগিয়ে চলে, আর মানবমন খোঁজে মুক্তির পথ। মুক্তি পায় পরিবার, গীর্জা, বিদ্যালয়, রাষ্ট্র ইত্যাদির মাধ্যমে। কবির কল্পনা প্রাচীন গ্রীসের ক্ষীয়মান সভ্যতার আবরণে আচ্ছাদিত রোম সাম্রাজ্যের রক্তক্ষয়ী আধিপত্য অতিক্রম করে বাস্তিল দুর্গ পতনের কালে উপস্থিত হয়। রক্তঝরা ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং শিল্পবিপ্লবের পথে মানবজীবনের সাবলীলতা ফুটে ওঠে। কিন্তু মানুষের মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সন্ধান অব্যাহত থাকে, কারণ মানুষ শোষিত, নিপীড়িত ও শৃঙ্খলিত।[১২]

রা ষ্ট্র দ র্শ ন

ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানের লক্ষ্য হল প্রকৃতিকে জয় করা। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র শুধু প্রকৃতিজগৎই নয়। সমাজ, ইতিহাস প্রভৃতি সর্ববিধ ক্ষেত্রেই তার প্রয়োগ হওয়া উচিত। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতিবিধান পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের সুচারু সমাধান সম্ভব।[১৩]

ব্যক্তিমানুষের জীবন ক্রমেই রাষ্ট্রনির্ভর হয়ে পড়ছে বলে তিনি উপলব্ধি করেন। ব্যক্তিসত্তা ক্রমেই যেমন পরিবার ও গোষ্ঠীজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, তেমনি জাতি বা সমাজের অঙ্গ যে রাষ্ট্র তা অন্তর্বর্তী বহুবিধ সংগঠনের সীমানা ছাড়িয়ে ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কস্থাপনে উন্মুখ। তিনি মনে করতেন যে ভারতীয় জীবনে গ্রুপ ও কমিউনিটির স্থান ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মাঝে অগ্রগণ্য হত। কিন্তু বর্তমানে ব্যক্তিজীবন রাষ্ট্রীয় নাগপাশে আবদ্ধ। মহীশূর সংবিধান সংশোধন কমিটির প্রতিবেদনে তিনি আঞ্চলিক ক্ষেত্র ছাড়াও কর্মনির্বাহ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অনুকূলে জোরালো অভিমত প্রকাশ করেন। তাছাড়াও তিনি চাইতেন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী স্তরে পেশাগত ও অন্যান্য সংগঠনের অবস্থান। এতে বোঝা যায় যে তিনি ছিলেন বহুত্ববাদে (pluralism) বিশ্বাসী।[১৪]

ব্যক্তিসত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশ ছিল তাঁর আদর্শ। ইতিহাসের নজির দেখিয়ে তিনি বলেন যে রোম প্রভৃতি প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের বিরোধ লাগে, ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নৈরাজ্যকর অবস্থায় পৌঁছয়, আর রাষ্ট্রের পরিণতি ঘটে সামরিক সমাজতন্ত্রে। তাই তিনি বলেন যে "প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবনে গ্রুপ পার্সনালিটি এবং ইনডিভিজুয়াল পার্সনালিটি জাগ্রত থাকে," উভয়েরই গুরুত্ব আছে, উভয়ের মধ্যে চাই সহযোগ ও সামঞ্জস্য।

জাতি বা নেশন তাঁর দৃষ্টিতে ছিল,"...a conscious social personality exercising rational choice." তাঁর মতে ঐশ ব্যঞ্জনাযুক্ত বিশ্বমানবতা অভিমুখে মানুষের পথপরিক্রমায় জাতীয়তাবাদ হল একটি সোপানমাত্র। জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা ইত্যাদি সবই এক বিশ্ব সংঘশক্তির উপাদান হিসাবে নিশ্চেতনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। আপাতদৃষ্টিতে সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দেখা গেলেও আপন আপন গঠনবিন্যাস ও কক্ষপথে সেগুলি এক বিশ্ব নিয়মতন্ত্রের অধীন। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সত্তা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি মর্যাদা রক্ষা করে বিশ্বমানবতা ন্যায়ের ভিত্তিতে বিবদমান জাতিসমূহকে সংযত করবে বলে তাঁর ছিল ঐকান্তিক বিশ্বাস। জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি যেমন আপন সত্তার স্বাধীন বিকাশের অধিকারী,

তেমনি বিভিন্ন জাতিরও আপন বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ অনুসরণের পূর্ণ অধিকার থাকে।[১৫]

বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা-উৎসবে (১৯২১) সভাপতির ভাষণে ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বব্যাপী এক বিদ্রোহের আসন্ন সম্ভাবনার লক্ষণ দেখতে পান। সে-বিদ্রোহ প্রাচীন সভ্যতা, সমাজতন্ত্র, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি সবকিছু রীতিনীতি ও মূল্যবোধের বিরোধী। সময়টা ছিল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের কয়েক বছর পরে। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে রাষ্ট্রীয় ভাঙাগড়া, রুশ বিপ্লব, লীগ অব্ নেশনস-এর অসহায়তা, ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহের দাপট, ভারতে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবত তিনি আরো বড়ো যুদ্ধ আসছে বলে আশঙ্কা করেন। শান্তির পথ হিসাবে প্রচলিত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়াও তিনি সামাজিক দিক থেকেও উপযোগী প্রয়াসের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা ছাড়াও "নতুন হিউম্যানিজমের রিলিজাস মুভমেন্ট হওয়া উচিত।" পার্লামেন্ট সমূহের আলাপ আলোচনা সমেত গণসম্মেলন আয়োজনের এবং "mass-এর life ও mass এর religion" উদ্ভাবনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি অনুভব করেন যে ব্যক্তির মোক্ষ না চেয়ে সর্বজনের মুক্তি অর্জনের জন্যে "ধর্মের এই mass-life এর দিকটা সমাজে স্থাপন করা প্রয়োজন।"[১৬]

বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্যে তিনি মনে করতেন যে, "যদি Social fellowship of man with man হয় তবেই international peace হবে, নয়তো হবে না।" নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কনফুসিয়াসের অনুরূপ উপদেশের কথা উল্লেখ করেন। বিশ্বশান্তির অনুকূলে ভারতের যে শাশ্বত বাণীর উপর ব্রজেন্দ্রনাথ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন সেটি হল "অহিংসা মৈত্রী শান্তি।" শান্তির পরিবেশ সৃষ্টির অনুকূলে চীনের "সোশ্যাল ফেলোশিপ এবং ভারতের আত্মার শান্তি এই দুইই চাই, নতুবা লীগ অব নেশনস-এ কিছু হবে না" বলে তাঁর সংশয় প্রকাশ পায়।

ব্রজেন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী রাষ্ট্র ও নেশন ছাড়াও মহাসত্য সনাতন ধর্মে ভারতের সাজাত্যবোধ নিহিত। তাঁর দৃষ্টিতে "যেখানে আত্মার বিকাশ ও ব্রহ্মের আবির্ভাব সেখানেই তাহার দেশ", সেজন্যে ভারত "ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই extra-territorial nationality-তে বিশ্বাস করেছে।" এই চিন্তার আশ্রয়ে তিনি লীগ অব নেশনস-এর ন্যাশন্যালিটির ধারণাকে সংশোধনের প্রস্তাব করেন। যাতে "আত্মার দিক থেকে extra-territorial sovereignty-র" ভাবভূমিতে একটা "Federation of the

world" স্থাপন করা যায়। বৌদ্ধ প্রচারকদের অনুরূপ প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে সে-সময়ে রাজার আচরণবিধি এমন ছিল যা শুধু নিজের জাতির নয়, অপর সব জাতির সমান হিতসাধনে প্রযুক্ত হত।[১৭]

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ থেকে বিশ্বজনীন মানবতাবাদে উত্তরণ ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে হিন্দু আদর্শে ব্রহ্ম ও বিশ্বদেবতার অনুরূপ উত্তরণ ঘটে বিশ্বজনীনতায়। তাঁর কাছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ছিল সমান মূল্যবান, উভয় দিকেই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমান ও স্বাধীন বিকাশ ঘটে। তবে জাতীয়তাবাদ মিশ্রিত বিশ্বজনীনতাকে তিনি বিপজ্জনক বলে মনে করতেন। উদাহরণ দেখিয়ে তিনি বলেন যে অনেকে হিন্দু দর্শনকেই একমাত্র সত্য বলে ধরে নেয় এবং অনেকের চোখে বিশ্বজনীনতামুক্ত হিন্দু সংস্কৃতির বিকল্প নেই। আবার কেউ কেউ জাতীয়তাবাদ মিশ্রিত বিশ্বজনীন ভাবাদর্শে সদাই উচ্ছ্বসিত, কিন্তু আপৎকালে তারা বিশ্বজনীনতাকে ছেড়ে জাতীয়তাবাদকে আঁকড়ে ধরে।

মহীশূরে দেশীয় রাজ্যের সংবিধান সংশোধন কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ (১৯২২ ২৩)। কমিটির প্রতিবেদনে রাজনীতি, আইনসভা, বিচারব্যবস্থা, সরকারি প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর উদারনৈতিক ও গণতন্ত্রী মনোভাবের পিছনে জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব ছিল বেশি। প্রতিবেদনে উক্ত কমিটি পূর্ব নির্ধারিত কর্মপরিসর অনুযায়ী যদিও মেনে নিয়েছিল যে আইনসভা, বিচারবিভাগ ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের শীর্ষে রাজ্যের রাজতন্ত্রী ধারা অনুসারে মহারাজার সার্বভৌম ক্ষমতা থাকা বিধেয়, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর মন্তব্য লিপিভুক্ত করেন এই মর্মে যে সাংবিধানিক আদর্শ মধ্যযুগীয় বা এমন কি উনিশ শতকের ধাঁচে হওয়াও অসঙ্গত। তিনি জনগণের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রতিবেদনে গণতন্ত্র, মুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, দলীয় রাজনীতি, সংখ্যাধিক্যের শাসনক্ষমতা ইত্যাদি মূল্যবোধের কথাও বলা হয়। আইনসভার দুটি কক্ষ রাখারও তিনি বিরোধী ছিলেন। সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বা আসন সংরক্ষণ রীতির পরিবর্তে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব রীতির প্রবর্তন তিনি সুপারিশ করেন।[১৮]

অর্থনৈতিক চিন্তা

অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় ব্রজেন্দ্রনাথ কেন্দ্রাভিগতার পরিবর্তে group principle-এর ভিত্তিতে বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থার উপযোগিতা অনুভব করতেন। গ্রামীণ জীবনের বিকাশের অনুকূল গ্রাম্য সংগঠন গড়ে তোলাই ছিল তাঁর

সুস্পষ্ট অভিমত। তিনি বলেন "কৃষিই আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বন, সুতরাং ruralization-এর দিকে আমাদের চেষ্টাকে নিয়োগ করতে হবে।" তার জন্যে অবশ্য তিনি নগরজীবনের উন্নয়নপ্রয়াসকে উপেক্ষা করতে বলেন নি। তিনি চাইতেন ভূমির সঙ্গে প্রাণের যোগ-সাধন। ভূমির সঙ্গে মালিকানার সম্বন্ধ থাকলে কৃষিজীবীর স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব। "ভূমি ও বাস্তুর সঙ্গে individual ownership-এর যোগকে ছেড়ে না দিয়ে large-scale production আনতে" শিল্পোন্নয়নের সর্মাধক গুরুত্ব আছে। তবে "কলের energy" যেন মানুষের আত্মাকে পীড়িত ও জড়ে পরিণত না করে সেবিষয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন। সমবায় প্রণালীর সাহায্যে কুটির শিল্পকেও বাড়িয়ে তোলার তিনি সমর্থক ছিলেন। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে তিনি কর্মকুশল সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীকে কাজে লাগাবার উপযোগী ব্যবস্থাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।[১৯]

শিক্ষাচিন্তা

সাধারণভাবে ভারতীয়দের সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে তারা অতি বেশি "একপেশে—ইমোশনাল"। তাদের "will ও intellect-এর মধ্যে" মনোগত ও বস্তুগত ভারসাম্য নেই। লোকে "হয় খুব সবজেকটিভ, নয়তো খুব য়ুনিভার্সাল", পার্থক্যবিচারে লোকে তেমন যেতে চায় না। তিনি তাই চাইতেন লোকের বস্তুগত মানসিকতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের মাধ্যমে "মনের সত্যানুবর্তিতাকে ও শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" লোকের মননকর্মেও তিনি সততার অভাব লক্ষ করেন। সেজন্য তিনি "intellectual honesty-র প্রতি দৃষ্টি রাখতে" বলেন। অন্যদিকে নৈতিক ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধকে জাগাতে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে আইন, সুবিচার ও সমতাবোধ লোপ পেয়ে গেছে, সেগুলিকেও ফিরিয়ে আনার জন্যে চাই যথোচিত শিক্ষা। শিক্ষার লক্ষ্য হবে "বিশ্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করে" আত্মপরিচয় অর্জন এবং নিজেদের বাণী বিশ্বে বিকীরণ। অর্থাৎ নিজের মধ্যে বিশ্বকে না পেলে মানুষ নিজেকে পাবে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ লক্ষ করেন যে এদেশে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে সেগুলি থেকে "Cast iron ও rigid standardized product তৈরি হচ্ছে।" প্রতিষ্ঠাকালে বিশ্বভারতীর কাছে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সেখানে যেমন প্রাকৃতিকতার স্থান আছে, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশেরও যেন অবকাশ থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং এশিয়ার প্রবণতা বিশ্বজনীন

মানবতার দিকে, অতএব ভারতের এবং এশিয়ার পারস্পরিক স্বার্থে বিশ্বভারতীর মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সবিশেষ প্রয়োজন আছে। পূর্বে যেমন সংঘ ও বিহারের মাধ্যমে ভারতের সার্থকতা সাধিত হয়েছিল, তাদের তেমনি এ যুগের উপযোগী করে সেই পুরোনো আরণ্যককে তিনি বিশ্বভারতীরূপে পত্তনের কল্পনা করেন।

রাষ্ট্রনীতি, সমাজকর্ম ও অর্থনীতির যেসব প্রতিষ্ঠানিক ধারা সারা বিশ্বে প্রবহমান, সেসবের অনুধাবনের সঙ্গে নিজেদের দৈন্য কেন ও কোথায় তা বুঝে যথাযথ অভাব পূরণের প্রয়াস হল শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু তাতে যেন নিজের প্রাণ ও সৃজনশক্তি বাইরের চাপে নষ্ট না হয়ে যায়। যা কিছু গ্রহণ করা হবে তাকে ভারতের ছাঁচে ঢেলে নেওয়াই হবে কাম্য। তাঁর কথায় "আমাদের সৃজনী-শক্তির দ্বারা তারা coined into our flesh and blood হয়ে যাওয়া চাই"।[২০]

উপসংহার

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে সঠিক অর্থে একজন দার্শনিক বলা যায় কিনা সেবিষয়ে তাঁর ছাত্র এবং অনুরাগীদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। কারণ ব্রজেন্দ্রনাথ নানাবিধ দর্শনের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু নিজে কোনো দর্শনতত্ত্ব রচনায় প্রবেশ করেন নি। তাছাড়া তাঁর লেখা বইপত্রের সংখ্যা এতই অল্প যে সেগুলির ভিত্তিতে কোনো দর্শনতত্ত্ব নির্ণয় করা কঠিন। তবুও তাঁর সীমিত রচনাদির সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনার প্রকৃতি ও দিকনির্ণয় করা যায়।

এবিষয়ে কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই যে মনোর ব্যাপ্তি ও গভীরতায় তিনি ছিলেন অনন্য মনীষার অধিকারী। তাঁর মনস্বিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে তিনি একটি সামগ্রিক ও সমন্বিত দৃষ্টিতে সবকিছুকে বিচার করতেন। জ্ঞানের বিশেষ কোনো অংশ তাঁর দিকদর্শিকার কাজ করত না। অর্থাৎ শিল্পসাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি থেকে শুরু করে গণিত, রসায়ণ, নৃতত্ত্ব, ভূগোল প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের সমন্বয়ে তিনি একটি বৈশ্বিক মিল বা সামঞ্জস্যের সন্ধানী ছিলেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের বিচারপদ্ধতি ছিল বিজ্ঞাননির্ভর। মুক্ত দৃষ্টিতে তিনি সবকিছুর বিচার করতেন, কোনো কিছু গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তি ছিল তাঁর যুক্তির কষ্টিপাথর। জ্ঞানরাজ্যের পরিবর্তন ও নতুনত্বের সঙ্গে তিনি নিজের চিন্তাভাবনাকে সদাই খাপ খাইয়ে নিতেন। কোনো বদ্ধচিন্তা কিংবা আপ্তবাক্যকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। স্বভাবতই তাঁর মনোভঙ্গি ছিল মুক্ত ও পরিবর্তনশীল। এই কারণেই তিনি পূর্ণাঙ্গ কোনো দর্শনতত্ত্বে উপনীত হতে দ্বিধা বোধ করতেন।

তাঁর আশংকা প্রকাশ পায় একটি উক্তিতে—"I refrained from committing myself in such a way as to fetter mental freedom."

জ্ঞানরাজ্যের নিত্য পরিবর্তনশীলতা সম্পর্কে মাত্রাধিক সচেতন থাকা সত্ত্বেও একদিন যখন তিনি কিছু তত্ত্বভাবনা লিপিবন্ধ করবেন বলে মনস্থ করেন এবং জীবনভোর যা কিছু ও যতটা জেনেছেন তারই ভিত্তিতে কিছু তত্ত্বরচনার তাগিদ অনুভব করেন তখন ব্রজেন্দ্রনাথ নিজের পরিবর্তনশীল মনকে বঞ্চিত ও সংযত করার সিদ্ধান্ত নেন এই বলে "my idea was to put a stop to this freedom of revision and reorganisation in the end"। কিন্তু মৃত্যু তাঁর সে-সংকল্পে বাধ সাধে।

বিজ্ঞান ও দর্শনের ব্যাপক অনুশীলনের ফলে তিনি প্রথমজীবনে অজ্ঞাবাদী ছিলেন। ঈশ্বরতত্ত্বে তখন তাঁর আস্থা ছিল না। কিন্তু সম্ভবত শারীরিক অসুস্থতাসূত্রে স্নায়বিক দুর্বলতার ফলে তিনি মনের শক্তি হারিয়ে ফেলেন। তাই দেখা যায় যে জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি ভক্তিবাদী ও অতীন্দ্রিয় চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন। তাহলেও তিনি বুদ্ধির চর্চা, বিজ্ঞানের সাধনা এবং ইহজীবনবোধকে সর্বাংশে বর্জন করেন নি।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পিছনে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি যে অনুক্ষণ বিরাজ করত সেকথা তিনি সবিস্তারে সব প্রথম তুলে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের মাহাত্ম্যে তাঁর যুক্তিহীন আবেগ ও স্ববিরোধ ক্রমশ প্রকাশ পায়। ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের অন্তর্নিহিত প্রেম, অহিংসা ও মৈত্রীর শাশ্বত ধারাকে তিনি বিশ্বের অনুরূপ অন্যান্য ধারার সঙ্গে যুক্ত করে একটি সমন্বয়ী ও বৈশ্বিক মানবতন্ত্রী ধারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। উল্লিখিত আধ্যাত্মিক সমন্বয়চিন্তা নতুন কিছু ছিল না: দাদু, কবীর, নানক প্রমুখ সন্তদের সাধনাতেও অনুরূপ প্রয়াস দেখা যায়। বস্তুত এযুগে অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা ও নানাবিধ ভেদবুদ্ধির উৎস হল আধ্যাত্মিক প্রবণতা। সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্যে যে বিজ্ঞাননির্ভর ও যুক্তিবাদী আন্দোলনের প্রয়োজন সে উদ্যম ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা যায় না।

জীববিদ্যা, শরীরতত্ত্ব, রসায়ণ, কলাবিদ্যা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার অগ্রগতি ও উৎকর্ষের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথের রচনায়। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনসমূহ বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হত। এবিষয়ে দ্বিমত নেই যে একসময়ে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদী দর্শনে ভারতীয় মননধারা সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু ভারতীয় দর্শন ও অধ্যাত্মবাদে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ আজ বৈজ্ঞানিক ছাড়পত্রের অবকাশ রাখে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বজনীনতার উদ্গাতা ছিলেন। মধ্যযুগীয় ইউরোপের রেনেসাঁসের ইহমুখী মানবতাবাদের সঙ্গে তিনি কোঁৎ-এর মানবধর্মের পরিমিশ্রণ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস হল বিভিন্ন দেশের পরস্পরবিরোধী সাংস্কৃতিক ধারা, বিভিন্ন জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধের মিলনক্ষেত্র। যাবতীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ সামঞ্জস্যবিধান হল ইতিহাসের মহান নায়কদের কৃতিত্ব। সেই নিরিখে তিনি রামমোহনের বৈশ্বিক মানবতাবাদী ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্বজনীন মানবতা ও ব্যক্তিসত্তা শেষাবধি সেই পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। সমগ্র প্রয়াস সত্ত্বেও ব্রজেন্দ্রনাথ হেগেলীয় দর্শনের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি।

দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় অবগাহনের সঙ্গে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ সমধিক উৎসাহী ছিলেন। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও পীড়নের কঠোর সমালোচনা করলেও তিনি জঙ্গি জাতীয়তাবাদী আবেগ পরিহার করে চলতেন, তাঁর ভঙ্গি ছিল নিরুত্তেজ ও যুক্তিনম্র। সমাজের বহুত্ববাদী প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক বিচিত্র ভূমিকায় তিনি বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে ব্যক্তিমানুষের জীবনে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রীয় আধিপত্যে তাঁর কোনো সায় ছিল না। তিনি চাইতেন ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ ও নিরঙ্কুশ সত্তা। সমন্যায়মূলক বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে ন্যায় ও অহিংসার আদর্শে জাতিতে জাতিতে বিনিময়, সহিষ্ণুতা ও প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল। শাসন ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় তিনি ছিলেন বিকেন্দ্রিত রীতিনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী, এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সংসদীয় গণতন্ত্রের সমর্থক। ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জীবনকল্পে সমবায় প্রথার বিস্তারের সঙ্গে প্রাচীন অর্থনীতির উন্নয়নচিন্তাকে তিনি অগ্রাধিকার দেবার অভিমত পোষণ করতেন। অন্যদিকে, শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ যাতে ছাঁচেঢালা একটি জীবে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্যে শিক্ষাব্রতীদের কাছে আবেদন করেন। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং সহজাত নৈতিকতাবোধ ও সামাজিক দায়িত্বশীলতার উন্মেষ ঘটানোই ছিল তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ছ'সাতটির বেশি নয়, সেগুলিও আবার দীর্ঘকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য। সেইসব গ্রন্থসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও প্রতিবেদনে প্রকাশিত তাঁর বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি ভারতীয় মনীষার এক বিরাট সম্পদ। মুদ্রণের মাধ্যমে সেগুলি সহজলভ্য হলে ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রচিন্তার পঠনপাঠন এবং গবেষণার ক্ষেত্রে একটি অনুদ্ঘাটিত অধ্যায় সংযোজিত হবে।

উৎস নির্দেশ

১. Quoted in: Nikunja Behari Banerjee. "Acharya Brajendra Nath Seal, the versatile thinker and the passionate humanist,", *Acharya Brajendra Nath Seal. 1864-1964 ; Birth Centenary Commemoration Volume.* 1968. p. 123.

২. Quoted in: Bibhuti Sarkar. "Acharya Brajendra Nath Seal: a life sketch", *Birth Centenary Volume.* p. 180.

৩. Quoted in: D. M. Bose. "Acharya Brajendra Nath Seal", *Birth Centenary Volume.* p. 108.

৪. B. N. Seal. *Vaishnavism and Christianity.* 1912. Preface.

৫. B. N. Seal. "Autobiographical Record. My mental history" (unpublished)

৬. B. N. Seal. *Positive Sciences of the Ancient Hindus.* Longman. 1925.

৭. B. N. Seal. *Vaishnavism and Christianity.* Preface.

৮. B. N. Seal. "Autobiographical Record. My universalism". (unpublished)

৯. *Ibid.* "Own personal religion" (unpublished)

১০. B. N. Seal. *Vaishnavism and Christianity.*

১১. B. N. Seal. *New Essays in Criticism.* 1903. p. 25

১২. S. C. Chatterji. "Some Reflections on Acharya Brajendra Nath Seal's The Quest Eternal", *Birth Centenary Volume.* pp. 52-61.

১৩. Brajendranath Seal, "Meaning of Race, Tribe, Nation", 'Paper on Inter-racial problems communicated to the First Universal Races Congress held at the University of London'. July 26-29, 1911. pp. 1-13.

১৪. *Report of Mysore Constitutional Reforms Committee.* p. 22.

১৫. B. N. Seal. *op. cit.*

১৬. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রদত্ত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা-উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ। ৮ পৌষ, ১৩২৮। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট। 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮। খ. ১১. পৃ. ৮০৭ ১০ (প ব সরকার সংস্করণ)।

১৭. তদেব।

১৮. *Report of Mysore Constitutional Reforms Committee.* pp. 2-10.

১৯. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। পূর্বোক্ত অভিভাষণ।

২০. তদেব।

২১. B. N. Seal. *Rammohun the universal man.* p. 6.

৩ বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম রাষ্ট্রচেতনা

পরিপ্রেক্ষিত

বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তার আলোচনায় ইসলামধর্মী বাঙালির ভূমিকা পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা আছে। উনিশ শতকে পাশ্চাত্য প্রভাবে বঙ্গদেশের সমাজ শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দেয় তার সঙ্গে ইসলামধর্মীদের সংযোগ ঘটে বহু বিলম্বে ও ভিন্ন আবেগসূত্রে এবং মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্নভাবে, অর্থাৎ হিন্দু বাঙালি সমাজের অনুসৃত ধারা থেকে পৃথক খাতে। এই বিলম্ব ও ভিন্নতার কার্যকারণ সম্পর্কে মতভেদ আছে। আধুনিক গবেষকদের মতে শিক্ষার অভাবই ছিল তার প্রধান কারণ, এইজন্য যে নেতৃত্ব দেবার উপযোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি তখন বাঙালি মুসলমান সমাজে দানা বেঁধে ওঠে নি। উনিশ শতকের বঙ্গদেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উজ্জীবনে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের ভূমিকার দিক থেকে দেখলে মুসলিম সমাজের এই দুর্বলতা বোঝা যায়। প্রাসঙ্গিকভাবে তাই আঠারো ও উনিশ শতকে বঙ্গের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজের প্রবণতা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সুলতানী আমল থেকে বিশেষত উত্তর ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমানেরা বঙ্গভূমিতে ক্রমান্বয়ে নানাসূত্রে এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু বঙ্গদেশে মুসলমান জনসংখ্যার বেশিটা ছিল ধর্মান্তরিত বাঙালি হিন্দু ও বৌদ্ধ অধিবাসী। বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক প্রভেদ থেকে যায়। বহিরাগতদের অধিকাংশ বসবাস করত শহরে, আর ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা ছিল মূলত গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী, জীবিকাসূত্রে তারা ছিল কৃষক, তাঁতী, জেলে, কামার, কুমোর ইত্যাদি। বলা বাহুল্য দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতাই ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।[১] অপরদিকে প্রাক-ব্রিটিশ আমলে কাজকারবার ব্যবসাবাণিজ্য ছিল হিন্দু বণিক ও মহাজনদের প্রায় কুক্ষিগত। মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে বঙ্গদেশে জমিদারির বারো আনার বেশি অংশ ভোগ করত হিন্দুরা। নবাব পূর্ববর্তী মোগলধারা বজায় রেখেই সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের নিয়োগ করতেন।

রাজস্ব বিভাগের চাকরি হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল। মুসলমানদের আধিপত্য ছিল ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে এবং সামরিক বিভাগে। উল্লেখ্য যে সেইসব মুসলমান আমলাবর্গে বাঙালি মুসলমানদের স্থান ছিল স্বভাবতই নগণ্য।[১] ব্রিটিশ শাসনপর্বেও এই ধারা চলে আসে।

পলাশীর যুদ্ধের পরে বঙ্গদেশে যে অরাজকতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় তাতে গ্রাম বাংলার জীবন প্রায় ভেঙে পড়ে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০) অভিজাত জমিদার ও তালুকদারেরাও রেহাই পায় নি। রাজস্ব আদায়ের নিশ্চয়তা ও স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার তাগিদে কর্নওয়ালিস যে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার (১৭৯৩) পত্তন করেন তাতে এক ভুঁইফোড় নতুন জমিদারবর্গ গজিয়ে ওঠে, আগে যাদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, মহাজন, ব্যবসায়ী ও সরকারি আমলা। নতুন ভূমি ব্যবস্থায় পুরাতন হিন্দু ও মুসলমান ভূস্বামী উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং ধাক্কাটা হিন্দুদের উপর পড়ে বেশি। নতুন জমিদারবর্গের অধিকাংশ ছিল কোম্পানির দাক্ষিণ্যপুষ্ট শহুরে হিন্দু বিত্তবানেরা। শহরবাসী বলে গ্রামের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ বিশেষ ছিল না। নিরীহ কৃষক ও প্রজাদের উপর তারা নানাভাবে উৎপীড়ন চালাত। উল্লেখ্য, কৃষক শ্রেণীর অধিকাংশ ছিল মুসলমান, আর নতুন জমিদারবর্গের বেশিরভাগ হিন্দু।

কোম্পানির শাসন-ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকে যে ধাঁচে কোম্পানির সঙ্গে এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই ধাঁচটিতে এক মৌল পরিবর্তন দেখা দেয় যখন শাসনক্ষমতা কোম্পানির করায়ত্ত হয়। তাতে এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক মস্ত আঘাত এসে পড়ে। প্রাক্‌পলাশী যুদ্ধের বাণিজ্যিক পর্বে বাংলার পণ্য বিশেষ করে সুতিবস্ত্র কোম্পানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি হত। তাতে তাঁতী ও তুলোচাষীদের প্রভূত অর্থাগম হত। কোম্পানির শাসন পাকাপোক্ত হয়ে উঠলে ক্ষমতার দাপটে ও কোম্পানির স্বার্থে এবং সেইসঙ্গে দেশীবিদেশী পাইকার এবং আমলাদের স্বার্থে ও যোগসাজসে তাঁতী ও চাষীকে তার প্রাপ্য ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করা শুরু হয়। অনতিকাল পরে বিলেতে শিল্পবিপ্লবের দরুন কলে তৈরি সস্তা কাপড়ের আমদানিতে বাংলার তাঁতী ও চাষীর জীবনে নেমে আসে চরম দুর্দশা। বেকার হয়ে তাঁতীরা শহর ছেড়ে গ্রামে কৃষিকার্যে ভিড় জমায়। বাঙালি মুসলমান জনসংখ্যার একটা মোটা অংশ ছিল নিম্নশ্রেণীর কৃষক ও তাঁতী। এই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে বঙ্গদেশে ধর্ম নির্বিশেষে গ্রামীণ জনসাধারণ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের পথে অগ্রসর হয়।[৫] তার নেতৃত্ব দিয়েছিল ভিন্ন স্বার্থের লোকেরা; সেদিনের অর্থনৈতিক বিক্ষোভ ও

আন্দোলন বিপথে চালিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক মুসলমান ধর্মগুরুর নেতৃত্বে।

এখানে উল্লেখ্য যে বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে দুটি ভিন্ন শ্রেণী বিরাজ করে। শহরগুলি প্রধানাংশে স্বল্পসংখ্যক পশ্চিমা সম্ভ্রান্ত (আশরাফ) মানুষে অধ্যুষিত ছিল। অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর (আতরাফ) মানুষের বসবাস গ্রামাঞ্চলে ছিল বেশি। আশরাফ শ্রেণী জন্মসূত্রে নিজেদের আরবী, ইরাণী, তুর্কি বা পাঠান বংশোদ্ভূত বলে আভিজাত্য দাবি করত। সেই নিরিখে স্বভাবতই তারা ছিল ফারসি ও উর্দু ভাষার অনুরাগী। ব্রিটিশ আমলের আগে এবং গোড়ার দিকে এই আশরাফ শ্রেণীর অন্তর্গত ভূস্বামীরা প্রভূত প্রতিপত্তি ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল। তাই বহিরাগত সংখ্যালঘু আশরাফ শ্রেণীর সঙ্গে স্থানীয় বাংলাভাষী আতরাফ শ্রেণীর মধ্যে বিরাট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান ছিল স্বাভাবিক। স্পষ্টতই মাটির সঙ্গে যোগসূত্রহীন ও বিদেশী আবেগসম্পন্ন উচ্চবিত্ত আশরাফ শ্রেণীর নেতৃত্বে বাঙালি মুসলমানদের উনিশ শতকের নবজাগরণে অংশ গ্রহণের অবকাশ ছিল না।[৬] এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব উত্তরকালে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয় ও নেতৃত্বের অপেক্ষায় থাকে।

ব্রিটিশ শাসন কায়েমী হয়ে ওঠার পরে সারা বঙ্গদেশে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তাতে গ্রামীণ আতরাফ শ্রেণীর মত আশরাফ শ্রেণীকেও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়। শাসন-ক্ষমতা হস্তচ্যুত হবার ফলে পূর্বতন নবাবী আমলের সামরিক পদে অধিষ্ঠিত মুসলমানদের অনেকে বেকার হয়ে পড়ে। বহু বেসামরিক পদ যেমন রাজস্ব ও পুলিশ বিভাগের পদে ইংরেজরা নিযুক্ত হয়। ওদিকে ব্যবসাবাণিজ্য, সুদী কারবার প্রভৃতি কাজে উপার্জিত কাঁচা টাকা ছিল হিন্দুদের হাতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কাঁচা টাকার জোরে আগেকার জমিদারদের হঠিয়ে তাদের জমিদারি হস্তগত করেছিল নতুন জমিদারেরা। নিষ্কর জায়গীর জিরাতের যেসব সুযোগসুবিধা মুসলমানেরা দীর্ঘকাল ধরে ভোগ করে আসছিল, সেসব থেকে যখন তারা বঞ্চিত হল (১৮২৮) তখন বহু মুসলমান পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। নিষ্কর জমির আয়ে পরিচালিত বহু মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মুসলমানদের দুর্গতি চরম আকার ধারণ করে যখন ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা সরকারি কাজে ব্যবহৃত হতে শুরু করে (১৮৩৭) এবং সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষার অগ্রাধিকার স্বীকৃত হবার ফলে বিচার ও আইন বিভাগ থেকেও মুসলমানদের হঠে আসতে হয়। ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের (১৮৩৫) ফলে অন্নসংস্থানের অন্যতম অবলম্বন হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার

হয়ে পড়ে তখন কোনো কোনো ধর্মগুরু ইসলাম বিপন্ন বলে ধ্বনি তোলেন।[৭]

বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও বিদ্রোহ ধর্মীয় ব্যঞ্জনায় শুদ্ধি আন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়। ইসলামী পুনর্জাগরণমূলক সংস্কার আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিয়েছিল বঙ্গদেশের বিভ্রান্ত আতরাফ শ্রেণীর নিপীড়িত জনগণ। এই ইসলামী শুদ্ধি আন্দোলনের উৎপত্তি বঙ্গদেশে হলেও তার প্রেরণার উৎস ছিল কিছুটা উত্তর ভারত কিছুটা আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের দীর্ঘকালীন শুদ্ধি আন্দোলন।

বঙ্গদেশে এই শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে পূর্ববঙ্গে সংঘটিত ফরায়েজী বিদ্রোহ থেকে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরায়েজী আন্দোলনের কয়েকজন বিদ্রোহী নেতার বিচারকালে ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলনকে 'ওয়াহাবী বিচার' বলে ভুল নামকরণ করেন। প্রকৃত অর্থে ফরায়েজী এবং ওয়াহাবী আন্দোলন দুটির মধ্যে ধর্মগত বিরাট প্রভেদ ছিল। ফরায়েজী আন্দোলনকে বরং উত্তর ভারতের তরিকা-ই-মুহম্মদীয়াহ্ সংস্কার-আন্দোলনের একটি শাখা বলা চলে। উক্ত আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন দিল্লির প্রসিদ্ধ ধর্মগুরু শাহ ওয়ালী আল্লাহ্ (১৭০৩-৬৩) ও তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজিজ। আজিজের শিষ্য বেরিলির শাহ সৈয়দ আহমদ শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) উল্লিখিত শুদ্ধি আন্দোলনের সংগঠনসূত্রে ১৮২০ সালে কলকাতায় আসেন। তাঁর শিষ্য তিতুমিরের নেতৃত্বে উত্তর চব্বিশ পরগণায় শুদ্ধি আন্দোলনের সঙ্গে জমিদার-নীলকর বিরোধী সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এক মিশ্রিত ধারায় গড়ে ওঠে।[৮]

অন্যদিকে ফরায়েজী আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন ফরিদপুর জেলার হাজী শরিয়ত আল্লাহ্ (১৭৮১-১৮৪০)। তাঁর পুত্র দুদু মিঞা (১৮১৯-৬২) যুগপৎ জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সৃষ্টি করেন এবং অনুগামীদের কোরাণ ও হাদিসের আদর্শে কঠোর জীবনাচার অনুসরণের নির্দেশ দেন। স্বভাবতই তাঁর সঙ্গে হিন্দু জমিদার, নীলকর ও সরকারি ফৌজের বিরোধ ও সংঘর্ষ বাধে।

বঙ্গদেশে ব্যাপক ধর্মান্দোলনের কারণ কেবল মুসলমানদের শাসন-ক্ষমতা হস্তচ্যুতি ও অর্থনৈতিক সংকট নয়। সেটি ছিল মূলত ভারত ও বহির্ভারতে ইসলাম ধর্ম ও রাজনীতির দীর্ঘকালীন অবক্ষয়-চেতনা ও তার প্রতিকারের একটি আংশিক চিত্র। মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায় রাজশক্তি দুর্বল ও ব্যর্থ প্রতিপন্ন হলে আলিম সম্প্রদায় চিরকাল হস্তক্ষেপ করে এসেছে। সপ্তদশ শতকে ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি শক্তির ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের সময়ে মুসলিম দেশগুলির শক্তিহীনতা প্রকাশ পায়। তার কারণ হিসাবে আলিম

সম্প্রদায় ইসলামধর্মীয়দের অশাস্ত্রীয় আচারবিচার এবং সমন্বয়পন্থী ধর্মীয় ভাবাদর্শের প্রভাবকে দায়ী করে। সমন্বয়পন্থী মুসলিম ঐতিহ্য এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের পূর্বতন ধর্মের আচারানুষ্ঠান অনুসরণ করাটা আলিমদের দৃষ্টিতে ছিল অশাস্ত্রীয়। তার প্রতিকারকল্পে তাঁরা মুসলিম জনচিত্তকে জাগ্রত ও পরিশুদ্ধ করার জন্যে তৎপর হন।[৯]

ভারতে শিখ, মারাঠা, জাঠ ও সবশেষে কোম্পানির শক্তিবিস্তারের ফলে মোগল সাম্রাজ্যের হীনাবস্থা কালক্রমে যতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, উলেমাদের গোঁড়া শুদ্ধি আন্দোলনের আবেগ ততই বৃদ্ধি পায়। বঙ্গদেশে ফরায়েজী ও ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তরিকা-ই-মুহম্মদীয়াহ্ আন্দোলন মুসলমানদের এই হীনাবস্থা থেকে উদ্ধারের একটি প্রয়াসমাত্র। ওয়ালি আল্লাহ্ তাই ইসলাম বিপন্ন বলে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাঁর পুত্র আজিজ এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এক ফতোয়াতে ভারতকে দার-উল-হরব্ রূপে অভিহিত করেন, অর্থাৎ ভারত ইসলামের অনুকূল নয়। বঙ্গদেশকে ফরায়েজী নেতারাও অনুরূপে দার-উল-হরব্ বলে ঘোষণা করেছিলেন। উভয় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য ক্রমে হয়ে দাঁড়ায় ইংরেজ শাসনের অবসান। এবং পরোক্ষে সেটা একদিন সিপাহি বিদ্রোহের (১৮৫৭) সঙ্গে যুক্ত হয়।[১০]

ইংরেজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের বৈরিতা নানা পর্বের বিভিন্ন ঘটনায় ক্রমে ঘনীভূত হয়ে পড়ে। বিধর্মী নতুন শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে মুসলমানেরা মেনে নিতে পারে নি। অন্যদিকে নবাগত পশ্চিমী শিক্ষা ও শাসনব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে হিন্দু-সমাজ নবজাগরণের পথে এগিয়ে যায়। তাই দেখে এবং বঙ্গে পশ্চাৎপদ আতরাফ শ্রেণীর মধ্যে থেকে নেতৃত্ব দেবার উপযোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অভাব পূরণের কাজে আশরাফ শ্রেণী অগ্রসর হয়; গোড়ার দিকে মুসলিম নবজাগরণে তারা যে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

স্পষ্টতই উনিশ শতকে ভারতীয় মুসলমান সমাজের মানসিকতা ও ক্রিয়াকলাপ ছিল দ্বিমুখী ধারায় প্রবহমান। একদিকে তরিকা-ই-মুহম্মদীয়াহ্ আন্দোলনের পথে বেরিলির সৈয়দ আহমদ শহীদ ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁর অনুগামী তিতুমির এবং পূর্ববঙ্গে ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্বে শরিয়ত আল্লাহ্ ও দুদু মিঞার ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম; অন্যদিকে ইংরেজ শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়ে বঙ্গে আবদুল লতিফ ও আমির আলির এবং অনতিকাল পরে আলিগড়ে সার সৈয়দ আহমদের নব্যমুসলমান সমাজগঠনের উদ্যম লক্ষণীয়।

হিন্দুদের অগ্রগতি কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমানকে সচকিত করে তোলে

এবং নিজেদের পশ্চাৎপদতা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হয়ে ওঠেন। তাঁরা মুসলমান সমাজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ভিন্ন আবেগে সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। তারই পরিণতি হল ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় আঞ্জুমান-ই-ইসলামী নামক প্রথম মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা।[১১] তার পশ্চাতে ছিলেন কাজী-উল-কুজত, মৌলবী ফজলুর রহমান, কাজী আবদুল বারি, আবদুল লতিফ প্রমুখ ব্যক্তিরা। তার আগে ঐ বছরের মে মাসে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই সভায় প্রস্তাবিত সংস্থার নিয়মাবলীর খসড়া ও কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ছাড়াও একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে—

> No measure should on any occasion be adopted that might in any manner appear inimical to the British Government.[১২]

১৬ জুলাই তারিখে টাউন হলে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের এক সভা আহ্বান করা হয়। অপ্রত্যাশিত সংখ্যক জনসমাগম হওয়ায় নিয়মাবলী অনুমোদন ও কার্যনির্বাহক সমিতি গঠনের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়। পরে ২১ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত মুলতবী সভায় নিয়মাবলী গৃহীত হয়েছিল। মৌলবী মহম্মদ রউফ তাঁর ভাষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন। লোকের মনে ইংরেজের বিরাগ ভাজনের আশংকা তিনি নিরসন করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে সংস্থাটি চূড়ান্তভাবে গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু সরকারের কাছে অবিলম্বে একটি স্মারকপত্র পেশ করার তাগিদে সভার দিন ৪ সেপ্টেম্বর তারিখে এগিয়ে আনতে হয়। কারণ জেলা সদর আদালতে উকিলদের ইংরেজি জানা বাধ্যতামূলক করে একটি ইস্তাহার কিছুকাল আগে প্রচার করা হয়েছিল। মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী বলে এবং তাদের আবেদনে ইস্তাহারটি সরকার প্রত্যাহার করে নেয়। অ্যাসোসিয়েশনের পরবর্তী একটি সভায় অনুরূপ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অ্যাসোসিয়েশনটির মেয়াদ বেশি দিন স্থায়ী হয় নি।

উৎস নির্দেশ

১. অম্লান দত্ত। "উনিশশতকী বাঙলা নবজাগরণের গৌরব ও অপূর্ণতা," 'জিজ্ঞাসা'। বর্ষ ১, সংখ্যা ২, শ্রাবণ, ১৩৮৭। পৃ. ১২০। B. B. Misra. *The Indian Middle Classes : their growth in modern times.* New Delhi, 1978. p. 186.

২. A. F. Salahuddin Ahmed. "The Bengal Renaissance and the Muslim Community", in D. Kopf and S. Joardar (ed). *Reflections on the Bengal Renaissance.* Dacca, 1977. p. 37.

৩. Abdul Karim. *Murshid Kuli Khan and His Times.* Dacca, 1963. pp. 70, 254.

৪. N. K. Sinha. *The Economic History of Bengal : From Plassey to Permanent Settlement.* v. 1, 1965. pp. 180-1.

৫. অসীম রায়। "ইসলাম ও বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ : ব্রিটিশ পর্ব", 'জিজ্ঞাসা'। বর্ষ ১, সংখ্যা ৪। মাঘ, ১৩৮৭। পৃ. ৪০২।

৬. তদেব। প্রাক-ব্রিটিশ পর্ব। বৈশাখ, ১৩৮৭। পৃ. ৮৮।

৭. Rafiuddin Ahmed. *The Bengal Muslims ; 1871-1906.* Delhi, 1981. pp. 39-42.

৮. Muin-ud-Din Ahmad khan. *History of the Fara'idi Movement in Bengal.* Karachi, 1965. p. xlvi.

৯. অসীম রায়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। মাঘ, ১৩৮৭। পৃ. ৪০৫।

১০. P. Hardy. *The Muslims of British India.* Cambridge, 1972. p. 56.

১১. Rameshwar Prasad. "The Anjuman-E-Islami : the first Mohamedan Association in Bengal," *Quarterly Review of Historical Studies.* v. 7, n. 4. pp. 265-7.

১২. B. B. Majumdar. *Indian Political Associations and Reform of Legislature ; 1818-1917.* 1965. p. 221.

আবদুল লতিফ ।। ১৮২৮—১৮৯৩

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার ও সমকালীন বুদ্ধি-বিভাসিত আন্দোলনে মুসলমান সমাজের নিস্পৃহ মানসিকতার ক্ষতিকর পরিণাম উপলব্ধি করে যিনি মুসলিম জনমানসে নতুন চেতনা ও আধুনিকতার বোধন করেন তিনি হলেন আবদুল লতিফ। বিদেশী শাসনের সঙ্গে সর্ববিধ অসহযোগিতায় অভ্যস্ত এবং নব্যশিক্ষার প্রতি অন্ধবিদ্বেষী সেদিনের বাঙালি মুসলমান সমাজ তাঁর প্রয়াসকে সুনজরে দেখে নি। লতিফকে তাই অনেক সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন—

> To Abdool Luteef belongs the unique honour of being the pioneer of English education among the Mahomedans of Bengal···But before Sir Syed Ahmed was on the field, Abdool Luteef was there, exhorting, supplicating, entreating, earnestly appealing to his co-religionists to give their sons an English education, if they wanted to hold their own, in competition with Hindus.[১]

ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামের এক কাজী পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ ছিলেন একাধারে আইনজীবী, ভাষাবিদ ও সুলেখক। লতিফ কলকাতা মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা শেষ করে সেখানে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের তখন বিশেষ আগ্রহ ছিল না। প্রথম বছরে গুটিকতক ছাত্রের মধ্যে লতিফ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁর সেই শিক্ষা উত্তরকালে ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার পক্ষে সহায়ক হয়। কর্মজীবন শুরু করেন তিনি দমদমে অন্তরীণ সিন্ধু প্রদেশের কয়েকজন আমিরের একান্ত সচিব হিসাবে। এই কর্মসূত্রে তিনি কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ এবং অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন।

বছরখানেক পরে লতিফ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের সহকারি শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁকে কিছুকাল সরকারি কেরানির পদে দেখা যায়। সে-পদের কার্যকাল শেষ হলে তিনি কলকাতা মাদ্রাসার ইঙ্গ-আরবি বিষয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৮৪৯ সাল থেকে লতিফ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন এবং সেই সময় থেকে তাঁর বৈচিত্র্যময় ও কর্মবহুল জীবন শুরু হয়। আলিপুর, খুলনা, হুগলি প্রভৃতি স্থানে মহকুমা শাসক হিসাবে

সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। হুগলিতে বর্ধমানের মহারাজা মহাতাবচাঁদ ও রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ১৮৫২ সালে লতিফ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জাস্টিস অফ দ্য পীস মনোনীত হন। তারপরে আলিপুরে পুলিশ কোর্টের জজ (১৮৬৭-৭৭) এবং কিছুকাল প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৩ সালে জাস্টিস অফ দ্য পীস যাঁরা ছিলেন তাঁদের নিয়ে কলকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়। লতিফ তার একজন সদস্য মনোনীত হন। পরের বছরে বরাহ-নগরে যখন মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় তখন সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদালতের জজ হিসাবে লতিফকে বরাহনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে দেখা যায়। সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে বছরখানেক তিনি ভুপাল রাজ্যের মন্ত্রী (১৮৮৫-৮৬) হিসাবে কাজ করেন। রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উপলক্ষে সরকার তাঁকে নবাব বাহাদুর (১৮৮৭) উপাধিতে ভূষিত করেন।

সরকারি চাকরি জীবনের গোড়া থেকেই লতিফ মুসলমান সমাজের একজন মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ান। ইংরেজ সরকারের প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য থাকলেও সরকারি ক্রিয়াকলাপকে তিনি অন্ধভাবে সমর্থন করতেন না। নীলকরদের অত্যাচার যখন চরম হয়ে ওঠে তখন লতিফ ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার মহকুমা শাসক (১৮৫৩)। সরকারি কর্মচারি হিসাবে নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে তাঁর নিষ্ক্রিয় থাকাই ছিল স্বাভাবিক। পরিবর্তে তিনি নীলকরদের উৎপীড়নের কথা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আনেন এবং প্রতিকারের সুপারিশ করেন। চাষীদের জমিতে নীলকরদের বেআইনী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তিনি একটি পরোয়ানা জারিও করেছিলেন। তাতে জেলা শাসক অ্যাসলি ইডেনের কাছ থেকে শাস্তি হিসাবে লতিফ পেয়েছিলেন তিরস্কার ও বদলির আদেশ। এবিষয়ে পরবর্তীকালে আলোচনা প্রসঙ্গে *Reis and Rayyet* মন্তব্য করেছিল যে—

> ...he was promoted...to a higher grade and placed in charge of the newly formed Sub-division of Kalaroa...which was afterwards called the Sub-division of Satkhira, now in Khulneah. There he at once showed his mettle...who laid the seeds of the emancipation of the peasantry from slavery to Indigo. He was removed but without a stain.[২]

প্রয়াস তাঁর নিষ্ফল হয় নি। অ্যাসলি ইডেনের সুপারিশক্রমে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বসিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে হরিশ মুখার্জীর মৃত্যুর পরে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে যে অর্থভাণ্ডার গঠিত হয়েছিল, লতিফ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার সদস্যপদ গ্রহণ

করেন। সরকারি আনুগত্যের আতিশয্যের ফলে সার সৈয়দ আহমদ সিপাহি বিদ্রোহের কঠোর নিন্দা করেন। লতিফ সেবিষয়ে নীরব থাকেন।

লতিফ লক্ষ করেছিলেন মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। ওদিকে সরকারি অর্থে পরিচালিত হিন্দু কলেজে প্রবেশাধিকার হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লতিফের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে নামান্তরিত হয় এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের সেখানে প্রবেশাধিকার স্বীকৃতি পায়। তাঁর প্রভাবে মাদ্রাসা শিক্ষায় ইংরেজি যুক্ত হয়েছিল বটে, তবে মাদ্রাসায় আতরাফ পরিবারের সন্তানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকার রীতিকে লতিফ কার্যত সমর্থন করেন। বঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষায় কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হওয়া উচিত সেই প্রসঙ্গে যখন বিতর্কের ঝড় বয়ে যায় তখন লতিফ বলেছিলেন যে সাধারণ বাঙালি মুসলমানের কাছে বাংলা ভাষাই উপযোগী, তবে সে-ভাষা প্রচলিত ধারায় বেশি সংস্কৃত ঘেঁষা বা ফারসি ঘেঁষা না হয়ে মাঝামাঝি হওয়াই সঙ্গত।

জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় মুসলমানদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে লতিফ নিজের বাড়িতে ম্যাহোমেডান লিটার‍্যারি সোসাইটি (১৮৬৩)নামে একটি বিদ্বৎ সংস্থা গঠন করেন। তিনি এবিষয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন—

> কুসংস্কার এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত করে মুসলিম সমাজকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত এবং ইংরেজ ও হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সংগে তাদের মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৮৬৩ সালের এপ্রিল মাসে আমি ম্যাহোমেডান লিটারারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করি। এই সমিতি আলোচনা সভা, বক্তৃতা এবং টাউন হলে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন ইত্যাদি মারফত মুসলমান সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত এবং তাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করার জন্য অবিরত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারেও এ সমিতি সদাসর্বদা সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছে।[৩]

প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনা সভায় নানা ধরনের বিষয় থাকত, যেমন ইতিহাসপাঠের উপকারিতা, সংবাদপত্রের ইতিহাস, নৌ-পরিবহণ, বাণিজ্যের কথা, আমেরিকা আবিষ্কার কাহিনী, সভ্যতার ইতিহাস, শরিয়তী রীতিনীতি ইত্যাদি। অনেকটা ডিরোজিওর সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার মতো আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানে মুসলমানদের নিস্পৃহ মনোভাব কাটিয়ে তোলার জন্যে সোসাইটিতে যুবকদের আলোচনা ও বিতর্কে উৎসাহিত করা হত। অবশ্য ডিরোজিওপন্থীরা মুক্তমনে যুক্তিগ্রাহ্য বিচার-বিতর্কে যোগ দিতেন। কিন্তু লতিফের সোসাইটির অন্তর্নিহিত সুর ছিল রক্ষণশীল মুসলিম চিন্তা-ভাবনার

সত্তার এবং ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। সোসাইটির আলোচনা ও বক্তৃতা হত ফারসি কিংবা ইংরেজিতে, কদাচিৎ বাংলায়।

কালক্রমে সোসাইটির কর্মপরিসর বিস্তারিত হয়ে পড়ে। তখনও পর্যন্ত মুসলমানদের স্বতন্ত্র কোনো প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন ছিল না। তাই সর্বভারতীয় ব্যাপারে মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে লতিফের সোসাইটি একটি জনসংস্থা হিসাবে সরকারের স্বীকৃতি পায়। লর্ড রিপন যখন একটি শিক্ষা কমিশন (১৮৮২) নিয়োগ করেন তখন লতিফের সোসাইটি কমিশনের কাছে মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপন করে। বড়লাট ও ইংরেজ রাজপুরুষদের নানা উপলক্ষে সংবর্ধনা জানানোর সুযোগে মুসলমানদের সমস্যা অভ্যাগতদের গোচরে আনা ছিল সোসাইটির একটি নিয়মিত কাজ। কর্মসূচির অনুরূপ আর একটি অঙ্গ ছিল নানা বিষয়ে সরকারের কাছে স্মারকপত্র পাঠানো। কার্যত সোসাইটি ছিল ভারতের উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। মহীশূর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্যের রাজন্যবর্গ সোসাইটির সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক হিসাবে সেটির শক্তিবর্ধন করেন।

লতিফের লিটার‍্যারি সোসাইটির উদ্যোগে ১৮৬৫ সাল থেকে প্রতি বছরে সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্মেলন হত। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারি ও বুদ্ধিজীবীরা তাতে যোগ দিতেন। শিল্পসামগ্রীর প্রদর্শনী সম্মেলনের একটি অঙ্গ ছিল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফাদার লাঁফো ফনোগ্রাফ যন্ত্রের ক্রিয়াকৌশল দেখিয়ে একবার বক্তৃতা করেন (আনুমানিক ১৮৯১ সালে)।

একথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো-কোনো মুসলমান ধর্মগুরু ভারতকে দার-অল-হরব্ অর্থাৎ সংগ্রাম ও শত্রুতার দেশ বলে অভিহিত করেছিলেন। শাস্ত্র অনুযায়ী মুসলমানেরা উল্লিখিত স্থানে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ করবেন। লক্ষ্য ছিল দার-অল-ইসলাম স্থাপন অর্থাৎ যেদেশে মুসলমানেরা ইসলাম শাস্ত্র অনুযায়ী শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম। সিপাহি বিদ্রোহের কিছুকাল পরে লক্ষ্ণৌয়ের ধর্মগুরুরা নতুন এক ফতোয়ায় বলেন যে ইংরেজরা মুসলমানদের রক্ষা করছে এবং তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে না। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শাস্ত্রসম্মত নয় এবং ভারত সম্পূর্ণ দার-অল-ইসলাম।[৪] সেইসূত্রে বেরিলির সৈয়দ আহমদ শহীদের শিষ্য এবং জৌনপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত মৌলানা কেরামত আলি বঙ্গ পর্যটনকালে মুসলমানদের শুদ্ধি আন্দোলন অনেকাংশে শিথিল করে দিয়েছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের পরে মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব যখন কঠোর হয়ে ওঠে তখন লতিফ তাঁর

সোসাইটির এক বিশেষ অধিবেশনে (১৮৭০) মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমক্ষে কেরামত আলিকে দিয়ে ফরায়েজী আন্দোলনের বিপক্ষে এক ফতোয়ায় ভারতকে দার-অল-ইসলাম অর্থাৎ ভারত ইসলামধর্মীদের পক্ষে অনুকূল বলে ঘোষণা করান এবং নিজে দেশব্যাপী প্রচার শুরু করেন। লতিফের প্রচেষ্টার পিছনে মক্কার মুফতিদের সমর্থন পাওয়া যায়। সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের স্বার্থে লতিফের উদ্যম ছিল খুবই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ।

লতিফ যথার্থই একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। নিজস্ব সোসাইটি ছাড়াও এশিয়াটিক সোসাইটি এবং তাঁর সমকালে প্রতিষ্ঠিত বেথুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা এবং মহেন্দ্রলাল সরকারের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স প্রভৃতি বিদ্বৎ সংস্থার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া মেরি কার্পেন্টার প্রমুখ সমাজসেবীদেরও তিনি সহযোগী হন।

লর্ড ক্যানিং-এর আমলে ভারতে সর্বপ্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের সূচনা হিসাবে বিভিন্ন প্রদেশে বিধান পরিষদ (১৮৬২) গঠিত হয়েছিল। লতিফ বার তিনেক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। সেই সময়ে তিনি নানাবিধ আইন প্রবর্তনে সচেষ্ট হন। ১৮৬৪ সালে মুসলিম আইন ও কাজীপ্রথা রদ হয়ে যায়। ফলে মুসলমানদের একাংশের মধ্যে বেকার সমস্যার উদ্ভব হয়। বস্তুত গ্রামাঞ্চলে কাজীপ্রথার মাধ্যমে ছোটখাট বিবাদবিসংবাদের নিষ্পত্তি এবং বিবাহ ও তালাক রীতি নিয়ন্ত্রিত হত। উভয় সমস্যার সমাধান হিসাবে লতিফ কাউন্সিলে মুসলিম বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন উত্থাপন ও বিধিবন্ধকরণে সমর্থ হন। তাতে উক্ত বেকার সমস্যার সমাধান হয়। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার যে-কোনো বিধিব্যবস্থা ও আইন প্রণয়নের আগে মুসলমানদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব জানার জন্যে মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে লতিফের মতামত গ্রহণ করতেন। ১৮৬০ সালে যখন ভারতে প্রথম আয়কর আইন প্রবর্তিত হয় তখন বোর্ড অব কমিশনার্স নামে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। লতিফ বছর চারেক সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। কিশোর অপরাধীদের জন্যে আলিপুরে রিফরমেটারি স্থাপনেও (১৮৭৬) লতিফের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ।

সরকারি কর্মজীবনের প্রায় গোড়ার দিকে যখন লতিফ জনহিতকর কাজ শুরু করেন তখন তিনি দেখেন যে "মুসলমান সমাজ ইউরোপীয় দূরের কথা এমন কি প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের লোকদের সঙ্গেও মেলামেশা করতে পরাঙ্মুখ।"[৫] নানাভাবে তিনি মুসলমানদের মানসিক জড়তা কাটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তারই অন্যতম কাজ হিসাবে তিনি ১৮৫৩ সালে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার

ব্যবস্থা করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'মুসলমান ছাত্রদের নিকট ইংরেজি শিক্ষার উপকারিতা'। বহু সংখ্যক সুচিন্তিত ও দীর্ঘ প্রবন্ধ জমা পড়ে। অনেকে মুসলমান ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং নিজমত সমর্থনে ধর্মগ্রন্থ থেকে নানা উক্তির উদ্ধৃতি দেয়। কেউ কেউ পুরস্কার-দাতাকে ধর্মের শত্রু এবং ইসলাম ধর্মে বিপ্লবকামী বলে নিন্দা করে। অবশ্য অনেকে অনুকূল মতামত ব্যক্ত করেছিল।

মূলত রক্ষণশীল হলেও লতিফ ধর্ম ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় গোঁড়ামি পছন্দ করতেন না। কোরাণের আক্ষরিক ও অন্ধ অনুসরণ মুসলমানদের পক্ষে ক্ষতিকর বলে তিনি মনে করতেন। ১৮৬৩ সালে ছোটলাট সিসিল বিডন আলিপুরে একটি কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সোসাইটির একটি সভায় লতিফ প্রদর্শনীর উপকারিতা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলিপুরের প্রদর্শনী লোককে আকৃষ্ট করা তো দূরের কথা, পরিবর্তে লোকের মনে করবৃদ্ধির আশংকা সৃষ্টি করে। লতিফ সেজন্যে হিন্দুস্থানী ভাষায় তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। ১৮৬৫ সালে কলকাতায় যখন প্রথম জনসংখ্যা গণনার ব্যবস্থা হয় তখন ১৯৮টি পরিবার ভয়ে কলকাতা ত্যাগ করে জঙ্গলে পালিয়ে যায়, এই আশংকায় যে তাতে মহিলাদের ইজ্জত হানি হবে এবং সরকার ব্যাপকহারে কর সংগ্রহ করবে। লতিফ আদম শুমারির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একটি পুস্তিকা প্রচার করেন।

১৮৪৮ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় স্বল্পকালীন অধ্যাপনা সূত্রে লতিফ শিক্ষা বিস্তারে, বিশেষ করে মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে আজীবনকাল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত বহু স্মারকপত্র, প্রতিবেদন ও নিবন্ধের লেখক। ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতা মাদ্রাসা (প্রাচ্যবিদ্যা কলেজ) স্থাপিত হয়েছিল। ১৮২০ সালে মাদ্রাসায় একটি ইংরেজি বিভাগ যুক্ত হয়। আরবি বিভাগের তুলনায় ইংরেজি বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ছিল নগণ্য। লতিফ ছিলেন উভয় বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেন। ইংরেজির মতো বাংলা ভাষার প্রতিও অভিজাত মুসলমানদের ছিল তীব্র অনীহা। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে মাদ্রাসায় বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা দেখা যেত না। গণিত শিক্ষাও ছিল অনুপস্থিত। লতিফের প্রভাবে মাদ্রাসায় প্রাথমিক স্তরে বাংলা ও গণিত শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ মুষ্টিমেয় ছাত্রের উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্তন হয়, সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে।

১৮৬১ সাল থেকে মাদ্রাসা পরিচালনা এবং হাজী মহম্মদ মহসীনের ট্রাস্ট ফান্ডের ব্যয়নির্বাহ সম্পর্কে দীর্ঘ বারো বছর ধরে বহু বাদানুবাদ ও বিতর্ক চলে। তখন একদিকে হুগলি ও কলকাতা মাদ্রাসা পরিচালনায় অব্যবস্থা এবং অন্যদিকে ইংরেজি শিক্ষাবিমুখ মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা কম হত বলে হুগলি কলেজে মহসীন ট্রাস্টের উপকার হিন্দুরা ভোগ করত। প্রথম থেকেই লতিফের নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলনের ফলে উক্ত মাদ্রাসা দুটি ছাড়াও অন্যান্য স্থানের মাদ্রাসা শিক্ষায় ও পরিচালনায় সরকার নানাবিধ সংস্কার করেন এবং মহসীন ফান্ডের অর্থ হুগলি কলেজের পরিবর্তে মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিশেষ করে মুসলিম শিক্ষার আধুনিকীকরণ ছিল লতিফের স্বপ্ন ও সাধনার বস্তু, যাতে তাঁর স্বধর্মীয় লোকেরা হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারে। কিন্তু সেজন্যে তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন না। বহু হিন্দুর সঙ্গে যেমন তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, তেমনি তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, যেগুলিতে আর কোনো মুসলমানকে দেখা যেত না। লতিফ সম্পর্কে তাই সমসাময়িক হিন্দু লেখকেরা প্রশংসায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে কোনো-কোনো লেখকের মতে প্যান ইসলাম মতাদর্শের প্রবক্তা জামালউদ্দীন আফগানির প্রভাবে লতিফের মনে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দেয়। তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৭৬ সালে যখন তুরস্কের সঙ্গে সার্ভিয়া প্রভৃতি রাজ্যের যুদ্ধ বাধে। "নিয়মতান্ত্রিক পন্থায়" সরকারের অনুমতি নিয়ে তিনি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। তুর্কি আহতদের সাহায্যার্থে একটি অর্থভান্ডারও খোলা হয়। সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে তুরস্কের সমর্থনে সেদিন বিপুল আন্দোলন দেখা দেয়।

লতিফ অবশ্য আন্দোলন ও বিক্ষোভ অপেক্ষা সমন্বয় ও সমঝোতায় অধিক বিশ্বাসী ছিলেন। সরকারের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই তিনি স্বধর্মীয়দের হিতসাধনে সচেষ্ট থাকতেন। ইংরেজিতে দুখণ্ডে লিখিত আত্মজীবনী ছাড়া তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। সুসংবদ্ধ কোনো তাত্ত্বিক চিন্তা তাঁর রচনাদিতে বিশেষ পাওয়া যায় না।

উৎস নির্দেশ

১. মন্মথনাথ ঘোষ : "মহাত্মা আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর", 'মালঞ্চ'। বর্ষ ৪, সংখ্যা ২, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪। পৃ. ১৫১ (প্রবন্ধটি পাঁচটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত)।

২. আবদুল লতীফ খান : 'মুসলিম বাংলা : আমার যুগে'। ঢাকা, ১৯৬৮। অনুবাদক আবু জাফর শামসুদ্দীন লিখিত ভূমিকা, পৃ. ১৬।

৩. তদেব। পৃ. ১৭।

৪. Abu Imam. "Some Aspects of Muslim Politics and Personalities in India in the Later Nineteenth Century. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies.* Rajsahi, 1977. v. 2. p. 60.

৫. আবদুল লতীফ খান : পূর্বোক্ত গ্রন্থ। পৃ. ২৮।

সৈয়দ আমির আলি ॥ ১৮৪৯—১৯২৮

উনিশ শতকের হিন্দু শিক্ষিত সমাজ একাধারে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী ও উদারতন্ত্রী ভাবাদর্শ অনুসরণের সঙ্গে হিন্দু অতীতের আবিষ্কার ও ধর্মীয় আত্মগরিমায় উচ্ছল হয়ে ওঠে। বিগত কয়েক শতকের মুসলিম শাসনে হিন্দুদের মনে সানুরাগ মমত্বের পরিবর্তে জন্মেছিল অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য। নব্যশিক্ষিত মুসলমানেরাও তাই হিন্দু নবজাগরণে একাত্মতা (identity) খুঁজে পায় নি। হিন্দুদের মতো মুসলমানেরাও নিজস্ব ঐতিহ্য ও আত্মগরিমার সন্ধান করে স্বতন্ত্র উৎসে। সৈয়দ আমির আলিকে সেই বিচ্ছিন্ন মুসলিম মানসের অন্যতম উদ্‌গাতা বলা যায়।

মুসলিম নবজাগরণের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার সঙ্গে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা। কটকের এক শিয়া পরিবারে তাঁর জন্ম। হুগলি মহসীন কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম. এ. এবং আইন পড়া শেষ করে তিনি কলকাতায় ওকালতি প্র্যাকটিশ শুরু করেন। পরে একটি বৃত্তি পেয়ে ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে (১৮৬৯-৭৩) চলে যান। ফিরে এসে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে (১৮৭৮-৮১) নিযুক্ত হন। সেই সময়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৭৮-৮৩) ছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় আইন সভারও সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন; বেঙ্গল টেনান্সি বিল আলোচনার সময়ে তিনি কৃষকদের সমস্যা তুলে ধরেন। ইলবার্ট বিল সমর্থনসূত্রে তিনি হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেগোর ল লেকচারারের পদেও তাঁকে দেখা যায়। সার রমেশ মিত্র অবসর গ্রহণ করলে আমির আলি হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৪ সাল থেকে জীবনের শেষাবধি তিনি ইংল্যান্ডে অতিবাহিত করেন।

আমির আলি বঙ্গদেশে নিজেকে পরদেশী বলে মনে করতেন। বাংলা ভাষার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল না। তবুও তিনি ছিলেন কলকাতার বাসিন্দা এবং এই শহরই ছিল তাঁর জীবিকা ও রাজনৈতিক জীবনের কর্মকেন্দ্র। সর্বোপরি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে নিয়েই মূলত তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা গড়ে উঠেছিল। সেই হিসাবে বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর স্থান অস্বীকার করা যায় না।

আচার-বিচার ও চিন্তাভাবনায় আমির আলি ছিলেন যথার্থই একজন আধুনিক মনোভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তি। দেশে যে একটি সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্তন আসন্ন সেকথা তিনি যথাসময়ে উপলব্ধি করেন। তাই মুসলমানদের

স্বার্থরক্ষা ও তাদের দাবি সরকারের কাছে তুলে ধরার তাগিদে তিনি সার সৈয়দ আহমদকে একটি রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় গুরুত্ব দেওয়াই ছিল সার সৈয়দের মূল লক্ষ্য। তাতে অবশ্য আমির আলির দ্বিমত ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের মতো মুসলমানদের একই সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁর কাছে ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নইলে নবজাগ্রত হিন্দু জাতীয়তাবাদের জোয়ারে মুসলিম সত্তা ভেসে যাবে বলে তিনি আশংকা করেন।[১] সার সৈয়দ যুবক আমির আলির প্রস্তাবকে আমল দেন নি।

আবদুল লতিফ যখন কলকাতায় লিটার‍্যারী সোসাইটি, আর আলিগড়ে সার সৈয়দ সায়েনটিফিক সোসাইটির মাধ্যমে মুসলমান সমাজে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যস্ত তখন আমির আলি কলকাতায় ন্যাশনাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশন নামে মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল (১৮৭৭) গঠন করেন। দেশের রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার আসন্ন পরিবর্তন উপলব্ধি করে মুসলমানদের আত্মচেতনা ও ঐক্যবোধ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তার জন্যে অবশ্য তিনি মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক উন্নয়ন প্রয়াসকে উপেক্ষা করতে চান নি।

নবগঠিত অ্যাসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সারা মুসলমান সমাজে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। বাংলা ও বাংলার বাইরে বছর খানেকের মধ্যে মোট ৩৪টি শাখা গড়ে ওঠে। সেই কারণে দলের নামের আগে "সেন্ট্রাল" শব্দটি পরে (১৮৭৮) যুক্ত হয়েছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অসন্তোষ দূরীকরণে দলটি অল্পবিস্তর সাফল্য অর্জন করে। নানা সময়ে বিভিন্ন ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে স্মারকপত্র পেশ করাই ছিল সেটির মুখ্য কাজ। সরকারি মহলে দলটির প্রতি মৌখিক শুভেচ্ছা লিপিবদ্ধ হত বটে, কিন্তু কাজে তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যেত না। ১৮৮২ সালে বড়লাট রিপনের কাছে মুসলমানদের জন্যে অতিরিক্ত (preferential) সুবিধাদির দাবিতে যে স্মারকপত্র পেশ করা হয়েছিল সেটা পরবর্তী বড়লাট ডাফরিনের আমলে নামঞ্জুর হয়ে যায়। চাকরির পরীক্ষায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জাতিগত বৈষম্যমূলক আচরণ সরকারি দৃষ্টিতে অসঙ্গত বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য প্রাদেশিক ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যেখানে মুসলমানেরা সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল সেখানে সুযোগের অসমতা রদ করার উদ্দেশ্যে সরকার পক্ষ থেকে সমতুল সুবিধাদানের সুপারিশ করা হয়। সেইটুকুকেই আমির আলি মুসলমানদের "ম্যাগনা কার্টা" বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ সালে অ্যাসোসিয়েশন কলকাতা হাইকোর্টের কাছে একটি আবেদনে উকিল ও

অ্যাটর্নিশিপ পরীক্ষায় মুসলমানদের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন শিথিল করার জন্যে যে স্মারকপত্র পেশ করে সেটা ফলপ্রসূ হয় নি। দলের অনুরূপ আরও কিছু প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়।[২]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ন্যাশন্যাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হবার পরে নবাব আবদুল লতিফের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে আমির আলির প্রগতিবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ লাগে। আমির আলির দলকে লতিফ "রিফর্মার্স" বলে কটাক্ষ করতেন। মুসলমানদের স্বার্থ ও সমস্যার ব্যাপারে সরকার লতিফের অভিমতকেই প্রাধান্য দিতেন, বিশেষ করে যেসব বিষয়ে আমির আলির অ্যাসোসিয়েশন স্মারকপত্র পেশ করে দাবিদাওয়া জানাত।

১৮৮২ সালের এক স্মারকপত্রে অ্যাসোসিয়েশন প্রস্তাব করে যে আধুনিক জীবনে অচল ও মান্ধাতা আমলের মাদ্রাসা শিক্ষার পিছনে মহসীন ট্রাস্টের অর্থ ব্যয় না করে বরং ইংরেজি শিক্ষার উন্নয়নে সেই অর্থ বরাদ্দ করা হোক। তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে অগ্রণী স্বয়ং লতিফ তার প্রতিবাদ করে বলেন যে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমান সমাজের উপকার হবে বটে কিন্তু ট্রাস্ট ফাণ্ডের দাতার অভিলাষ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। এই আপত্তির সূত্র ধরে অ্যাসোসিয়েশনের পঞ্চবার্ষিকী প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয় যে মুসলমানদের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হল মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান। আমির আলির সমর্থকেরা "মোসলেম ক্রনিকল" পত্রিকায় লতিফের লিটারারি সোসাইটির সমালোচনা করে বলেন যে, উক্ত সংস্থার গোঁড়া ও যুক্তিবিমুখ সদস্যেরা মুসলিম সমাজের সংস্কার ও প্রগতিমুখী যাবতীয় প্রচেষ্টায় বাধ সাধছে। মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে আমির আলি মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষা ও মুক্তির জন্যে আহ্বান জানান, তাতে সোসাইটির রক্ষণশীল সদস্যেরা রুষ্ট হন।[৩]

কলকাতায় ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনের অন্যতম আহ্বায়ক হিসাবে আমির আলির অ্যাসোসিয়েশন যুক্ত হয়েছিল। অপর আহ্বায়কদের মধ্যে ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও সুরেন্দ্রনাথের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। শেষোক্ত দল দুটিতে আধিপত্য ছিল হিন্দুদের। কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমির আলি সম্পূর্ণ সরে থাকেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালান অকটাভিয়ান হিউম আমির আলিকে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্যে অনুরোধ জানান, আলি সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেসের পরবর্তী মাদ্রাজ ও কলকাতা অধিবেশনের আগে তাঁর কাছে অনুরূপ অনুরোধ নিষ্ফল হয়েছিল। কারণ হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশে মুসলিম-

সমাজের কিছু লাভ হবে না বলেই তাঁর ধারণা ছিল। পরিবর্তে তিনি ১৮৮৮ সালে মুসলমানদের এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের আয়োজন করেন। তিনি বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা বদরুদ্দিন তায়েবজীকে এই বলে আশ্বাস দেন যে উক্ত সম্মেলন হিন্দুবিরোধী কোনো পাল্টা প্রচেষ্টা নয়।[৪]

তায়েবজী সার সৈয়দকেও কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলেন যে বড়লাটের কর্মপরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবি স্বীকৃতি পেলে লাভবান হবে হিন্দুরা, মুসলমানের হীনাবস্থা ঘুচবে না। সৈয়দ আহমদ ইংরেজের সঙ্গে সর্বতোভাবে আনুগত্য ও সহযোগিতার পথে সরকারি সুনজরের প্রত্যাশী ছিলেন। লতিফের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে দিয়েই পরিণামে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্য সবচেয়ে কার্যকর হবে। বস্তুত উভয়েই রাজনীতি বিষয়টিকে এড়াতে চাইতেন ইংরেজের বিরাগভাজন হবার আশংকায়। তাই বিপিনচন্দ্র পাল সখেদে লিখেছেন—

> মুসলমান নেতৃগণ তখন বর্তমান ব্রিটিশ রাজকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ইংরেজ দপ্তর-তন্ত্রের বা ব্যুরোক্রেসীর হাত ধরিয়াই তাঁহারা তখন ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন।[৫]

আমির আলি অবশ্য মুসলমানদের স্বার্থে স্বতন্ত্র পথে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তিনি হালে বিশেষ পানি পান নি। অন্যদিকে মুসলিম রাজনৈতিক চেতনা ও প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায় আলিগড়। সার সৈয়দের মৃত্যুর পরে আলিগড়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ১৯০৬ সালে সিমলায় বড়লাটের কাছে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, যার ফল হয়েছিল উত্তরকালে মর্লে-মিন্টো শাসনসংস্কারের মাধ্যমে স্বতন্ত্র মুসলিম নির্বাচকমণ্ডলীর প্রবর্তন। সেই বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় মুসলিম লীগ, যার পিছনে ছিল আমির আলির সানুরাগ সমর্থন! ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকালে তাঁকে করা হয় লীগের লন্ডন শাখার প্রতিনিধি। ১৯১২ সালে কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসাবে মহম্মদ আলি জিন্না আমির আলির মতিগতি ফেরাবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে কংগ্রেসের সভাপতি পদ গ্রহণের আহবান জানান। বলা বাহুল্য আমির আলি সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৬] মুসলিম লীগে উগ্রপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্যে তিনি ১৯১৩ সালে লীগের সংস্রব ছিন্ন করেন। এরপর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়।

হিন্দু ধর্মকেও তিনি নানাভাবে সমালোচনা করেন এবং বলেন যে মুসলমানদের আগমনের পর থেকেই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয়। ভারতের

হিন্দু ও মুসলমানদের বিরোধকে বিলেতের ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের বিরোধের সঙ্গে তুলনাকে তিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন। কারণ খ্রীষ্টধর্মের অন্তর্গত উক্ত দুটি ধারায় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিরোধ থাকলেও তারা একই শাস্ত্র মানে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে হিন্দু-মুসলমানেরা হল—

> Two absolutely antithetical systems existed side by side··· without amalgamation···Hinduism is not merely a religion, but a complex social system···hedged round by stringent rules of caste. No outsider can ever enter its pale···its very exclusiveness has enabled it to preserve···through ages its ancient urges from contamination by foreign influences. Islam···is democratic, tending towards socialism.[৭]

ধর্মচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়ার সময়ে আমির আলির 'এ ক্রিটিক্যাল এগজামিনেশন অফ্ দ্য লাইফ অ্যান্ড টিচিংশ অফ্ মহাম্মদ' (১৮৭৩) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তারই ভিত্তিতে তাঁর 'দ্য স্পিরিট অফ্ ইসলাম' (১৮৯১) গ্রন্থটি রচিত হয়। তাঁর 'এ সর্ট হিস্টি অফ দ্য স্যারাসেনস' (১৮৮৯) গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে। উল্লিখিত দুটি গ্রন্থে ইসলামের উদারতন্ত্রী ভূমিকার এক অভিনব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আলিগড়ের সার সৈয়দ আহমদ যেমন দেখাতে চেয়েছিলেন যে ইসলামধর্ম প্রগতির অন্তরায় নয়, আমির আলির ব্যাখ্যা সেই কথারই যেন প্রতিধ্বনি। উনিশ শতকের যুক্তিবাদী ও উদারতন্ত্রী নবজাগরণের এক অভিনব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছেন আমির আলি তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থ তিনটিতে। সৈয়দ আহমদের চিন্তা থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেন যে উলেমা সম্প্রদায়ের বিকৃত ভাষ্যের উপর নির্ভর না করে মূল কোরাণ পাঠ করাই সমীচীন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সংস্কার আন্দোলনের আগে বুদ্ধিবিভাসিত (enlightenment) আন্দোলন ঘটা আবশ্যক। ধর্মীয় জীবনের পুনর্বিন্যাসের আগে, শত শত বছরের টীকা, ভাষ্য এবং আনুগত্যের অনুশাসন থেকে মনের বন্ধনমুক্তি চাই। ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠান উপাসকের কাছে হৃদয়গ্রাহী না হলে তা বর্জন করাই সঙ্গত। বাহ্যানুষ্ঠানের পরিবর্তে অন্তরের আবেগ হল বড় কথা।[৮]

আমির আলি চাইতেন যে নবম শতকের কিছু ব্যক্তির ব্যাখ্যানে নির্ভর না করে মুসলমানেরা তাদের স্বাধীন বিচার (ijtibad) ক্ষমতা প্রয়োগ করুক এবং

আধুনিক জীবনের প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা ইসলামকে বিশ্লেষণ করুক। তিনি প্রচলিত ধারণা মানতেন না যে, কোরাণ কেবল আরবি ভাষাতেই পড়া বিধেয় এবং সেই ভাষাতেই নমাজ পড়তে হবে। তাঁর দৃষ্টিতে ইসলামের সংস্কার তখনই সম্ভব যখন একথা সবাই উপলব্ধি করবে যে, প্রার্থনা যে-ভাষাতেই উচ্চারিত হোক না কেন তার অন্তর্নিহিত সারবত্তা তাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ভক্তির রস যে-ভাষাতেই নিবেদিত হোক না কেন তা ঈশ্বর গ্রহণ করেন।

আমির আলি ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর রচনাদি সব ইংরেজিতে লিখিত। বলা বাহুল্য ইংরেজি ভাষা স্বল্প সংখ্যক মানুষের কাছেই ছিল বোধগম্য। সাধারণ বাংলাভাষী নিম্নবিত্ত মুসলমানের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। উচ্চবিত্ত আসরাফ শ্রেণীর সঙ্গে নিম্নবিত্ত আতরাফ শ্রেণীর মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বিরাজ করত।

ইংল্যাণ্ডে ছাত্রজীবনে আমির আলির মনোভঙ্গি গঠিত হয়েছিল তাঁর শিক্ষক এবং প্রখ্যাত ঐতিহাসিক উইলিয়াম এডওয়ার্ড হার্টপোল লেকির (১৮৩৮-১৯০৩) প্রভাবে। তাই তিনি ইসলামের ধর্মতত্ত্বকে ভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্লেষণের প্রয়াসী হয়েছিলেন। লেকির চিন্তায় প্রভাবান্বিত আমির আলি দেখাতে চেষ্টা করেন যে ইসলাম হল যথার্থ প্রগতির দ্যোতক ও বাহক। যখন বর্বরদের আধিপত্যে রোম সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত এবং ইউরোপ তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন ইসলাম মানব সভ্যতার উৎকর্ষসাধনে তৎপর ছিল। ধর্ম হল ব্যবহারিক নৈতিকতা এবং ইসলাম সেই নৈতিকতাকে উজ্জীবিত রাখে। সত্য হল সেইটাই যা মানুষের চিত্তকে উন্নীত এবং মানুষকে শুভপথে চালনা করে। ইসলাম এমন এক চিত্তশক্তি যা চিরন্তন সত্য হিসাবে মানবহৃদয়ে নিহিত থাকে। তাই মানুষের ধর্মীয় শুভসত্তার সর্বাধুনিক বিকাশ দেখা যায় ইসলামে, এবং তাতেই মানুষের সহজাত নৈতিক চেতনার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি ঘটে; পয়গম্বর মহম্মদ ছিলেন তারই প্রতিভূ। ইসলাম মানুষের মহত্তম প্রবৃত্তি সমূহকে সমন্বিত করেছে এবং সেই সমন্বিত আবেগই মর্তের ঊষাকালে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৯]

আমির আলির বিশ্লেষণ অনুযায়ী ইসলাম মানুষকে পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে সচেতন করে এবং আত্মত্যাগ, পুণ্যব্রত, আত্মসমীক্ষা এবং শুভাশুভের দ্বন্দ্বে সর্বশক্তিময়ের উপর নির্ভরতাকে উৎসাহিত করে। তাঁর কথায়, "In Islam is joined a lofty Idealism with the most rationalistic practicality." পয়গম্বর হলেন নৈতিকতার শিক্ষক এবং কোরাণ হল মূলত একটি উন্নয়নের প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে মহম্মদের চিন্তনধারা প্রবাহিত।[১০]

মহম্মদের জীবনকথা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমির আলি বলেন যে কোরাণের

বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বর্গের যে রূপক কাহিনীর উল্লেখ আছে তা হল তাঁর মক্কায় অপরিণত বয়সের উক্তি। কিন্তু চেতনার বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে বৈশ্বিক চেতনার সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে। যেসব চিন্তা ছিল ইহমুখী সেগুলি পরে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনালাভ করে। সময়ের পরিবর্তনে এবং ধর্মীয় চেতনার উন্নতি ও বিকাশের সঙ্গেই শুধু তাঁর মন এগিয়ে চলে নি, শিষ্যবর্গের আধ্যাত্মিক বিকাশও তাঁর মনকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

আমির আলি মনে করতেন যে ইসলামের অনুশাসন বিভিন্ন স্থান, কাল ও পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রগতির বিভিন্ন পর্বে ইসলামী নীতিকথার এই সংগতি মহম্মদের প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় দেয়। উপকারিতা ও কার্যকারিতার নিরিখে ইসলামী অনুশাসনের স্থিতিস্থাপকতা প্রমাণিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে ধর্ম হিসাবে ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ, কারণ সভ্যতার ভাণ্ডারে ইসলাম এমন সব দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সংযোজন করেছে যা মানুষের হৃদয়কে করে মহৎ ও চিত্তকে করে উন্নীত। ইসলাম সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, "It inaugurated the reign of intellectual liberty."[১১]

তিনি অবশ্য একথাও বলতেন যে ইসলামই একমাত্র প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম নয়, প্রয়োজন ও সত্যের নিরিখে অনন্য নয়। জনসাধারণের উন্নয়নের জন্যেই ধর্মের যাকিছু প্রয়োজন। সকলের মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হলে ধর্মের প্রয়োজন নেই। তিনি সেই দিনের প্রতি তাকান যেদিন ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম মিশে যাবে। তাঁর দৃষ্টিতে উভয়ের লক্ষ্য সমান—মানুষকে উন্নীত করা।

ঐতিহাসিক লেকির রচনাদি ছাড়াও জার্মান দার্শনিক ডেভিট ফ্রেডরিখ স্ট্রৌস (১৮০৮-৭৪) লিখিত 'লাইফ অফ জেসাস' গ্রন্থটি আমির আলিকে প্রভাবিত করেছিল। গ্রন্থটিতে লেখক যিশুকে একটি ভাবের প্রতীক হিসাবে দেখিয়েছেন— যে-ভাব মানুষকে উৎকর্ষের দিকে চালিত করে। ইসলামও তেমনি যেন একটি যন্ত্রের চলনশক্তির সহায়কবিশেষ। যুক্তিবাদ ও যুক্তিধর্মের মহত্তর আদর্শের প্রয়োজনে রক্ষণশীল "তকলিদ" অর্থাৎ ইসলামী অনুশাসনের প্রচলিত অনুকরণ রীতিকে সরে যেতে হবে। আমির আলি অদ্ব্যর্থ ভাষায় বলেন যে ইসলাম মূলত একটি রিপাবলিক্যান রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিপোষক যেখানে সবাই সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকারী।[১২] ইসলামকে আমির আলির এই আধুনিকীকরণের প্রয়াস, বলা বাহুল্য মুসলিম দুনিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামকে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় একটি বিশ্বশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

রা ষ্ট্র চি ন্তা

আমির আলির আত্মকথা ও বিভিন্ন লেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের পরিবর্তে সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতিসূত্রে তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়।

হিন্দু-মুসলিম বিভেদের কারণ হিসেবে তিনি ইংরেজদের আধুনিক ঢঙে শাসনব্যবস্থার সংস্কারপ্রয়াসকে দায়ী করেন। তিনি মনে করতেন যে ইংরেজরা সংখ্যালঘুদের স্বতন্ত্র সত্তা উপলব্ধি করে না; পরিবর্তে তারা পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলীর প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করে উভয় সম্প্রদায়কে কৃত্রিম উপায়ে অভিন্ন নির্বাচক-মণ্ডলীর মাধ্যমে ঐক্যবন্ধ করতে চায়; কিন্তু সেটা কার্যকর নয়। অতীতে অনেক মহান ব্যক্তি, এমনকি সম্রাট আকবরেরও অনুরূপ প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নি।[১৩]

তিনি লর্ড মর্লের কাছে এক স্মারকপত্রে (১৯০৯) অব্যর্থ ভাষায় বলেন যে মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব বাস্তবানুগ হওয়া উচিত। যাতে প্রতিনিধিরা নিজেদের সংখ্যা ও স্বাতন্ত্র্যে মুসলমানদের অভাব-অভিযোগ, স্বার্থ ও সমস্যাকে স্বাধীন ও মুক্তকণ্ঠে তুলে ধরতে সক্ষম হয়। তাই তিনি তখন পশ্চিমী ধাঁচে প্রস্তাবিত Proportional Representation প্রথাকেও সমর্থন করেন নি।

ভারতের সোয়া কোটি মুসলমানকে সাধারণ একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে দেখার তিনি বিরোধী ছিলেন। অমুসলমানদের সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র বসবাস করলেও ভারতীয় মুসলিমদের সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেন যে "they form a distinct nationality divided by traditions of race, religion and ideals."[১৪]

তিনি মনে করতেন যে ভারতের মতো একটি মধ্যযুগীয় অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থায় যদি একটা আধুনিক সংবিধান চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বর্ণহিন্দুরাই প্রভুত্ব করবে, নিচু জাতের হিন্দুদের উপর ধর্মীয় প্রভাব খাটাবে, আর অনুন্নত মুসলমানদের উপর আর্থিক ঋণ দিয়ে আধিপত্য চালাবে। তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্রী শাসনে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুদের উপর আধিপত্যের সুযোগ খোঁজে, সংখ্যালঘুরা ভীত দৃষ্টিতে উৎপীড়নের সম্ভাবনা দেখতে পায়। একটি সম্প্রদায় ভোটের জোরে অপর সম্প্রদায়ের উপর আধিপত্য করবে, সেটা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি অভিযোগ করেন যে ব্রিটিশ সরকার সংখ্যাগুরুদের তোয়াজ করতেই ব্যস্ত।[১৫]

আর্থনীতিক চিন্তা

দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকে আমির আলি বিভিন্ন সময়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সুতিবস্ত্র আমদানির উপর থেকে শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হ্রাস করার সরকারি নীতিকে (১৮৮০) তিনি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ বলে নিন্দা করেন। আফগান যুদ্ধে সরকারের মাত্রাধিক ব্যয়নির্বাহ তাঁর কাছে অসঙ্গত বলে মনে হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে ইংরেজ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। ইংরেজ আমলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেও লোকের ব্যয়বৃদ্ধি ঘটে প্রায় বিশ গুণ বেশি। টাকার মূল্য হ্রাস পায়। ব্যবসাবাণিজ্যে সাধারণের বিশেষ লাভ নেই। সরকারি চাকরিতে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। চাষীরা নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের কিছু মজুরি বেড়েছে বটে, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রায় বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। সারা দেশে কিছু সংখ্যক মানুষের নামমাত্র আর্থিক উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু বৃহত্তর জনজীবন দারিদ্র্যে জর্জরিত। কারণ হিসাবে আমির আলি দেখিয়েছিলেন যে সরকার দেশবাসীর ঘাড়ে নানা ধরনের কর চাপিয়েছে এবং দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছে ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, সঞ্চয়, পেনশন ইত্যাদি বাবদ। সেই টাকা আবার মূলধন আকারে এদেশে ফিরে আসছে।

আমির আলি আক্ষেপ করেন যে বিলাতি জিনিস কেনার শখ মেটাতে দেশকে বিপুল অর্থ নগদ দিতে হয়। দেশের টাকা যাতে বিদেশে চলে না যায় সেজন্যে তিনি ব্যয়বহুল বিদেশী কর্মচারী নিয়োগের পরিবর্তে দেশীয় কর্মচারী বেশি সংখ্যায় নিয়োগের সুপারিশ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে সেই সময়ে পুলিশ ও প্রশাসনে ব্যয়ের পরিমাণ অনেকাংশে ছিল নিষ্প্রয়োজন ও অপচয়মাত্র।[১৬]

উনিশ শতকের আশীর দশকে পাবনা, ফরিদপুর এবং দাক্ষিণাত্যে যেসব বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার পিছনে তিনি রায়তের অসন্তোষকে মূল কারণ বলে দেখিয়েছেন। মহাজন ও সুদীকারবারিদের কাছে কৃষকেরা আজীবন ঋণজালে আবদ্ধ থাকে। রাজস্ব আদায়ের তিনি সরকারি কঠোরতার সমালোচনা করেন। খরা ও বন্যার সময়ে রাজস্বনীতি শিথিল হওয়া উচিত। ভূমিব্যবস্থার বিষয়ে আমির আলি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেন। রায়তের উপর ভূস্বামীদের অত্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে আইন সভায় জমিদারদের প্রতিনিধি থাকে, কিন্তু রায়তের থাকে না। খাজনা আদায়ের ব্যাপারে সরকার জমিদারবর্গকে যেমন সাহায্য করে, রায়তের স্বার্থেও সরকারের তেমনি সহায়তা থাকা উচিত।[১৭]

আমির আলির মতে কৃষির উন্নয়নে জমিদারবর্গেরও দায়িত্ব কম নয়। জমির মালিকানা ও হস্তান্তরে রায়তের অধিকার এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের সচেতন করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। রায়তের জন্যে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা এবং কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের মাধ্যমে জমিদার ও রায়তের উপকার এবং ভূমির উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা থাকা উচিত। কারণ দেশের জনসংখ্যা কৃষিনির্ভর।[১৮] ঋণ ও বন্ধকের দায়ে রায়তেরা যাতে মহাজনদের হাতে নিগৃহীত ও জমি থেকে তাদের যাতে উৎখাত না করা হয় সেই মর্মে আমির আলি মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের সময়ে সরকারের কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন।

শিক্ষাচিন্তা

শিক্ষাবিস্তারের বিষয়ে আমির আলি মনে করতেন যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যুবকদের একই প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ভ্রান্তনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ জাতিগত ভিন্ন আদর্শ, ধর্মের মান, নৈতিকতার তাগিদ সমান নয় বলে তাদের উন্নয়ন সমান তালে ও গতিতে সম্ভব নয়। তাই তিনি জাতি ও ধর্মগত আদর্শ এবং নৈতিকতার মান অনুযায়ী হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্যে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেন। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধারা ও পারস্পরিক মৌল স্বাতন্ত্র্য থাকায় সেইসব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের পক্ষেও সম্প্রদায়গত বিশ্ববিদ্যালয় কার্যকর হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

আমির আলি মনে করতেন এদেশে উচ্চশিক্ষায় ব্যয়বাহুল্য অর্থহীন। ভারতের বত্রিশ কোটি জনসংখ্যার ত্রিশ কোটি কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন উচ্চশিক্ষায় অধিকাংশ মানুষের কোনো প্রয়োজন নেই। সরকারি চাকরি ও পেশাগত কাজ বিশেষ করে আইনজীবীদের কাছে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন আছে। শহরবাসী উচ্চবর্ণের হিন্দু ও কিছু সম্পন্ন মুসলমান তাদের সন্তানসন্ততিদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্যে পাঠায়।[১৯]

উপসংহার

আধুনিক ভারতে স্বতন্ত্রখাতে প্রবহমান মুসলিম সমাজের একাত্মবোধকে রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সমন্বিত করার কাজে প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আমির আলি। অন্যদিকে আবদুল লতিফ ও সার সৈয়দের প্রচেষ্টা ছিল কেবল মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় উন্নত করা; প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে এঁরা দুজনেই দূরে থেকেছেন, ভারতভূমিতেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র সীমিত

ছিল। পক্ষান্তরে আমির আলির খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাংলা তথা ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়।

আমির আলি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে কিভাবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইরাণ থেকে এসে সুন্নি অধ্যুসিত ভারত তথা বাংলায় বসবাস শুরু করেন। শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত আমির আলি কলকাতার মুসলমান সমাজেও ছিলেন স্বতন্ত্র। বাংলার কিংবা ভারতের মাটির প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো টান ছিল না। তিনি নিজেকে বিশ্ব-মুসলিম সম্প্রদায়ের একজন বলে মনে করতেন।

আমির আলির সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য ও সার্থক লেখনীশক্তি। মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কিত সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়ে বহু প্রবন্ধ ও কয়েকটি গ্রন্থ রচনার ফলে তিনি বিশ্বখ্যাতির অধিকারী হন। তাঁর দ্বিতীয় বড় পরিচয় হল ভারতীয় মুসলমান সমাজে মননশীল আধুনিকতার সঞ্চার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস। তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্জুমান গঠিত হয়। সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে মুসলমানদের বক্তব্য প্রচার করা।

ইতিহাস ও ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থাদি রচনার পিছনে তাঁর কোনো পাণ্ডিত্যাভিমান ও মৌলিকতার দাবি ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খ্রীস্টান সমালোচকদের সমুচিত জবাব দিতে, নিজেদের ধর্ম ও ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ-ভাবে মুসলমানদের সচেতন করে তুলতে এবং অমুসলমানদের কাছেও ইসলামের মহিমা প্রচার করতে। মুসলিম আইন সম্পর্কে বিচারকদের অজ্ঞতা ও বিচারে ভ্রান্তি নিরসনের জন্যে তিনি মুসলিম আইনগ্রন্থ লেখেন, তাতে রাজশক্তির সঙ্গে মুসলমানদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। মূলত ইংরেজ শাসকদের অনুগ্রহ ও পক্ষপুটেই তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নতি। মুসলমানদের স্বতন্ত্র দল গঠনের পিছনেও ছিল তাঁর সেই একই উদ্দেশ্য। উল্লেখ্য যে তাঁর সেন্ট্রাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশনে যাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা স্বভাবতই ছিলেন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত। সেদিন তাঁদের প্রধান দাবি ছিল সরকারি চাকরিতে আরো বেশি সংখ্যায় মুসলিম প্রার্থীর নিয়োগ।

হিন্দুদের সঙ্গে তিনি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন বলে আমির আলি লিখেছেন। বস্তুত রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার ব্যাপারে মুসলমানদের তিনি প্রতিনিবৃত্ত করতেন। ভাইসরয় মর্লেকে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত করার পিছনে লন্ডনে আমির আলির ভূমিকা ছিল অনেক। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি সরকারকে সমর্থন করেন। ভারতে হিন্দু-মুসলিম বিভেদচিন্তার তিনি ছিলেন প্রথম তাত্ত্বিক প্রবক্তা।

উৎস নির্দেশ

১. Syed Ameer Ali. *Memoirs and other Writings.* Syed Razi Wasti (ed). Lahore. 1968.

২. B. B. Majumdar. *Indian Political Associations and Reforms of Legislature.* pp. 223-6.

৩. Abu Imam. "Some Aspects of Muslim Politics and Personalities in India in the later Nineteenth Century", *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies.* Rajsahi, 1977. p. 65.

৪. B. B. Majumdar. "The Congress and the Moslems", *Quarterly Review of Historical Studies.* v. 5, no. 2. 1965. pp. 65-66.

৫. বিপিনচন্দ্র পাল। 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ'। ১৯২২। পৃ. ৪।

৬. P. Hardy. *The Muslims of British India.*

৭. Syed Ameer Ali. *op. cit.* pp. 76-77.

৮. Syed Ameer Ali. *The Spirit of Islam.* London, 1955. p.186.

৯ P. Hardy. *op. cit.* pp. 105-6.

১০. Syed Ameer Ali. *A Critical Examination of the Life and Teachings of Mohammed.* p. 281.

১১. *Ibid.* p.345.

১২. Syed Ameer Ali. *The spirit of Islam.* p. 289.

১৩. *Ibid.* p. 78-9.

১৪. *Ibid.* p. 83.

১৫. *Ibid.* p. 100.

১৬. *Ibid.* p. 130-7.

১৭. *Ibid.* p. 144-8.

১৮. Syed Ameer Ali. "Some Indian suggestions for India", *Nineteenth Century.* v.7. June, 1880. pp. 963-978.

১৯. Syed Ameer Ali. *Memoirs and other Writings.* pp. 93, 224.

৪ উদারনৈতিক মতাদর্শ

পরিপ্রেক্ষিত

রামমোহনের আমল থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সময় অবধি এদেশে যে-সাজাত্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা উত্তরোত্তর বিকশিত হয় তা মোটামুটি দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল—একটি সাংস্কৃতিক, অপরটি রাজনৈতিক। মনন ও সাধনায় রামমোহন দুটিকেই যুক্ত করেছিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি ছিলেন মডারেট অর্থাৎ নরমপন্থী। আর রাষ্ট্রচিন্তায় ছিলেন উদারনৈতিক নিয়মতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর সেই আদর্শেরই বিস্তার দেখা যায় পরবর্তীকালের রাজনীতিকদের চিন্তায়। উনিশ শতকের শেষাবধি দেশের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যায়ক্রমে মডারেট নেতৃবৃন্দেরই ছিল একাধিপত্য। রানাডে, নৌরজি, ফিরোজ শাহ্ মেটা, গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ যে-শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনীতিকবৃন্দ রামমোহনের মডারেট রাষ্ট্রচিন্তার পরিপুষ্টি সাধন করেন, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের স্থান ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই অনন্যসাধারণ। সারা ভারতের নবজাগ্রত অথচ অসংবদ্ধ জাতীয়তাবোধকে একই "নেশন"-এর চেতনায় আবদ্ধ করার প্রথম কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথের।[১] তিনি যখন সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ করেন (১৮৭৫) সে-সময়ে সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও দলীয় রাজনীতি ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। উক্ত ধারার উৎপত্তি ও বিকাশ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন।

১৮৩০ সালে ১০ ডিসেম্বর তারিখটি ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয়। সেদিন কলকাতার টাউন হলে ফরাসি বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সভায় দুই শতাধিক নাগরিক যোগদান করেছিলেন। আজকের দৃষ্টিতে সেদিনের ঐ সভার তাৎপর্য পুরোপুরি উপলব্ধি করা হয়তো সম্ভব নয়—কারণ দেশের রাষ্ট্রচেতনার তখন সবেমাত্র শুরু। সে বছরেই বড়দিনে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর অক্টারলোনি মনুমেন্টে ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলিত অবস্থায় দেখা যায়।

রামমোহন ফরাসি বিপ্লবাদর্শের অনুরাগী ছিলেন। তাঁর বিলাতযাত্রার পর বাংলাদেশে দুটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী দেখা দেয়। প্রথমটি তাঁর চিন্তায় আংশিকভাবে প্রভাবিত "ইয়ং বেঙ্গল" নামে পরিচিত ডিরোজিও-শিষ্যদের

দল। দ্বিতীয় দলটি ছিল তাঁর উদারতন্ত্রী ও নরমপন্থী আদর্শের অনুবর্তী। সম্ভবত ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্যরাই মনুমেন্টে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।[২]

হিন্দু কলেজকে (পরবর্তীকালের প্রেসিডেন্সি কলেজ) কেন্দ্র করে ইয়ং বেঙ্গল দলটি গড়ে ওঠে। তখন রামমোহন দেশেই ছিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ এবং যুক্তিবাদী স্বাধীনচিন্তায় বিশ্বাসী এই দলের দীক্ষাদাতা ছিলেন হিন্দু কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুইস ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। ডিরোজিওর শিষ্যদের মধ্যে যে-চারজনের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায় তাঁরা হলেন—রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষ। দলের দ্বিতীয় সারির অন্যতম ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। আবার সরাসরি ডিরোজিওর শিষ্য না হলেও অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁর ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীদের স্বাধীন ও যুক্তিবাদী চিন্তার ফলে সমসাময়িককালে তাঁদের প্রতি যথারীতি কুৎসা বর্ষিত হয়। হিন্দু কলেজ থেকে ডিরোজিওর কর্মচ্যুতি ঘটে। যথেষ্ট কুখ্যাতি সত্ত্বেও নব্যবঙ্গ-গোষ্ঠীর সবাই যে নাস্তিক ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। ধর্ম ও সমাজসংস্কারে তাঁরা অনেকেই বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন।

দর্শন, বিজ্ঞান এবং সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা, বিচারবিতর্ক ও পারস্পরিক সংযোগের এক মিলনকেন্দ্র হিসাবে ডিরোজিও "অ্যাকাডেমিক অ্যাসোশিয়েসন" (১৮২৮-৩৯) স্থাপন করেছিলেন। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর অ্যাসোশিয়েশনের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন ডেভিড হেয়ার। নব্যবঙ্গ দল রামমোহনের আধ্যাত্মিকতা-মিশ্রিত নরমপন্থী রাষ্ট্রদর্শন গ্রহণ করেন নি। তাঁরা ভারতে রামমোহন-প্রস্তাবিত ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের পরিপন্থী ছিলেন। স্বায়ত্তশাসন ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাই ছিল তাঁদের স্বপ্ন। ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা এবং সমাজচিন্তার সুবিধার্থে তাঁরা "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" (১৮৩৮) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নব্যবঙ্গ দলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১) পত্রিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং 'দ্য এনকোয়ারার' (১৮৩১) পত্রিকায় ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা থাকত।

দ্বিতীয় যে-রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকেই বলা চলে রামমোহনের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার যথার্থ উত্তরাধিকারী। উদারনৈতিক রামমোহন চেয়েছিলেন নরমপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক ধারায় এবং সংঘবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক উন্নতি। ইংরেজদের সমতুল্য অধিকার ও মর্যাদার ভিত্তিতে তিনি ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্তি কামনা করেন। লিখিতভাবে ডোমিনিয়ন্ স্টেটাসের চিন্তা ডারহাম রিপোর্টে (১৮৪০) প্রথম

পাওয়া যায়। বস্তুত তার আগেই রামমোহনের মনে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভাবনা অংকুরিত হয়েছিল। রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার পরিপুষ্টিসাধনে ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) এবং তৎসূত্রে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫)-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'নীতিদর্শন' (১৮৪১) গ্রন্থে সাজাত্যবোধ ও রাষ্ট্র-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। রামমোহনের রাষ্ট্রচিন্তার সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৬), প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৮০১-১৮৬৮) প্রমুখ শিষ্যবর্গ। রামমোহনের গুণানুরাগী রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডামও ছিলেন এই দলে। গণতান্ত্রিক প্রশাসন, বিচারপদ্ধতির সংস্কার প্রভৃতি রাজনৈতিক দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠী প্রথম দিকে আলোচনা-সভার আয়োজন এবং সেইসঙ্গে একাধিক সংবাদপত্র প্রকাশনায় উদ্যোগী হন। দ্বারকানাথ 'ইন্ডিয়ান গেজেট'-এর স্বত্ব ক্রয় করে তাঁর অপর একটি পত্রিকা 'বেঙ্গল ক্রনিকল'-এর সংগে সেটিকে যুক্ত করে দেন। প্রসন্নকুমার 'দ্য রিফরমার' (১৮৩১) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সুবিধার্থে এই গোষ্ঠী প্রথমে 'জমিদারি অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৩৭), নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন; পরে সেটির পরিবর্তিত নাম হয় "ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি" (১৮৩৮)। বস্তুত উক্ত নামে এই জমিদার-সভাই এদেশের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে "ব্রহ্মসভা" ও রক্ষণশীলদের "ধর্মসভা"র বিরোধ স্তিমিত হয়ে পড়ে। উভয় গোষ্ঠীর সমর্থক ও নেতৃস্থানীয়রা জমিদার সভায় সংযুক্ত হন। তাঁরা নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের সংগেই সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক উন্নতির বিষয়কেও গুরুত্ব দিতেন। এঁরা সর্বভারতীয় সংযোগ ও সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতেন। সমসাময়িককালে বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত অনুরূপ রাজনৈতিক দলগুলির সংগে এঁদের সংযোগ ছিল। বিলাতে রাজনৈতিক প্রচারের সুবিধার্থে রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডাম ইংল্যান্ডে "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি" (১৮৩৯) নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। "ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি"র সংগে উক্ত "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি"র ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বিলাতে ভারতীয়দের, বিশেষ করে জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সুবক্তা ও সুপরিচিত রাজনীতিজ্ঞ জর্জ টমসন-কে (১৮০৪-৭৮) প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। উনিশ শতকে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ আন্দোলনের স্বনামধন্য নেতা উইলবারফোর্সের অন্যতম সহকারি ছিলেন টমসন। তিনি সেই কাজে আমেরিকাতেও কিছুকাল আন্দোলন পরিচালনা করেন। রামমোহনের বিলাত

ভ্রমণের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে দ্বারকানাথ নিজেও প্রচারকার্যের প্রয়োজনে বার-দুয়েক (১৮৪২ ও ১৮৪৪) বিলাতযাত্রা করেন। বিলাত থেকে প্রথমবার প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি টমসনকে সংগে এনেছিলেন। দ্বারকানাথের উদ্দেশ্য ছিল টমসনের সাহায্যে এদেশে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। টমসন কলকাতায় একটি রাজনৈতিক আলোচনা-কেন্দ্র গঠন করেন।[৩]

ইয়ং বেঙ্গল দলের রাষ্ট্রচিন্তায় বিপ্লবী মনোভাবের প্রাধান্য ছিল; আধুনিক কালের রাজনৈতিক পরিভাষায় তাঁদের "বামপন্থী" বলা যেতে পারে। টমসনের প্রভাবে তাঁরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে উৎসাহিত বোধ করেন। রামমোহনের নরমপন্থী চিন্তার অনুসারী দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার প্রমুখ রাষ্ট্রীয় সংস্কারবাদীদের সঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের সেতুবন্ধ ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৫-১৮৫৭)। নিজের একান্ত শিষ্য তারাচাঁদকে রামমোহন ব্রহ্মসভার প্রথম কর্মসচিব করেছিলেন। তারাচাঁদের উপর ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায়। জ্ঞানান্বেষণ-সভায় মধ্যপন্থী তারাচাঁদ ও চরমপন্থী রামগোপালের মিলন ঘটে। প্রধানত তারাচাঁদেরই উদ্যোগে 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' (১৮৩২-৪৩) নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তারাচাঁদের অনুগামীদের "চক্রবর্তী ফ্যাকশন" বলা হত।[৪] তারাচাঁদ 'দ্য কুইল' নামে একটি রাজনৈতিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। টমসনের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইয়ং বেঙ্গল প্রধানত তারাচাঁদের নেতৃত্বে "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি" (১৮৪৩) নামে পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করেন। দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত "ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি" ছিল ধনী অভিজাত সম্প্রদায়ের সমিতিবিশেষ। আর নবগঠিত "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি" হল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান। ডিরোজিও-পন্থী নব্যবঙ্গ দলের বিভিন্ন সভা ও পত্রপত্রিকার ক্রিয়াকলাপ সাধারণত তাত্ত্বিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকত। বস্তুত টমসনের উপদেশেই তাঁরা উগ্র মনোভাব পরিত্যাগ করে সংঘবদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে পদক্ষেপ করেন।

কিন্তু অচিরেই উল্লিখিত দুটি দল নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তবে অনতিকাল পরে এক নতুন পরিস্থিতির ফলে উভয় দলের সংযুক্তি ও নতুন উদ্যম দেখা দেয়। সমসাময়িককালে কোম্পানির আদালতে ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে বিচার এখতিয়ার বহির্ভূত ছিল। কেবল সুপ্রিম কোর্টেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যেত। তাতে মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে মফস্বল থেকে বিবাদী কারো পক্ষে কলকাতায় এসে মামলা চালানো খুবই অসুবিধাজনক ছিল। এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে ভারত সরকারের আইন সচিব বেথুন ১৮৪৯ সালে চারটি বিল উত্থাপন করেন। তাতে ইউরোপীয়রা ক্ষিপ্ত হয়ে "কালা কানুন" নাম

দিয়ে সেই বিল চতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। বিলগুলির সমর্থনে রামগোপাল ঘোষ দীর্ঘ এক নিবন্ধে ও বিভিন্ন সভাসমিতিতে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। পরিণামে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। সরকার বিল চারটি প্রত্যাহার করে নেন। এই ঘটনায় কলকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়। তাঁরা অনুভব করেন সক্রিয় প্রয়াস ও একটি সংযুক্ত দলের প্রয়োজন। কোম্পানির আসন্ন চার্টার অ্যাক্ট নবীকরণের (১৮৫৩) পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন শাসন সংস্কারের প্রয়োজনও তাঁরা অনুভব করেন।

এই নতুন প্রেক্ষাপটে ১৮৫১ সালের ৩১ অক্টোবর তারিখটি বাংলাদেশের সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয়। এইদিন দেশের প্রথম "যুক্তফ্রন্ট" গঠিত হয়েছিল।[৫] রক্ষণশীল, উদারনৈতিক, চরমপন্থী প্রভৃতি সবাই একই দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" নামে নতুন একটি দলে "ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি" এবং "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি"র সংযুক্তি ঘটে। রাধাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথাক্রমে নবগঠিত এই দলের সচিব ও সভাপতি নির্বাচিত হন।

রামমোহনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার, তারাচাঁদ প্রমুখ নরমপন্থী ও উদারতন্ত্রীদের নেতৃত্ব ১৮৪৩ সাল অবধি বিস্তৃত। অতঃপর রামমোহনের চিন্তায় প্রভাবিত কিন্তু সরাসরিভাবে দীক্ষিত নন যাঁরা তাঁদের উপর এই উদারনৈতিক ধারার নেতৃত্ব এসে পড়ে। এঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের তৎপরতা ১৮৬১ সাল অবধি প্রত্যক্ষ করা যায়। তারপর "ভারতসভা" (১৮৭৬) প্রতিষ্ঠার প্রাক্কাল অবধি রামমোহনের চিন্তা ও আদর্শের বাহক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিদ্বদ্বর্গ।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শক্তি ও কর্মতৎপরতা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। স্থানিক ভিত্তিতে তার কোনো শাখা গঠিত হয় নি; চাঁদার হার (পঞ্চাশ টাকা) সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত ছিল। বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ সংস্কারকেরা নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযোগী একটি গণতান্ত্রিক দলের প্রয়োজন অনুভব করেন।[৬] 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা পর্যটন করে জেলাভিত্তিক কয়েকটি সমিতি (১৮৭২) গঠন করেছিলেন। তাঁর প্রয়াসে ঐ সমিতিগুলির সমন্বয়ে "ইন্ডিয়া লীগ" নামে (১৮৭৫) একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন ছিল লীগের অন্যতম প্রধান দাবি। শিশিরকুমার দলটিকে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে

পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম দিকে কৃষ্ণদাস পাল, নবগোপাল মিত্র, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস প্রমুখ তদানীন্তন সকল বাঙালি রাষ্ট্রনেতাই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে লীগের অধিকাংশ সদস্য পদত্যাগ করে ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই "ভারতসভা" ("ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন") স্থাপন করেন।[৭]

"ভারতসভা" প্রথম সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। যাঁদের উদ্যোগে এই সভার জন্ম তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের প্রয়াসে সভা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শাখা বিস্তার করে। দেশ-ব্যাপী প্রচার-অভিযান ও প্রথম সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের বিষয়ে অবশ্য কেশবচন্দ্রই ছিলেন পুরোগামী। কিন্তু ধর্ম ও সমাজসংস্কার ছিল তাঁর কর্মতৎপরতার সীমানা। সেদিক থেকে সুরেন্দ্রনাথকে সারা ভারতের প্রথম রাজনৈতিক নেতা বলা চলে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে একই নেশনের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করার প্রথম প্রয়াসী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। রামমোহনের মডারেট ও লিবার‍্যাল রাষ্ট্রচিন্তাকে সুরেন্দ্রনাথ অভিজাতশ্রেণীর মজলিশ থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠায় সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের অনতিকাল পূর্বের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস বিচিত্র ঘটনা ও বহুবিধ পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। সিপাহি বিদ্রোহের পরে কোম্পানির পরিবর্তে সরাসরি ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর (১৮৫৭) প্রতিষ্ঠা; প্রথম ভাইসরয় ক্যানিং-এর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট (১৮৬১); নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০); ফরায়েজি (ওয়াহাবি নামে কথিত) আন্দোলনের সূত্রধরে উত্তর বঙ্গে কৃষকবিদ্রোহ (১৮৭২-৭৩); হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবর্তনস্বরূপ রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে "হিন্দুমেলা"র (১৮৬৭) সূত্রপাত; "মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন" (১৮৫৬), "মহামেডান লিটারারি সোসাইটি" (১৮৬৩) এবং "সেন্ট্রাল ম্যাহোমেডান অ্যাসোসিয়েশন"-এর মাধ্যমে মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধের উৎপত্তির কথা আগের পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

ইংরেজ শাসনের সঙ্গেই এদেশে "নেশন" ও "ন্যাশন্যালিজম" শব্দ দুটির বিস্তৃতি ঘটে। মোগল আমলের শেষ দিকে বহুধা-বিভক্ত ভারতভূমি ইংরেজ শাসনাধীনে সংযুক্ত হয়। ক্রমে টেলিগ্রাফ, রেলপথ প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের মধ্যে মানসিক নৈকট্যের পথ প্রশস্ত করে তোলে। কিন্তু কেবল ভৌগোলিক অখণ্ডতায় নেশন গঠিত হয় না। নেশনের মূল উপাদান দেশবাসীর আবেগসম্পন্ন ঐকাত্ম্যবোধ।

রামমোহন থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত ভারতের জাতীয় ঐকাত্ম্যবোধ ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণাঙ্গ নেশনের রূপ দিয়েছিলেন। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে ক্রমে এদেশে জাতীয়তাবাদ, উদারতন্ত্র, আধুনিক প্রশাসন, সংসদীয় গণতন্ত্র ও পার্টি রাজনীতির উদ্ভব ঘটে।

রামমোহনের সমসাময়িককালে ডিরোজিও-র নেতৃত্বে চরমপন্থী নামে অভিহিত যে এক দার্শনিক বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে তার সংগে উনিশ শতকের শেষ-দিককার চরমপন্থীদের কোনো মিল ছিল না। ডিরোজিওপন্থীরা যুক্তি, স্বাধীন চিন্তা এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাস করতেন। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনে অনুপ্রাণিত এই গোষ্ঠীর সদস্যদের মনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন উদিত হয়ে থাকলেও তা অর্জনের কোনো সক্রিয় পন্থা তাঁরা অবলম্বন করেন নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ধারার ভগীরথ লাল-বাল-পাল ও অরবিন্দ প্রমুখ "জাতীয়তা-বাদীরা" ভক্তিবাদ, অবতারবাদ, লীলাবাদ, অলৌকিকত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেন। শক্তির বোধনকল্পে তাঁরা কালী, দুর্গা, ভবানী, বগলা প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন। শিবাজী ছিলেন তাঁদের আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও দয়ানন্দ সরস্বতী-র (১৮২৪-৮৩) হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তাকে অনেকাংশে ভিত্তি করে এই ধারা গড়ে ওঠে।[৮] বিদেশী শাসনের অবসান-কল্পে এঁরা নানাবিধ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন।

"মডারেট" বা নরমপন্থীদের "কনস্টিটিউশনালিস্ট" এবং "এক্সট্রিমিস্ট" বা চরমপন্থীদের "ন্যাশনালিস্ট" নামে উল্লেখ করা হত। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে চরমপন্থী চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের সূত্রপাত ঘটে থাকলেও মহারাষ্ট্র ও বাংলাদেশের "জাতীয়তাবাদী" নামে পরিচিত কর্মীরা মডারেট নীতির বিপরীত সংগ্রামী কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসেরই ভিতরে থেকে ১৯০৬ সালে প্রকাশ্যভাবে একটি দল গঠন করেন।[৯]

নরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজেরই পক্ষপুটে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন চাইতেন। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজ-নৈতিক আদর্শে উদারনৈতিক মনোভাব, তথ্যনির্ভর চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্য ছিল; চিন্তায় পাশ্চাত্য প্রভাব ছাড়াও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনাও ছিল প্রচ্ছন্ন। অপরদিকে চরমপন্থীরা ছিলেন খাঁটি স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ; তাঁরা চাইতেন আপসহীন প্রতিরোধ ও পূর্ণ স্বাধীনতা। পূর্বতন আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদকে তাঁরা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিমিশ্রিত করেন। পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায় (১৮৫৬-১৯২৮) ছিলেন মুসলমান ও অহিন্দু ধর্মবিরোধী আর্যসমাজে দীক্ষিত। মহারাষ্ট্রে হিন্দু অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক (১৮৫৭-১৯২০) গণপতি ও

শিবাজী উৎসবের (১৮৯৩ ও ১৮৯৫) সঙ্গে গোরক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উদ্ভাবক বিপিনচন্দ্র পাল হিন্দু জাতীয়তাবাদে পুরোপুরি উদ্বুদ্ধ না হলেও শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের অন্তরাত্মা মনে করতেন। লালা লাজপতের উপর বর্মায় অন্তরীণ আদেশ (১৯০৭) জারি হওয়ায় বিপিনচন্দ্র ত্রস্তচিত্তে সারা দেশে রক্ষাকালী পূজা ও শ্বেতছাগবলীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত জগদ্ধাত্রীর ছবি। অন্যদিকে অনুশীলন সমিতির অন্যতম একটি গোষ্ঠীর মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচ্ছদে থাকত খড়্গসহ মা কালীর হাত। জনশক্তির বোধন ও শত্রুনিধনকল্পে বরোদায় অরবিন্দ বগলা মূর্তি গড়িয়ে পূজা করেন (১৯০৩)। গুপ্ত সমিতিতে নবাগত কর্মীদের তিনি এক হাতে গীতা এবং অপর হাতে তলোয়ার দিয়ে বিপ্লবের শপথ গ্রহণ করাতেন। লাল-বাল-পাল নামে অভিহিত এই তিনজন আর অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী দলের প্রধান চার স্তম্ভ। এঁদের মধ্যে অরবিন্দ ছাড়া আর কেউ হিংসাত্মক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন না।

নরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত দৈনিক 'বেঙ্গলী' আর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'। অন্যদিকে চরমপন্থীদের মুখপত্র ছিল মতিলাল ঘোষ সম্পাদিত দৈনিক ইংরেজি 'অমৃতবাজার-পত্রিকা' ও কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী'। এছাড়াও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত দৈনিক 'সন্ধ্যা' ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' ছিল চরমপন্থীদের অন্যতম মুখপত্র।

চরমপন্থী রাজনীতির আদর্শ এবং কর্মপ্রণালীতে প্রকারভেদ দেখা যায়। উক্ত ধারার সবাই যে সন্ত্রাসবাদ, ডাকাতি ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়। তাঁদের মধ্যে মৌল সমধর্মিতা ছিল এই যে তাঁরা প্রচলিত নরমপন্থী ধারায় পাশ্চাত্ত্য মনোভাব, ইংরেজ শাসনে আনুগত্য এবং সাধারণ মানুষের সমস্যায় উদাসীন মজলিশি রাজনীতির বিরোধী ছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতাকামী চরমপন্থীদের মধ্যে মোটামুটি দুটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যেত। একদল চাইতেন ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি, অপরদল চাইতেন সশস্ত্র সংগ্রাম। তবে সাজাত্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে উভয় দলই স্বদেশের সনাতন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার ও শরীরচর্চার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। তাঁদের কর্মতৎপরতা ছিল অসংবদ্ধ; দলগত নির্দিষ্ট কোনো মতবাদ ছিল না। কাজেই কর্মপদ্ধতির মধ্যে অনৈক্য থাকাই ছিল স্বাভাবিক।

চরমপন্থী রাজনীতির ধারক ও বাহক ছিল হিন্দুপ্রধান শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়। এই ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মনোভাব ছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক। দেশের স্বাধীনতাই

ছিল তাঁদের স্বপ্ন—সমাজবিপ্লব নয়। নির্বিত্ত বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। একাধারে তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের প্রগতিবাদী আদর্শের সঙ্গে নব্য-ইতালির রক্ষণশীল আদর্শের গুণগ্রাহী ছিলেন। বস্তুত স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে তাঁরা অন্য দেশের বাহ্য সংগ্রামী পদ্ধতিকেই কেবল কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন, সেসব দেশের সংগ্রামী চেতনার অন্তর্নিহিত নবজীবনবোধ গ্রহণ করেন নি।

রাজনারায়ণ বসুর "সঞ্জীবনী সভা" (১৮৭৫) নামে প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিকে বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতির সূত্রপাত বলা চলে। ইতালির "কার্বোনারি" নামে গুপ্তসমিতির আদর্শে এই সভা গঠিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথও তার সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি গুপ্ত সমিতি ও রুদ্ধদ্বার আলোচনাসভার কথা জানা যায়। পুরোপুরি নরমপন্থী হবার আগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন। এই শতকের শেষ দিকে এই-ধরনের অনেক আধাপ্রকাশ্য সমিতি গড়ে ওঠে যার মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশানুরাগ সঞ্চার ও শরীরচর্চার ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে চরমপন্থী রাজনীতির সংঘবদ্ধ প্রয়াসের সর্বোত্তম নিদর্শন হল "অনুশীলন সমিতি" (১৯০২)-র প্রতিষ্ঠা। সতীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন দলের প্রধান দুই সংগঠক ছিলেন প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০) ও সরলাবালা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)। সমিতির প্রথম পাঁচ বছর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শরীরচর্চা, আত্মরক্ষা ও স্বদেশপ্রেমে যুবসম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলা। অরবিন্দের প্রভাবে সমিতির কিছু সদস্য বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তাদের অন্যতম বারীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১)-র উদ্যোগে সমিতির মুখপত্রস্বরূপ 'যুগান্তর' (১৯০৬-০৮) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম থেকেই ক্রমে যুগান্তর দল (১৯০৬-৩৮) নামে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।[১১] প্রমথ মিত্র, সরলা দেবী প্রমুখ নেতৃস্থানীয় অনেকেই গুপ্তহত্যা, ডাকাতি ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করতেন না। সেজন্যে যুগান্তর গোষ্ঠী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় লিপ্ত থাকে। উত্তরকালে দেশের বহু খ্যাতনামা বিপ্লবী ও জননায়ক এই দুটি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এইসব বিপ্লবীদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক নানা সংযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশীলন দলের পাঁচ শতাধিক শাখা ছিল। দলের মধ্যে মোটামুটি সুসংবদ্ধতা থাকলেও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ঐকমত্য ছিল না। পূর্ববঙ্গ শাখা একসময়ে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সমিতির বিভিন্ন শাখা ১৯০৯ সালের মধ্যে একের পর এক বেআইনি ঘোষিত হয়।

কিন্তু উভয় দলের গোপন কর্মতৎপরতা অব্যাহত থাকে। পরের দিকে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই দুটি বিপ্লবী দলের অনেক কর্মী ও নেতা কংগ্রেসের সদস্যপদ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধান এই দুটি বিপ্লবী দল তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কয়েকটি বার ছাড়া কোনো দিনই একত্রে কাজ করতে পারে নি।

চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে বঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতি সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিবদমান দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যুগান্তর দল সুভাষকে সমর্থন করে এবং যতীন্দ্রমোহনের পিছনে দাঁড়ায় অনুশীলন দল। অবশ্য গোষ্ঠী বিবাদ ছাড়াও ইত্যবসরে আদর্শগত প্রভেদও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ইউরোপ থেকে প্রেরিত মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র এবং গ্রন্থাদির মাধ্যমে মার্কসীয় বিপ্লবনীতির প্রতি অনুশীলন দল আকৃষ্ট হয়েছিল। এই অনুশীলন দলের সঙ্গে একদা যুক্ত তারাপদ লাহিড়ী লিখেছেন—

> The Sengupta-Bose quarrel was not however the cause of the break up of unity of revolutionary groups. The ideological differences between Anushilan and Jugantar were no less pressing factors. Anushilan had been gradually leaning towards Marxian Socialism ; the other group was out and out nationalists.[১১]

চরমপন্থী আদর্শের প্রভাবাশ্রয়ে একটি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তার পুরোধা ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮)। সতীশচন্দ্রের ইংরেজি মাসিক 'ডন' পত্রিকা (১৮৯৩-১৯১৩)-কে কেন্দ্র করে "ডন সোসাইটি" নামে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এই সোসাইটি পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে অন্তর্লীন হয়ে যায় (জুলাই, ১৯০৬)। সোসাইটিতে অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, নিবেদিতা প্রমুখ চরমপন্থীরা নানা বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন।

এদেশে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার সুফল থেকে দেশের বৃহত্তর জনসমাজ বঞ্চিত ছিল। বাংলাদেশে এই শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল মুসলমান। সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিশেষ সংবাদ না থাকায় নরমপন্থীরা এই বৃহত্তর জনসমাজকে জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত করতে পারেন নি। অন্যদিকে চরমপন্থীদের আন্দোলন মূলত হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আধিপত্যের ফলে দেশের মুসলমান সমাজকে স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর লোক সহজেই বিপথে নিয়ে যাবার সুযোগ পায়। নৌরজির সভাপতিত্বে যে সময়ে কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬) চলেছিল সে সময়ে ঢাকায় নবাব সলিমুল্লার প্রাসাদে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলমানের এই বিভেদকে ইংরেজ সযত্নে লালন ও

সদ্ব্যবহার করে। সাজাত্যবোধ সঞ্চারের জন্যে হিন্দুপ্রধান নেতারা হিন্দু অতীতকে আদর্শ করেছিলেন। মুসলমানদের কাছে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতে মুসলমান শাসনকালের ঐতিহ্য ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলি স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধের উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

উৎস নির্দেশ

১. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮। পৃ. ১৩১-২।
২. বিমানবিহারী মজুমদার। "রাজা রামমোহনের রাজনৈতিক শিষ্যদল", 'পরিচয়'। ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪০, পৃ. ১৯০।
৩. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া'। ১৯৬৫। পৃ. ২৮-২৯।
৪. যোগেশচন্দ্র বাগল। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'। ১৯৬৩। পৃ. ১৭০।
৫. Sushobhan Chandra Sarkar. "Derozio and Young Bengal", *Studies in the Bengal Renaissance*. A. Gupta (ed). p. 27.
৬. Bimanbehari Majumdar. *Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917)*. 1965. p. 139.
৭. *Ibid*. p. 141.
৮. Amales Tripathi. *The Extremist Challenge*. 1967. p. 46.
৯. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*. 1953. p. 76.
১০. Kali Charan Ghosh. *The Roll of Honour*, 1965, p. 149.
১১. Tarapada Lahiri. "The eventful decade : 1920-29", *Freedom Struggle and Anusilan Samiti*. v.i. Buddhadev Bhattacharya (ed)., 1979. p. 241.

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ১৮৪৮—১৯২৫

রাষ্ট্রচিন্তায় সুরেন্দ্রনাথ পশ্চিমী আদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সেই আদর্শকেই তিনি এদেশে রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন। স্বতন্ত্র ও মৌলিক কোনো রাষ্ট্রদর্শন রচনায় তিনি প্রবৃত্ত হন নি। একটি গ্রন্থই তিনি লিখেছেন—সেটি হল তাঁর আত্মজীবনী 'এ নেশন ইন মেকিং'। গ্রন্থাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথের ভাষণগুলি থেকেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন প্রত্যয়ের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম এক রক্ষণশীল পরিবারে। কিন্তু পিতা ছিলেন ডিরোজিও এবং ডেভিড হেয়ারের ছাত্র; পিতার ঔদার্যে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা পেলেও সুরেন্দ্রনাথ পারিবারিক ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন না; সারা জীবনেই তিনি মধ্যপথ অবলম্বী ছিলেন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি শ্রীহট্টে সহযোগী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন (১৮৭১)। কিন্তু মাথা উঁচু রেখে তাঁর পক্ষে কাজ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। অধীনস্থ ইংরেজ আমলারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি সাজানো অভিযোগ দায়ের করে। এক তদন্ত কমিটির কাছে তিনি দোষী সাব্যস্ত হন। মাসিক পঞ্চাশ টাকার পেনসনে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান—কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়।

দেশে ফিরে এসে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ইংরেজি অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন (১৮৭৫)। বছর পাঁচেক পর সে-চাকরি ছেড়ে ফ্রি চার্চ কলেজে অধ্যাপনার কাজ নেন। ১৮৮২ সালে তিনি নিজেই একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে বড়লাট লর্ড রিপনের নামে সেই বিদ্যালয়টিকে একটি কলেজে পরিণত করেন। দেশের শিক্ষাবিস্তারকল্পে সযত্ন শ্রম ছাড়াও তাঁর প্রভূত অর্থদান উল্লেখযোগ্য।

ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধ জাগানোর উদ্দেশ্যে আনন্দমোহন বসু 'স্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্' (১৮৭৫) নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যুক্ত হন। বিভিন্ন কলেজে শাখা স্থাপন করে তিনি কলকাতা ও মফস্বলে ছাত্রদের কাছে দেশাত্মবোধক নানা বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শিখ জাতির অভ্যুত্থান এবং মাৎসিনি ও শ্রীচৈতন্যের উপর তাঁর ভাষণ সে-সময়ে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সভাগুলিতে বিপিনচন্দ্র, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ ভাবীকালের বহু মনীষী রাজনৈতিক প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছিলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) দশ বছর আগে সুরেন্দ্রনাথের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। শিশিরকুমারের ইন্ডিয়া লীগে ভাঙন ধরার পর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৬) সুরেন্দ্রনাথকে পুরোধা হিসাবে দেখা যায়। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যান্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার সরকার প্রমুখ বাংলার তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও স্মরণীয়। সে কাজের সাফল্য কামনা করে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য চারটি উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করেছেন—

১. দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন ; ২. একই রাষ্ট্রচেতনায় সারা ভারতের ঐক্যসাধন ; ৩. হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী স্থাপন ; এবং ৪. সকল আন্দোলনে জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন অর্জন।[১]

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের দাবি জানানোও ছিল ভারতসভার অন্যতম প্রধান কাজ। ভারত-সচিব লর্ড সলজবেরি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বয়স একুশ থেকে উনিশে নামিয়ে আনায় সুরেন্দ্রনাথ ভারত-সভার প্রতিনিধি হিসাবে সারা উত্তরভারত পর্যটন করে তার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত সৃষ্টি করেন (১৮৭৭)। উক্ত আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন—

The true aim and purpose of the civil service agitation was the awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of India.[২]

সেই আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের প্রথম জয়মাল্য দান করে।[৩] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সেই কাজে সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ঐ সফরকালেই ১৮৭৭ সালে অনুষ্ঠিত দিল্লির দরবারে তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়ে তাঁর উদ্যোগে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের প্রথম এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ 'নেটিভ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন।[৪]

এর পর সুরেন্দ্রনাথকে আরও দুটি বৃহৎ আন্দোলনের নেতৃত্বে দেখা যায়। সে-দুটির উদ্ভব ঘটে ভাইসরয় লর্ড লিটন-এর আমলে (১৮৭৬-৮০)। ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস আইনের সাহায্যে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকোচন এবং ঐ সালেই ভারতে ব্যাপক নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে 'আর্মস অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করার ফলে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়। লর্ড রিপন-এর আমলে (১৮৮০-৮৪) প্রেস আইন রদ করে দেওয়া হয়। আমলাতন্ত্রের

নানাবিধ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ ক্রমেই তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। জনমত গঠনের সুবিধার্থে ১৮৭৯ সালে 'বেঙ্গলী' নামে একটি পত্রিকার স্বত্ব তিনি কিনে নেন। দীর্ঘকাল তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। মন্টফোর্ড শাসনসংস্কারের (১৯১৯) পর তিনি পত্রিকাটির সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমসাময়িককালে আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮৩) আন্দোলন। জনদরদী রিপন বৈষম্যমূলক 'ক্রিমিন্যাল প্রসীজার অ্যাক্ট' (১৮৭২) সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁর আইন সচিব সার কার্টনি ইলবার্টকে দিয়ে মফঃস্বলের আদালতে দেশীয় বিচারকদের শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচারের অধিকার দেবার জন্যে একটি বিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় উত্থাপন করেন। বিলটি পেশ হওয়া মাত্র দেশের শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা সেই বিলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করে এবং তার ব্যয়নির্বাহের জন্যে একটি অর্থভাণ্ডার গঠন করে। বিলটি অবশ্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ইউরোপীয়ানদের আচরণে সারা দেশে বিক্ষোভ দেখা দেয়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এ-বিষয়ে যথারীতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ইলবার্ট বিল আন্দোলন ভারতীয় সাজাত্যবোধকে আরও জাগ্রত করে তোলে। সুরেন্দ্রনাথও ইউরোপীয়ানদের অনুকরণে একটি জাতীয় অর্থভাণ্ডার খোলেন। জাতীয় অর্থভাণ্ডার স্থাপনের প্রস্তাব এর আগে উঠে থাকলেও সংঘবদ্ধ প্রয়াস তাঁর নেতৃত্বেই এই প্রথম দেখা যায়। অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> The main object, therefore, is to bring the Government of the country into harmony with national aspirations…we are anxious to have provincial self-government. We desire Parliamentary Institution.[৫]

সুরেন্দ্রনাথ প্রতি মহকুমাতে কমপক্ষে একটি করে কেন্দ্রের অধীনে গ্রামের মণ্ডলদের সহায়তায় গ্রামপিছু একটি ও শহরগুলির প্রতি পাড়া থেকে একটি করে টাকা সংগ্রহ করে অন্যূন ছ'লক্ষ টাকার একটি ভাণ্ডার গঠনের আবেদন করেন এবং দেশের আইনজীবীদের তিনি এই অর্থসংগ্রহ অভিযানে অগ্রণী হতে আহ্বান জানান। তবে সেই সঙ্গে চাষি-মজুর, দোকানি-পসারিদের সাহচর্যও কামনা করেন। বস্তুত দেশের রাজনীতিতে এতদিন জমিদার ও বিত্তবানদের আধিপত্য চলেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাতে নির্ধন সাধারণ মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটালেন।

ইলবার্ট বিলের উত্তাপ প্রশমিত হবার আগেই আবার এক তীব্র জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নরিশের একটি

নির্দেশসূত্রে তাঁর যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে সম্পাদকীয় মন্তব্যের দরুন আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথ দু'মাস কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর ইলবার্ট বিল আন্দোলনসূত্রে গঠিত জাতীয় অর্থভাণ্ডার নবোদ্যমে সম্প্রসারণ ছাড়াও কলকাতায় ভারতসভার উদ্যোগে[১] এক সর্বভারতীয় সম্মেলনের (ইন্ডিয়ান ন্যাশানাল কনফারেন্স) তিনদিনব্যাপী অধিবেশন হয় (১৮৮৩)। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে যে বছর বোম্বাইতে কংগ্রেসের জন্ম হয়। দেশের নবজাগ্রত জাতীয় উদ্দীপনা ক্রমে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়। ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ প্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তরভারত ভ্রমণে যান। সর্বত্রই তিনি অভূত-পূর্ব সংবর্ধনা লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯০৬)-এর সভাপতিত্বে বোম্বাই কংগ্রেস ও অক্টেভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯১২)-এর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে অনুরূপ এক সম্মেলন হয়।

স্বায়ত্তশাসনকে তিনি উদীয়মান রাজনৈতিক নেতাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার প্রথম পাঠ বলে মনে করতেন; তাঁর মতে স্বায়ত্তশাসনই গণতন্ত্রের তৃণমূল। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৯ সাল অবধি তিনি স্বয়ং কলকাতা পৌরসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারতসভার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার জন্যে আন্দোলন শুরু করা হয়। ছোটলাট আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জির কলকাতা পৌরসভার আমলাতান্ত্রিক সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় ও তার বাইরে তীব্র জনমত সৃষ্টি করেন। তখন ছিল লর্ড কার্জন-এর আমল (১৮৯৯-১৯০৪)। সুরেন্দ্রনাথের বিরোধিতা ফলপ্রসূ হয় নি। ম্যাকেঞ্জি বিল (১৮৯৯) গৃহীত হবার চব্বিশ বছর পরে সুরেন্দ্রনাথ পূর্বের সে-পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন, যে-সময়ে তিনি বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হয়েছিলেন। তখন তিনি স্বায়ত্তশাসন আইনের আমূল সংস্কারসাধন করেন।

রাজনীতিতে যোগ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের জন্যে তৎপর হন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে যথোচিত প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্যে তিনি নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন চালিয়ে যান। কংগ্রেস থেকে ১৮৯০ সালে আর. এন. মাধোলকর, আর্ডলি নর্টন, অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধিদলকে ইংল্যান্ডে পাঠানো হয়। ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনের অনুকূলে সেখানে জনমত সৃষ্টিই ছিল ঐ দলের উদ্দেশ্য।

১৮৯৩ সাল থেকে ১৯০১ সাল অবধি তিনি কলকাতা পৌরসভা থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। আইনসভার মাধ্যমেই দেশের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আদায় করা যাবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। জনপ্রতিনিধিত্ব, শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থ, বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি

সকল বিষয়েই তিনি অবিরাম সমালোচনা ও আন্দোলন চালিয়ে যান। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতি তাঁর তথ্যবহুল ভাষণগুলিতে প্রতিফলিত হত। ১৮৯৭ সালে তিনি প্রশাসনিক অর্থব্যয় সম্পর্কে ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। ১৯০১ থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তিনি আমলাতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করেন। তবে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অসহযোগ নীতিকে জনমনে সঞ্চারিত করতে চান নি। কারণ তখন তিনি মনে করতেন যে ঐ-নীতি গ্রহণ করলে সরকারের উৎপীড়ন বেড়ে যাবে। তাঁর মতে "a single unwary step will land us to a setback."

মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনকালে অনুষ্ঠিত এক ছাত্রসমাবেশে (১৮৯৪) ছাত্রদের রাজনীতিচর্চা প্রসঙ্গে এক প্রচণ্ড বিতর্ক হয়। খাপার্দে ও মালব্য ছাত্রদের রাজনীতিচর্চা না করাই উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে, ছাত্ররা রাজনীতিচর্চা করবেই, তাদের আটকানো যাবে না, অক্সফোর্ড-কেমব্রিজেও ছাত্ররা রাজনীতি করে থাকে। দেখতে হবে শুধু, তারা যাতে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিনির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখে। সমসাময়িককালে যুবকদের মধ্যে অপরের মতামতে অসহিষ্ণুতা, উচ্ছৃংখলতা ও দেশীয় আদর্শের প্রতি যে অবজ্ঞার মনোভাব লক্ষিত হত তার তিনি নিন্দা করেন। আশাবাদী সুরেন্দ্রনাথ মনে করতেন ছাত্রদের সাময়িক অশিষ্ট উদ্দামতা অচিরেই নিবারিত হবে। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিদ্, সেজন্যে যুবকদের মতিগতি সঠিক অনুধাবন করতে সক্ষম ছিলেন; ছাত্রদের মঙ্গলচিন্তা তাঁর নানা কথা ও কাজের মধ্যে দিয়ে বহু সময়ে ফুটে উঠেছে।

কংগ্রেসের জন্ম কিছুটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই হয়েছিল, তবে কংগ্রেসের শৈশব-কাল থেকেই সুরেন্দ্রনাথ তার একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১৮৯৫ সালে পুনায় এবং ১৯০২ সালে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। মডারেট দলভুক্ত হলেও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের সময়ে (১৯০৫) তিনি ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ছলচাতুরীতে অধৈর্য হয়ে নিছক আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে বিলাতি পণ্য বয়কট, স্বদেশী শিল্প ও জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচি এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে চরমপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকালে সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রবল বিরোধিতার ফলে তাঁকে সরকারি মহলে "Surrender not Banerjea" আখ্যা দেওয়া হয়। বিদেশী পণ্যবর্জন আন্দোলনের সময়ে জনচিত্তে বিদেশীদের প্রতি জাতিবিদ্বেষের ভাব যাতে সঞ্চারিত না হয় সে বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। স্বদেশী ব্যবসায়-

বাণিজ্যের পত্তন ও প্রসারে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। এই সময়ে দেশে যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার উদ্ভব ঘটে তাতে তাঁর আদৌ সমর্থন ছিল না; তবে সেজন্যে তিনি ইংরেজ শাসকদের দোষী করেন। ১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে তাঁর নরমপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশে একদল প্রবল সমালোচনা শুরু করেন। তখন রবীন্দ্রনাথ 'দেশনায়ক' প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেবার জন্যে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।[৭]

মডারেট বা নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদের সঙ্গে সৌহার্দ বজায় রাখতেন। কলকাতা কংগ্রেসের (১৯০৬) পর থেকে ঐ দুটি দলের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার কিছুকাল পরে মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে উভয় দলের বিরোধ চরম আকার ধারণ করলে তিনি দু'দলের মধ্যে আপসের চেষ্টা করেন। সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) ঐ-বিরোধ কংগ্রেসের ভাঙন সৃষ্টি করে। চরমপন্থীরা কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অপসৃত হন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন কর্তৃপক্ষের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়: ফলে লালা লাজপৎ ও বিপিনচন্দ্রকে দেশান্তরে যেতে বাধ্য করা হয়; অরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান এবং টিলক কারারুদ্ধ হন। চরমপন্থী দলের যেমন অস্তিত্ব নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি নরমপন্থী চালিত কংগ্রেসও হীনবল হয়ে পড়ে; দমনমূলক আচরণে দেশের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা স্তিমিত হয়ে আসে।

১৯১০ সালে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে যোগ দিতে যান। তার আগের বছরই মর্লে-মিন্টো শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সংস্কার তিনি সর্বাংশে সমর্থন করেন নি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ আইন রদ হয়ে গেলে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় (১৯১৩-১৯১৬) প্রবেশ করেন।

লখনৌ কংগ্রেসে (১৯১৬) নরম ও চরমপন্থী দলের মিলন ঘটে। তার কিছুকাল পরে অ্যানি বেসান্টের উপর অন্তরীণ আদেশ জারি হওয়ায় কংগ্রেসে 'প্যাসিভ রেজিসট্যানস'-এর প্রস্তাব ওঠে। সুরেন্দ্রনাথ সে-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কারণ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী-আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তখনও তাঁর মন থেকে যায় নি। তিনি তখন বলেছিলেন—

> Passive resistance could not succeed unless there was an over-whelming body of public feeling behind it and there were many who would be willing to suffer for the cause which had provoked it. We were not sure that these conditions existed in the present case.[৮]

সুরেন্দ্রনাথের এ-দূরদৃষ্টি উত্তরকালে গান্ধীও উপলব্ধি করেছিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী প্রভাব হ্রাস পেতে শুরু করে। মন্টফোর্ড শাসনসংস্কার (১৯১৯) নিয়ে উভয় দলের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়। রাজদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ মার্চ 'রৌলট বিল' কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিধিবদ্ধ করার প্রতিবাদে সারা দেশে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় এবং সেইসূত্রে ঐ বছর এপ্রিল মাসে পাঞ্জাবে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ নীরব থাকেন। ঐ বছরেই বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনের পর মডারেটরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং নভেম্বরে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে তাঁদের এক স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মডারেটরা ইংল্যান্ডে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ভারত-শাসন (১৯১৯) বিল সম্পর্কে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে তিনি সাক্ষ্যদান করেছিলেন এবং ঐ বিল সমর্থনও করেন। ১৯২১ সালে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর যশ ও জনপ্রিয়তা তখন অস্তমিত। ১৯২৩ সালের কাউন্সিল নির্বাচনে স্বরাজ্য দলের প্রার্থী রাজনীতিতে নবাগত বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে তিনি পরাজিত হন। ১৯২৫ সালে জনচিত্তের অন্তরালে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ইতিহাসচিন্তা

সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ দার্শনিক-কবি টেনিসনের উল্লেখ করে বলেছেন, তিনিও টেনিসনের এই মতে বিশ্বাসী যে ইতিহাসের রথচক্র বিবর্তনের পথে আবর্তিত হয়; সেই যাত্রাপথের প্রতিটি পর্যায়েই পদক্ষেপ করতে হয়; লাফ দিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না; তাই অবস্থার সঙ্গে আদর্শের সংগতি থাকা চাই। প্রকৃতি ও মানবেতিহাসের উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই নীতির বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন—

> In nature as well as in moral world there is no such thing as a cataclysm. Evolution is the supreme law of life and of affairs. Our environments, such as they are, must be improved and developed, stage by stage, point by point, till the ideal of the present generation becomes the actual of the next।[৯]

তাঁর মতে ইতিহাসের গতি ঐশ নির্দেশে নির্ধারিত। দিব্য নির্দেশে প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার পশ্চাতে থাকে একটি শুভ উদ্দেশ্য। তাই

ইউরোপে রোমান আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গেই সেখানকার আদিম অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় সভ্যতার আলোকপাত এবং পরে খ্রীষ্টধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। সেই দৃষ্টিতেই ইংরেজ শাসনকে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের মতো তিনিও ঐশ অভীপ্সা বলে মনে করেন, "British rule as providential, as one of the dispensations of the God of History"।[১০] ১৮৫৮ সালের রাজকীয় ঘোষণাকে তিনি ভারতের জয়টিকা ও তার রাজনৈতিক নবজন্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। ইংরেজের ভারত-শাসনকে তিনি তিনটি দিক থেকে দেখেছিলেন—

১· ভারতীয় সমাজের পক্ষে অশুভজনক অবস্থার মূলোচ্ছেদ ; ২· ভারতীয় চরিত্রে আত্মনির্ভরশীলতা এবং পুরুষোচিত কর্মশক্তির সঞ্চার ; ৩· ভারতে স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির প্রবর্তন।[১১]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানবসভ্যতা পূবে থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয়েছিল। এখন পশ্চিমকে তার দেনা শোধ করতে হবে। সে-দেনা পরিশোধ শুধু চিন্তার স্তরে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা নয়—ভারতীয়দের রাজনৈতিক ভোটাধিকার দানের মধ্যে দিয়ে তা মেটাতে হবে।

টেনিসনের মতানুযায়ী তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শোণিত-চিহ্নিত পথে মানবসভ্যতা ও প্রগতির রথ এগিয়ে চলে। আলেকজান্ডারের প্রাচ্য অভিযানে রক্তপাত ঘটেছে প্রচুর ; কিন্তু তারই ফলে প্রতীচ্য প্রাচ্যের জ্ঞানবিদ্যার আস্বাদ লাভ করেছিল, প্রাচ্যের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণমূলক দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রতীচ্যের মননধারা বিকশিত হয়। তিনি লিখেছেন—

> Observation and experiment were now to regulate Western science, as they had before regulated Eastern science. The blood therefore that was shed in the Greek expedition was not shed in vain···out of that blood, out of that treasure, there arose the proud fabric of European science.[১২]

ভারতীয় ঐতিহ্য এবং অতীত দিনের সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে ভারতের গরিমাকে তিনি তুলে ধরেন। ব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, শংকর, পাণিনি ও পতঞ্জলির অবদান তাঁর কাছে মহাগৌরবের বিষয় ছিল।[১৩] বিশ্বের সকল ধর্মকেই ভারতমাতা তাঁর কোলে স্থান দিয়েছেন বলে ভারত প্রাচ্যের এক পবিত্র পীঠস্থান। তিনি দেশের যুবমানসে নৈতিক নবজীবন সঞ্চারকল্পে আদর্শের উৎসস্বরূপ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ধারার মহত্ব অনুধ্যান করার উপদেশ দেন ; ভারতীয় ইতিহাস মানুষকে কালজয়ী আত্মত্যাগের শিক্ষা দেয় ; তার আধ্যাত্মিক ভাবধারায় হতাশা, নৈরাশ্য ও প্রতিপক্ষের প্রতি বৈরী মনোভাব

জয় করা যায়। ভারতীয় ইতিহাসের বহু বিষয়ই কালের প্রবাহে অকার্যকর ও অচল হয়ে গেলেও ভারতের লিপিবদ্ধ চিন্তার ভাণ্ডার এখনও প্রাচুর্যে পূর্ণ; বর্তমানে প্রাচীন মননশীল সাধনার অনুবর্তন যদি সম্ভব না হয়, তাহলে নীতিনিষ্ঠ চিন্তা ও আদর্শের রূপায়ণপ্রচেষ্টা দেশের নব-উজ্জীবনের পক্ষে অনুকূল হবে।

মানবহৃদয়ে উদারতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ তাঁর মতে দিব্য প্রভাব-সঞ্জাত। উদাহরণস্বরূপ দেখিয়েছেন যে শাস্ত্র ধর্মের নিষ্করুণ কঠোরতার প্রতিষেধক হিসাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ভাবধারা প্রবেশ করেছে, শ্রীচৈতন্য বাংলা-দেশের ঐক্য ও সর্বধর্মসমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। তাই শ্রীচৈতন্যের আদর্শেই তিনি দেশবাসীকে সংঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানান। তাঁর মতে রামমোহনের মনন ও জীবনাদর্শ যেমন পশ্চিমের ভাবধারায় গঠিত তেমনি শ্রীচৈতন্যও মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রভাবিত।[১৭] প্রতি যুগন্ধর ব্যক্তির মানসে সমকালীন কৃষ্টি ও চিন্তা অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই ব্যক্তি সমসাময়িক চিন্তা ও প্রভাবকে অতিক্রম করে সমাজকে উন্নত ভাবধারায় চালিত করেন; এবং সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি জনজীবনের প্রতিটি বিষয়কে উৎকৃষ্ট করে তোলেন।[১৫]

রাষ্ট্রদর্শন

সুরেন্দ্রনাথ সমকালীন মডারেট রাজনীতির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। মডারেট রাষ্ট্রদর্শনের বৈশিষ্ট্য যে, তাতে রাষ্ট্রশক্তির মূলে ন্যায়নীতির প্রশ্নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বলপ্রয়োগ ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে তার সঙ্গতি নেই। হিংসাত্মক বলপ্রয়োগকে তৎকালীন মডারেটরা অশুভ পন্থা বলে মনে করতেন; কারণ উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে তা মনে এমন এক ক্ষতের সৃষ্টি করে যা সারিয়ে তুলতে যুগযুগান্তর কেটে যায়। তাই তাঁরা বলদর্পী সরকারের পরিবর্তে নীতিনির্ভর রাষ্ট্রের কল্পনা করেন। গ্লাডস্টোনের বাণী তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, "Liberalism was trust in the people, tempered with discretion"। সেজন্যে তাঁরা নিরন্তর জনমতের অগ্রাধিকারের দাবিতে মুখর ছিলেন। রোমের ইতিহাস উল্লেখ করে সুরেন্দ্রনাথ বলেন যে জন-সাধারণের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে যথোচিত স্বীকৃতিদানই রোম সাম্রাজ্যবিস্তারের মূল কারণ। জনমতকে উপেক্ষা করা শাসক ও শাসিত—উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকর। সরকার অপেক্ষা জনমতই বিচারের উপযুক্ত অধিকারী; জনমতকে সরকারের ভাগ্যনিয়ন্তা বলা ভাল। ক্ষমতাবান গোষ্ঠী অপেক্ষা জনমত বহুলাংশে অধিক বলীয়ান, নিষ্কলুষ ও মহান।[১৬] এখানে সুরেন্দ্রনাথের

চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ করা যায়। সুরেন্দ্রনাথ ইতিহাসের নজির তুলে দেখিয়েছেন যে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা দলীয় শাসন জনমতের বিপরীতে যাওয়ায় বহু সময়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। জনমতকে তিনি দিব্য অভিপ্রায় বলে মনে করতেন। জনসেবাই প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সাধনা। মানুষের প্রগাঢ় প্রেম ও আনুগত্যের ভিত্তিতে রচিত দেশশাসনের পিছনে তাই জনমনের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ থাকা দরকার। তাঁর মতে বিশ্বাস থেকেই বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায়; ইংরেজরা ভারতীয়দের অবিশ্বাস করলে সেটা তাদের ভীরুতার পরিচয় দেবে। শাসিতদের বিষয়ে তাঁরা সাবধানতা অবলম্বন করুন; কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের মনে তা যেন অনর্থক সন্দেহ ও বিদ্বেষ সঞ্চার না করে, তাহলে সেটা অধর্ম হবে। রাজনীতিকে সুরেন্দ্রনাথ কেশব-বঙ্কিমের মতোই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে রাজনীতি মানুষের কাছে আত্মশুদ্ধিকারী ও নীতিনিষ্ঠ আদর্শের উৎস।[১৭]

সিসেরো ও বার্কের আদর্শে তিনি রাজনৈতিক শক্তির বনিয়াদস্বরূপ নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মেকিয়াভেলির "reason of state" নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের দমনমূলক ক্ষমতার তিনি বিরোধী ছিলেন। পুনা কংগ্রেসে (১৮৯৫) সভাপতির ভাষণে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

> I desire to place the moral consideration in the forefront; that which is morally indefensible cannot be politically expedient. Politics divorced from morality is no politics at all.[১৮]

সুরেন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা ইতালির দার্শনিক জননেতা জুসেপ্পে মাৎসিনির (১৮০৫-১৮৭২) চিন্তায় প্রভাবান্বিত। মাৎসিনির আত্মত্যাগ, সহৃদয় নিষ্ঠা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। মাৎসিনি আত্মবিকাশ ও আত্মনির্ভরতায় বিশ্বাসী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ দেশবাসীকে ইতালির এই মুক্তি-সংগ্রামী অধিনেতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশোন্নয়নের কণ্টকময় পথে এগিয়ে যাবার জন্যে উৎসাহিত করেন। পরবর্তীকালে অরবিন্দ, লাজপৎ রায়, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বহু নেতাই মাৎসিনিকে আদর্শ করেছিলেন। দেশপ্রেম ও ঈশ্বরাসক্তিকে সুরেন্দ্রনাথ প্রেরণার উৎস বলে মনে করতেন।[১৯]

মাৎসিনি প্রদর্শিত দুটি আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। প্রথমত, দেশের রাজনৈতিক অভ্যুন্নতির বনিয়াদস্বরূপ সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও উন্নত নৈতিক মান—সেজন্যে চাই সদাচার ও নির্মল চরিত্র। দ্বিতীয়ত, দেশের জন্যে সর্ব-সাধারণের গভীর অনুরাগ এবং জাতীয় আবেগ; শেষোক্ত আদর্শটি "নেশন" শব্দের মূল উপাদান। সুরেন্দ্রনাথ মাৎসিনির বিপ্লবাদর্শের দিকটি গ্রহণ করেন নি।

তিনি মনে করতেন, ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে রাষ্ট্রচেতনার উৎপত্তি। তাঁর মতে—

> History teaches us the great truth that, when the spirit of enquiry has once been called forth into play in the field of religion, it is sure to vent itself in other spheres of activity and to display its energies in matters relating to the government of the country.[২০]

এই মন্তব্যের সমর্থনে নজিরস্বরূপ তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার মূলে রামমোহন, কেশবচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দের নৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন এবং সমাজসংস্কার প্রচেষ্টাকে দেখিয়েছেন।

বার্ক, মেকলে, মিল, স্পেনসার প্রমুখ ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিকদের রচনাবলী তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় যে উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদের পরিচয় পাওয়া যায় তা ঐসব দার্শনিকদের চিন্তায় প্রভাবিত। ইংল্যান্ডে ছাত্রজীবনে সেখানকার ব্যক্তিস্বাধীনতা গণতন্ত্র ও যুক্তিমুখী চিন্তা তাঁর মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। কক্স, পীট, শেরিডান ও বার্কের বাগ্মিতায় তিনি অনুপ্রাণিত হন। বার্কের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি-ভঙ্গি ও নিয়মতান্ত্রিক আদর্শের তিনি অনুরাগী ছিলেন; পুনা কংগ্রেস ভাষণে বার্কের প্রশস্তি করেছিলেন এই বলে—"A heaven-appointed Conservative—one made so by the Hand of Nature"। বার্কের রক্ষণশীলতার মধ্যে তিনি সংকীর্ণতার পরিবর্তে এক দার্শনিক দেশপ্রেমিকের রূপ দেখতে পান। পুনা ভাষণেই তিনি বার্কের একটি চিঠির সপ্রশংস উল্লেখ করেন, যাতে বার্ক একবার ব্রিস্টলের নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে পার্লামেন্ট-প্রতিনিধির উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার নীতির নিন্দা করেছিলেন।

ইংল্যান্ডের সাংবিধানিক ঐতিহ্যে অন্তর্নিহিত ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শও তাঁর মনকে বিশেষ প্রভাবিত করে। তাঁর মতে সপ্তদশ শতকে পিউরিটান বিপ্লব এবং বিনা রক্তপাতে বিপ্লব সাংবিধানিক স্বাধীনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মিলটন, হ্যারিংটন, লক প্রমুখ কবি ও দার্শনিক মুক্তির সংগীতকে চিরন্তন রূপ দিয়েছেন। বিলাতের এই গৌরবোজ্জ্বল সাংবিধানিক ঐতিহ্যের বীজ তিনি ভারতে আনয়ন ও বপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। সমসাময়িককালে যে-সব ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রশাসনিক সংস্কারের কথা ভাবতেন, তাঁদের চিন্তা ও প্রয়াস কার্যকর হলে, ইংরেজরা সহজেই ভারতীয়দের সহৃদয় অনুরাগ, সন্তোষ ও আনুগত্য অর্জন করবে বলে তিনি মনে করতেন।[২১]

ভারতীয় নেশনের অন্যতম রূপকার সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ইত্যাদির মধ্যে বিস্তর

প্রভেদ থাকলেও নৈতিক, মননশীল ও সামাজিক একতার ভিত্তিতে সর্বভারতীয় একটি জাতীয় চেতনা অনায়াসে সৃষ্টি করা যায়। এ-প্রসঙ্গে সুইজারল্যান্ড, জার্মানি ও বেলজিয়ামের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে তিনি একথাও মনে করতেন, কোনো জাতির অধঃপতন ঘটলে দিব্য নির্দেশেই তার নবজীবনের সূত্রপাত হয়। সেই নির্দেশেই গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনির নেতৃত্বে ইতালির বিভেদ ও অনৈক্য দূরীভূত হয়েছিল। সাহিত্য-শিল্প-দর্শনে ইতালির মতো ভারতও একদিন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিল। যে-রাষ্ট্রীয় চেতনার অভাবে ভারত ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নি সে-অভাবটুকু ইংরেজরা এসে মিটিয়ে দিয়েছে—

> If, at this moment, happily the sentiment of brotherhood has been universally evoked in the minds of the Indian races, it is because under the auspices of British rule, the varied and diversified peoples that inhabit this country have been welded together into a compact and homogeneous mass.[২২]

ভারতের জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবিধানে সবচেয়ে সহায়ক হয়েছে ইংরেজি ভাষা, যার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে চিন্তা ও চেতনার বিনিময় ঘটেছে; ইংরেজরা রেলপথ বসিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে অত্যন্ত নিকট করে দিয়েছে; তারা মুদ্রণযন্ত্র আমদানি করে এদেশের মানুষকে আরও ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ দিয়েছে। এক সময়ে আকবর, শ্রীচৈতন্য, নানক প্রমুখ সাধকেরা ভারতে জাতীয় ঐক্যের সাধনা করে গিয়েছেন—কিন্তু সে-সাধনা দীর্ঘস্থায়ী অথবা কার্যকর হয় নি।[২৩]

ভারতীয় জনমনের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা, আত্মপ্রত্যয় ও স্বাধিকার লাভের একমাত্র পন্থা হিসাবে জাতীয় ঐক্যকেই তিনি বড় করে দেখেন। সেজন্যে তিনি চাইতেন দেশবাসী যেন ঈশ্বরসমক্ষে নিজেদের ভেদাভেদ ত্যাগ করে বিশেষ কোনো সংস্থাধীনে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে শপথ গ্রহণ করে। তাঁর মতে ভারতের ঐক্যবিধান শুধু যুক্তিনির্ভর হলেই চলবে না, তার পশ্চাতে ভাবাবেগও থাকা দরকার। ভারতীয় ঐক্যের জন্যে চাই তার গ্যারিবল্ডি ও মাৎসিনি; তার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে হলে তার সার্বজনীন জীবনদেবতার শাশ্বত বাণীকে সমুন্নত রাখতে হবে। ঐক্যের মধ্যেই ভারত নবজীবন লাভ করবে।

ভারতের আগামী দিনের গৌরব ও ঔজ্জ্বল্যে সুরেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা ছিল। তিনি মনে করতেন, ভারতের শাশ্বত বাণীকে তখনই আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা সম্ভব যখন ভারত স্বাধীন সত্তা অর্জন করবে। এ-বিরাট দায়িত্ব সম্পাদনে চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, অদম্য অধ্যবসায় ও অটল আত্মবিশ্বাস—

সেই পথেই ভারতের অভ্যুন্নতি ও পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে। বৈষয়িক উন্নতির প্রথম সোপান রাজনৈতিক স্বাধিকার ; ভোটাধিকারে বঞ্চিত মানুষের জীবনে অর্থ-নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসতে পারে না। ভোটাধিকার মানুষের একটি "জন্মগত দাবি" এবং মনুষ্যত্বের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের মানদণ্ড।[২৪] তিনি বলেন, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের তাগিদ বৃহত্তর বৈশ্বিক মানবকল্যাণের দিক থেকেই অধিক অনুভূত হয়েছে। মানবসভ্যতার প্রত্যুষে ভারত মানুষকে আধ্যাত্মিক পথের সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু মানবসমাজের কাছে ভারতের সেই "মিশন" আজ অনুপস্থিত। সুরেন্দ্রনাথ সেই "মিশন"কে চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন—

It is our mission to become once again the spiritual guides of mankind, but we cannot fulfil that mission unless and until we ourselves are emancipated, we ourselves are free.[২৫]

তাঁর দৃষ্টিতে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন শুধু রাজনীতির চৌহদ্দিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তার নৈতিক ও ধর্মীয় ভূমিকাও তাৎপর্যপূর্ণ। স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হবে বলে তিনি আশা করতেন। স্বায়ত্তশাসন ঈশ্বরের এক পবিত্র বিধান।[২৬]

১৯১৬ সালে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক প্রেরিত বিখ্যাত 'মেমোর‍্যানডাম অফ দ্য নাইনটিন'-এ সুরেন্দ্রনাথ স্বাক্ষর করেছিলেন। সেই স্মারকপত্রে ভারতীয়দের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সরকার গঠনের কথা বলা হয়। পাশ্চমী সমাজের মুক্তির মন্ত্র সুরেন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী ভাষণে ধ্বনিত হয়—যা এককালে প্রকারান্তরে দয়ানন্দ, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের চিন্তায় দেখা গিয়েছিল। মডারেটদের মধ্যে প্রধানত সুরেন্দ্রনাথ এবং কিছুটা রানাডের কণ্ঠেই প্রাচীন ভারতের গৌরবগীতি নিনাদিত হয়। দাদাভাই নৌরজি বা ফিরোজ শাহ মেটার চিন্তায় এ-দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। ভারতের জাতীয় ঐক্যের জনক সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন না। এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৮৮৮) তিনি বলেছিলেন, "We have no wish to assume sovereign authority"। তিনি ইংল্যান্ডেশ্বরীর পক্ষপুটে চেয়েছিলেন শান্তি, সমৃদ্ধি সুবিচার ও সমানাধিকার। তবে ইংরেজ শাসনকে তিনি চিরস্থায়ীরূপে চান নি। নিজেই বলেছেন—

Self Government is the ordering of nature, the will of Divine Providence. Every nation must be the arbiter of its own destiny.[২৭]

তিনি মনে করতেন যে যোগ্যতা অর্জন করলে ভারত নিশ্চয় স্বাধীন হবে।

প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সুরেন্দ্রনাথকে কোনোদিনই স্পর্শ করে নি। তদানীন্তন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজকে অন্যান্য অগ্রসর সম্প্রদায়ের সমপর্যায়ে উন্নীত করার জন্যেও তিনি যথোচিত উৎসাহী ছিলেন। তাঁর কথায়—

The progress of India does not mean the progress of the Hindus alone. It means the advancement of Hindus and Mohamedans alike. It means that Hindus and Mohamedans must march hand in hand.[২৮]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রাজনীতির বিচারব্যাখ্যা করলেও তিনি ধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংমিশ্রণ ঘটান নি। এটি আধুনিক ভারতীয় রাজনৈতিক ধারায় তাঁর এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিপিনচন্দ্র পাল অভিযোগ করেছেন—

সুরেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম্মই তারা বোঝে, ধর্ম্মের নামেই তারা মাতে, ধর্ম্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব। অথচ সুরেন্দ্র নাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজ পর্য্যন্ত মোক্ষ সম্পর্ক বিহীন হইয়া পড়িয়া আছে।[২৯]

সুরেন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যান করেছেন। সেটা এই যে স্বদেশী আন্দোলন নিছক একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনই শুধু নয়— গণশক্তি ও উদ্যমকে মুক্তি দেবার এ-এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন। তিনি বলেছেন—

Swadeshism does not exclude foreign ideals or foreign learning or foreign arts and industries, but insists that they shall be assimilated into the national system, be moulded after the national pattern and be incorporated into the life to the nation. Such is my conception of Swadeshism.[৩০]

তাঁর মতে বহুমুখী জাতীয় কর্মতৎপরতার মূলাধার হবে স্বাদেশিকতা, জনচিত্তে অচিরাৎ উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এই পন্থা উদ্ভাবিত।

দেশপ্রেমের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি হল স্বাদেশিকতা, কোনোও কিছুর বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষ নেই।

আর্থনীতিক চিন্তা

নৌরজি, গোখলে বা রমেশ দত্তর মতো সুরেন্দ্রনাথও ভারতের অর্থনৈতিক দৈন্য ও অবক্ষয় সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। তিনি অনুভব করতেন যে অর্থনৈতিক দুর্বিপাকের ফলে ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯০২) সভাপতির ভাষণে তিনি দেশের অর্থনৈতিক অবনতির প্রতিকারস্বরূপ পাঁচটি পন্থা উত্থাপন করেন—

১. ভারতের প্রাচীন উৎপাদন শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং সেইসঙ্গে নূতন শিল্পের প্রবর্তন। ২. জমির খাজনা নির্ধারণে এমন এক নরম পন্থার প্রয়োগ, যার দীর্ঘস্থায়ী ফলাফলে চাষী যেন নিগৃহীত না হয়। ৩. দরিদ্র করদাতার ক্ষেত্রে প্রতিকূল কর ও খাজনার হ্রাস। ৪. প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতীয় ধনের নিষ্কাশন (drain) ও অবক্ষয় রোধ করা। ৫. কর্মসংস্থানকালে মোটা বেতনভুক বিদেশীদের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ।[৩১]

তৎপূর্বে পুনা কংগ্রেসের (১৮৯৫) তথ্যবহুল ভাষণেও তিনি তদানীন্তন ভারত সরকারের বাজেটকে এক মস্ত তামাশা বলে অভিহিত করেছিলেন। আমলাতান্ত্রিক অভিসন্ধি অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করা হয়—ভারতীয়দের রক্তশোষা অর্থে ইংরেজের সামরিক অভিযান, তাদের বিভিন্ন দেশে বৈদেশিক দপ্তরের ব্যয়নির্বাহ ইত্যাদি হয়ে থাকে। জনসাধারণের অর্থে সরকারের নানাবিধ অপব্যয় এবং গ্রীষ্মকালে সরকারি দপ্তর শৈত্যাবাসে স্থানান্তরিত করার প্রচলিত রীতির উপর তিনি তীব্র কশাঘাত করেন। নৌরজি, গোখলে রমেশ দত্তর সুর তাঁর কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়—"The Home charges constitute a serious drain, and add to the ever-increasing poverty of the country"।[৩২] ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্যদানকালে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছিলেন। অবারিত মাদকব্যবসায় থেকে সরকারের বিপুল শুল্ক আদায় হয়ে থাকে, অথচ শিক্ষাবাবদ ব্যয়নির্বাহে সরকার যে কিরূপ নিস্পৃহ—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাখাতে মাথাপিছু ব্যয়ের এক তুলনামূলক বিবরণ ও তথ্যের সাহায্যে তা তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মতে দেশে বারংবার দুর্ভিক্ষের কারণ শাসকদের অব্যবস্থা ও অকর্মণ্যতা।

দেশের শিল্পোন্নয়নকে খর্ব করে শুধু কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করার

তিনি বিরোধী ছিলেন। বিদেশীদের একচেটিয়া অধিকার ও সুবিধা দেওয়া এবং অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই তিনি স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশ্য কৃষিকর্মের গুরুত্বকে তিনি উপেক্ষা করেন নি; ভূমিব্যবস্থার সংস্কার, খাজনা হ্রাস ইত্যাদি পন্থা অবলম্বনের জন্যে তিনি দাবি জানান। এছাড়া বেকারসমস্যা ও আর্থিক দুর্গতি মোচনের জন্যে তিনি উপযুক্ত কর্মসংস্থান, সেনা ও পুলিশ-বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ ইত্যাদি সুপারিশ করেন। সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তবে উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধিকারী ইংরেজের কাছ থেকে তিনি ভিন্ন আচরণ আশা করতেন। আহমেদাবাদ ভাষণেই বলেছিলেন—

> I would welcome an Imperialism which would draw us nearer to British by the ties of a common citizenship and which would enhance our self-respect by making us feel that we are participators in the priceless heritage of British freedom।[৫৩]

ব্রিটিশ ইতিহাসের নজির দেখিয়ে তিনি বলেন যে, বাষ্প-চালিত যন্ত্রের উদ্ভব ও উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে ইংল্যান্ডের জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতি ঘটে। স্ফূর্তচিত্তে তখন তারা অধিকতর আর্থিক সুবিধার্থে ভোটাধিকার দাবি করে। রাজনৈতিক মুক্তি ও অধিকারের কথা তখনই উদিত হয়। ক্ষমতাসীন মুষ্টিমেয় কায়েমি স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা তাদের সেই আবেগ খর্ব করে দিতে চায়, ফলে দেখা দেয় সংঘর্ষ। জয় হয় কিন্তু গণতন্ত্রেরই।[৫৫]

দেশে প্রায়শই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবার পিছনে সুরেন্দ্রনাথ অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকেই মূল কারণ বলে মনে করতেন। দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। অথচ খাদ্যোৎপাদনের হার সেই অনুপাতে বর্ধিত হয় নি। মানুষের আর্থিক সংগতি না থাকলেও এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় বিবাহটা অবশ্যই একটি করণীয় বিষয় হিসাবে প্রচলিত; ফলে প্রাকৃতিক নিয়ম বা দিব্য ইচ্ছার সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তাই সুরেন্দ্রনাথ বলতে বাধ্য হয়েছেন—

> No man should marry, until he has the means of maintaining a family. This is what Nature enjoins and the Divine Law sanctions. But we here in Bengal are violating every day and every hour the plainest precepts of the Natural and the Divine Law. And God is a jealous

God. Nature revenges herself with compound interest upon the violators of her Law.[১৫]

ম্যালথাসের তত্ত্বানুসারে সুরেন্দ্রনাথ অনুভব করতেন যে অবারিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটে এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধিতে জর্জরিত মানুষ নৈতিক বিকাশ ও রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বৈষয়িক উন্নতি না হলে মানুষের পক্ষে স্থায়ী মূল্যবত্তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। এবিষয়ে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা লক্ষ করা যায়।

ভূমিস্বত্বহীন ও ঋণভারে জর্জরিত রায়তের প্রতি সুরেন্দ্রনাথের গভীর সমবেদনার পরিচয় পাওয়া যায়; সেই মনোভাবেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন। রায়তের সর্ববিধ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি যত্নবান হয়েছিলেন। অশিক্ষা ও দারিদ্র্যে নিমগ্ন ও জমিদারের অত্যাচারে জর্জরিত রায়তকে সচেতন করে তোলার জন্যে তিনি শিক্ষিত লোকেদের আহ্বান জানান। কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষকরাই যে তার মেরুদণ্ড এবং তাদের প্রতি অবহেলা পরিণামে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর সেকথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। অনাহার, অশিক্ষা ও ব্যাধি থেকে গ্রামীণ জীবনকে উদ্ধার করা আশু প্রয়োজন বলে তিনি অনুভব করতেন।

রাজনীতির মূলে অর্থনীতির অবস্থিতি-ভারতীয় মডারেটরা গুরুত্বের সঙ্গেই অনুভব করতেন, তাঁদের মতে ভারতের রাজনৈতিক অনগ্রসরতার উৎস হল অর্থনৈতিক দৈন্য। তাই সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "The economic condition of a people has an intimate bearing upon their political advancement।" ইংরেজ বাগ্মী ও রাষ্ট্রনীতিক জন রাইটের মতানুসরণে তিনিও মনে করতেন যে, কোনো দেশের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও জনসাধারণের দুর্গতি মূলত অর্থনৈতিক কারণেই দেখা দেয়। স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও সংরক্ষণকল্পে তিনি বলেন—

Swadeshism will save us from famine and pestilence and the nameless horrors which follow in the train of poverty. Take the Swadeshi vow and you will have laid broad and deep the foundations of your industrial and political emancipation.[১৬]

শিক্ষা চিন্তা

সুরেন্দ্রনাথের পুনা কংগ্রেসের ভাষণকে অর্থনীতিবিদের বক্তৃতা বলা হয়। সে হিসাবে তাঁর আহমেদাবাদ কংগ্রেসের ভাষণকে শিক্ষাবিদের ভাষণ বলা চলে। কারণ তাঁর ঐ ভাষণে দেশের শিক্ষাপ্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছিল—মুদ্রিত ভাষণের ত্রিশ পৃষ্ঠারও অধিক স্থান জুড়ে। এটা তাঁর পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক, কারণ কর্মজীবনের প্রায় পঁচিশটি বছর তাঁর শিক্ষকতায় কাটে।

পুনা ভাষণে মিল-এর মত সমর্থন করে তিনি বলেন—"the ideas of the educated classes filter downwards and become the ideas of the masses"। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতপার্থক্যের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রচেতনার প্রধান উপাদান যে শিক্ষা এবং সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যতীত জাতীয়তাবোধ ও ঐক্য সাধিত হবে না, সেকথা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেন। শিক্ষার আলো সমাজের একটি স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই লর্ড কার্জন নিয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশগুলি তাঁর কাছে শিক্ষা-সংকোচনের নামান্তর বলে মনে হয়েছিল। কলেজের সংখ্যা হ্রাস, বেতনবৃদ্ধি, পাঠ্যপুস্তকের ভারবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রস্তাবের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি সেই প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে শিক্ষার সুফলকে কিভাবে কেবলমাত্র ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর কাছে কমিশনের প্রস্তাবগুলি ভানাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বা সিডিশন বিলের চেয়েও বেশি ক্ষতিকর বলে মনে হয়েছিল।[৩৭] তবে শিক্ষাবিস্তারে সুরেন্দ্রনাথ প্রাথমিক শিক্ষার চেয়ে উচ্চশিক্ষায় বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাই ১৯১১ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় গোখলে যখন প্রাথমিক শিক্ষার দাবিতে একটি বিল উপস্থাপিত করেন এবং দেশব্যাপী জনসমর্থন গড়ে তোলেন, তখন সুরেন্দ্রনাথকে সেই বিলের বিরোধীপক্ষে দেখা যায়।[৩৮]

উপসংহার

ভারতের রাষ্ট্রীয় নবজাগরণে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রধান দুটি অবদানের প্রথমটি হল সারা ভারতকে একই নেশনের চেতনায় সর্বপ্রথম আবদ্ধ করার প্রয়াস। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান হল রামমোহনের আদর্শে ইংরেজের উদারনৈতিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রচিন্তার বিস্তারসাধন।

দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সাম্প্রতিক আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা অনুল্লিখিত না হলেও যথোচিত স্থান পায় নি এবং বহু ক্ষেত্রেই তা বিকৃতরূপে চিত্রিত হয়েছে। কংগ্রেসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে পট্টভি সীতারামিয়া

সুরেন্দ্রনাথের সংগ্রামী চরিত্রের দিকটি অনুক্ত রেখে শেষজীবনে তাঁর ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যের মনোভাবকে বড় করে দেখিয়েছেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে গোখলে, গান্ধী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ জননেতাদেরও বাদ দেওয়া যায় না। ইতিহাসকার পানিকর মন্তব্য করেছেন যে দেশের সাধারণ শ্রমজীবীদের সমস্যা ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন তাঁর চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল এবং পাশ্চমী শিক্ষাপ্রাপ্ত সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের বহির্ভূত জনসমাজের সমস্যাদি সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না।[৩৭] মন্তব্যটিতে যে সত্যের কিছু অপলাপ ঘটেছে সেকথা সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বিবরণ থেকে ও তাঁর ভাষণগুলি থেকেও জানা যায়।

রাষ্ট্রীয় চেতনার দিক থেকে অপরিণত দেশের জনচিত্তে সাহস ও শক্তিসঞ্চারকল্পে শিখ অভ্যুদয়ের কাহিনী প্রচার, স্বাধীনতার আবেগ সৃষ্টির জন্যে নব্য ইতালির স্বাধীনতা-সংগ্রামী মাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির আদর্শ স্থাপন এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির প্রবক্তা বার্ক ও গ্ল্যাডস্টোনের পন্থা গ্রহণের উপদেশ একাধারে যেমন দিয়েছিলেন, সেইসঙ্গে শ্রীচৈতন্যের ভাবধারার অনুসরণ, নবযুগের বাংলায় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীও প্রচার করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। অভিজাত শ্রেণীর মৌরসিস্বত্ব থেকে তখনকার মজলিশি রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে টেনে এনে তিনি রাষ্ট্রীয়সাধনাকে গণতান্ত্রিক রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর এই মনোভাবের জন্যেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে তাঁকে দূরে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। আহমেদাবাদ ও পুনা কংগ্রেসে সভাপতিরূপে প্রদত্ত সুরেন্দ্রনাথের ভাষণ দুটিতে বৃহত্তর জনসমাজের সুদূরপ্রসারী কল্যাণচিন্তা ফুটে ওঠে। দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের অপরিণত প্রাথমিক অধ্যায়ে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শাসকদের কাছে 'প্রার্থনা' কথাটির পরিবর্তে 'দাবি' শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। সরকারি আচরণের প্রতিবাদে তিনি বারো বছর (১৯০১-১৩) আইন পরিষদ বর্জন করেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনকালে বিদেশী পণ্য বয়কটের নীতি সোৎসাহে সমর্থন করে তিনি নেতৃস্থানীয় মডারেট সহকর্মীদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। দেশের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার তাগিদে চরমপন্থী বিরোধী নেতাদের সঙ্গে বিরোধ অবসানের ক্লান্তিহীন প্রয়াসের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক মহত্ত্বেরই প্রমাণ মেলে।

মডারেটদের প্রতিপক্ষ চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্র পাল একাধিক গ্রন্থে সুরেন্দ্রনাথের জীবন ও সাধনার বিস্তারিত আলোচনায় রাষ্ট্রগুরুকে যথোচিত স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর ইংলন্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে

সংযত করিয়া ক্রমে প্রজাশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্তমান প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীতে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পথই সুরেন্দ্রনাথের সুপরিচিত… রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশসাধনে ব্রতী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, সাধনা ও প্রকৃতি অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।[৩০]

সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সমধর্মী রাষ্ট্রনায়কগণ সর্বজনগ্রাহ্য আধ্যাত্মিক আবেগের সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতাকে সংমিশ্রিত না করার ফলে জনচিত্তে স্থায়ী আসন অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন বলে বিপিনচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন। বস্তুত এই অভিযোগের মধ্যে দিয়ে সুরেন্দ্রনাথের প্রশংসাই যেন ফুটে উঠেছে। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উদারতন্ত্রী মডারেট নেতৃবৃন্দের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির নিষ্ফল পরিণাম আজ সারা ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনকে বিষময় করে তুলেছে।

তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রচিন্তায় নৈতিকতার সাযুজ্যে বিশ্বাসী হলেও ব্যবহারিক দিক থেকে সুরেন্দ্রনাথ আশু কার্যকরতায় আস্থাবান ছিলেন। কার্যকাল ভাবপ্রবণ আদর্শবাদ অপেক্ষা বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী তিনি কর্মপন্থা নির্ধারণ করতেন। তাঁর চিন্তায় এই স্ববিরোধ সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে অশুভ পন্থা ও দুর্নীতিকে তিনি কোনোদিন প্রশ্রয় দেন নি। অপরিণামদর্শী ক্রিয়াকলাপ ও হঠকারিতার পরিবর্তে তিনি সতর্ক পদক্ষেপে 'ধীরে চলো' নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তা বলে তিনি শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলনে পিছপাও হন নি। রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে তাঁর মনে মুক্তি ও প্রগতির চিন্তা সঞ্চারিত হয়েছিল। ক্রমে তিনি রাজনৈতিক রক্ষণশীলতায় প্রভাবিত হন। রানাডে ও কেশবচন্দ্রের মতো তিনিও বিশ্বাস করতে শুরু করেন যে ভারতে ইংরেজ শাসন বিধির নির্দেশ।

হিংসাত্মক কার্যকলাপকে তিনি কোনো দিন সমর্থন করেন নি। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনকালে তিনি হিংসার পথ থেকে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেন। তিনি চাইতেন বিবর্তনের ধারায় দেশের উন্নতি, বিপ্লব নয়। জনগণের মনে উত্তাপ ও উত্তেজনা সৃষ্টির সঙ্গেই নিয়মতান্ত্রিক পথে তা চালনা করার তাঁর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। নিয়মতান্ত্রিক অস্ত্রপ্রয়োগে তিনি বিশ্বাস করতেন। বোম্বাই কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের (১৯১৮) পর থেকে তিনি দেশের দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও উত্তালতার সঙ্গে মানিয়ে চলতে অক্ষম হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি কংগ্রেস থেকে সরে আসেন।

শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও বাগ্মী হিসাবে সুরেন্দ্রনাথের নাম সুবিদিত। কিন্তু রাজনীতিই তাঁর মনের প্রকৃত বিচরণক্ষেত্র ছিল। রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর মৌলিক অবদান বিশেষ না থাকলেও সুদক্ষ সংগঠক, দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিক

হিসাবে তাঁর অসামান্যতার পরিচয় ইতিহাসে সুচিহ্নিত হয়ে আছে। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, পর্দাপ্রথা, বিধবাবিবাহ সম্পর্কে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন; আরব্ধ সমাজসংস্কারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে আর-এক বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ছিল তাঁর কাম্য।

সুরেন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবন বিশেষ তাৎপর্যবহ। বলতে গেলে তাঁর জীবনকালেই দেশের নবজাগরণপ্রয়াস সার্থকতার শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করে। জীবনের প্রত্যুষে তিনি বঙ্কিম-বিদ্যাসাগরের স্নেহাভিষিক্ত সান্নিধ্য লাভ করেন। মধ্যাহ্নে প্রত্যক্ষ করেন কেশব-বিবেকানন্দ-রানাডে-নৌরজির প্রতিভা। আর সায়াহ্নে পেয়েছিলেন গোখলে-টিলক-বিপিনচন্দ্র-গান্ধী-চিত্তরঞ্জন-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিচিত্র মনীষীর সাক্ষাৎ।

উ ৎ স নি র্দে শ

১. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making.* 1963, p. 39.

২. *Ibid.* p. 41.

৩. H. J. S. Cotton. *New India or India in Transition.* (Popular edition) 1886. p. 16.

৪. S. Naturajan. *A History of the Press in India.* 1962, p. 96.

৫. প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 'ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া'। ১৯৬৫। পৃ. ১১০।

৬. Amvika Charan Mazumdar. *Indian National Evolution.* 1917. pp. 40-41.

৭. রবীন্দ্রনাথের "দেশনায়ক" শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ আছে। প্রথমটি (১৩১৩ বঙ্গাব্দ) সুরেন্দ্রনাথের এবং দ্বিতীয়টি (১৯৩৯) সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশে রচিত (প্রথম প্রবন্ধটি পরে 'সমূহ' গ্রন্থে সংশোধিত আকারে প্রকাশিত হয়) 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। বিশ্বভারতী সংস্করণ। খণ্ড ১০। পৃ. ৬৫৪।

৮. Surendranath Banerjea. *A Nation in Making.* 1963. p. 224.

৯. *Ibid.* p. 296.

১০. *Speeches of Surendranath Banerjea : 1876-84.* Vol. 2. p. 49.

১১. *Ibid.* 1876-80. p. 22 ('England's Mission in India').

১২. Surendranath Banerjea's address on Indian unity delivered at the Students' Association, on 16 March, 1876, *Modern Indian Political Tradition.* K. P. Karunakaran (ed). 1962. p. 32.

১৩. *Speeches of Surendranath Banerjea : 1865-1880.* R. C. Palit (ed). p. 21.

১৪. Speech on Chaitanya at the Students' Association on July 15, 1876, *Ibid.* p. 54.

১৫. *Ibid.*

১৬. Surendranath Banerjea's Presidential address at the Ahmedabad Congress Session, 1902, *Indian National Congress Presidential Speeches,* G. A. Natesan & Co.

১৭. *Speeches of Surendranath Banerjea : 1886-90.* R. J. Mitter (ed). p. 71

১৮. Surendranath Banerjea's Presidential address at the Poona Congress Session, 1895, *Indian National Congress Presidential Speeches.* G. A Natesan & Co.

১৯. *Speeches of Surendranath Banerjea : 1876-1884.* R. C. Palit (ed). Vol. 1-2. pp. 1-24.

২০. *Ibid.* p. 34.

২১. *Speeches of Surendranath Banerjea : 1886-90.* R. J. Mitter (ed). pp. 162-163 (Speech at a meeting in Exeter).

২২. Surendranath Banerjea's Speech at a meeting of the Students' Association on 16 March, 1878, *Modern Indian Political Tradition.* K. P. Karunakaran (ed). 1962. p. 35.

২৩. *Ibid.* p. 39.

২৪. *Speeches and Writings of Surendranath Banerjea.* pp. 140-141.

২৫. *Ibid.*

২৬. *Speeches of Surendranath Banerjea : 1886-90.* R. J. Mitter (ed) (Speech at Calcutta Congress Session, 1886).

২৭. *Ibid.*

২৮. *Ibid.* p. 95.

২৯. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮। পৃ. ১৩৬।

৩০. *Speeches and Writings of Surendranath Banerjea.* pp. 299-300 (Speech on Swadeshism).

৩১. Surendranath Banerjea's Presidential Address at the Ahmedabad Congress Session, 1902, *Indian National Congress Presidential Speeches.* G. A. Natesan & Co. p. 666.

৩২. *Ibid.* p. 243

৩৩. *Ibid.* p. 279.

৩৪. *Speeches of Surendranath Banerjea.* R. C. Palit (ed). Vol. 2. p. 5.

৩৫. *Ibid.* p. 3.

৩৬. *Ibid.* pp. 299-300.

৩৭. Majumdar and Mazumdar. *Congress and Congressmen in the Pre Gandhian Era* : 1885-1916. 1967. pp. 188-189.

৩৮. B. R. Nanda. *Gokhale : the Indian Moderates and the British Raj.* 1977. pp. 387-9.

৩৯. K. M. Panikkar. *The Foundations of New India.* 1963. pp. 90-91.

৪০. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৫৮। পৃ. ১৩৫।

বিপিনচন্দ্র পাল ॥ ১৮৫৮—১৯৩২

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারক ও বাহক জাতীয় কংগ্রেসের জন্মকালে দেশের সংগ্রামী রাজনৈতিক চেতনায় স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতার যে অভাব ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আবেদন-নিবেদন ও তোষণনীতির পথ ধরেই কংগ্রেসের তথা দেশের মুক্তি-আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে জনসাধারণের মনে অসন্তোষের কৃষ্ণছায়া ঘনিয়ে উঠছিল, যার মূলে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান। প্রথমত, দেশীয় পুঁজিপতিদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও বিদেশী পুঁজিপতিদের দাপটে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী ভালভাবে মাথা তুলতে পারছিল না; দ্বিতীয়ত, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যা দ্রুত বেড়েই চলেছিল; তৃতীয়ত, দেশবিভাগের (১৯০৫) ফলে স্বার্থহানিতে জমিদার ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিকদের বিক্ষোভ বর্ধিত হয়।[১]

বিক্ষিপ্ত জনশক্তি ও সংগ্রামী চেতনাকে সুসংবদ্ধ রূপ দান করতে শেষোক্ত কারণটি অনেকাংশে সাহায্য করে। তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের উপরেও জনসাধারণের অনাস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঠিক এই সময়ে রুশ-জাপানের যুদ্ধে এশিয়ার একটি দেশ হিসাবে জাপানের জয়লাভ (১৯০৫) ও মর্যাদাবৃদ্ধিতে ভারতীয়দের মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। ফলে জাতীয় আন্দোলনের মূলাধার কংগ্রেসে এক নতুন চিন্তা ও এক নতুন নেতৃত্বের উদয় হয়। এই নব্যপন্থীরা জাতীয় সংগ্রামের গতানুগতিক পথ ছেড়ে এক নতুন পথ রচনার প্রয়াসী হন। বর্তমানকালের রাজনৈতিক পরিভাষায় এঁদের বামপন্থী বলা যায়। এই নব্যনেতৃত্বের অন্যতম পুরোধা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল।[২]

বিনয়কুমার সরকারের ভাষায় বলতে গেলে, বিপিনচন্দ্র শুধু গলার জোরে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাবকে সংযুক্ত করেন নি—"বিদ্যায়, রাষ্ট্রনীতি-জ্ঞানে, দার্শনিকতায়, বিপ্লবযুগে কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই ছিল উঁচু···বঙ্গবিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা"। বিপিনচন্দ্র ছিলেন আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের প্রথম যুগের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক। বিপিনচন্দ্র বুঝেছিলেন যে, তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপট ছাড়া তৎপরতা ফলপ্রসূ হতে পারে না। রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত তাঁর বিপুল রচনাবলী একথার প্রমাণ।

রাজনৈতিক জীবনে কারো সঙ্গে রফা করতে না পারার দরুন তিনি যেমন জনচিত্তে বিস্মৃতি-বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনেও আপস করে চলতে না পারায় তাঁকে নিরতিশয় আর্থিক দুর্বিপাক ও নিন্দার ভাগী হতে হয়। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় এবং পরে বিধবা-বিবাহের ফলে পরিবার থেকে বহিষ্কৃত হন। অর্থাভাবে তাঁর লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়।

উচ্চ শিক্ষার জন্যে শ্রীহট্ট থেকে তিনি যখন কলকাতায় আসেন তখন তাঁর বয়স ষোল। আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত "স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন"-এর বিভিন্ন সভায় সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁর মনে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াতসূত্রে তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে পান নীতিনিষ্ঠ জীবনবোধ ও স্বাধীনতার প্রেরণা। কিন্তু যে-কারণে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, অর্থাৎ দেশভক্তি ও স্বাজাত্যাভিমান জড়িত উন্নত ও উদার স্বাধীনতার আদর্শ, তা তিনি কেশবচন্দ্রের মধ্যে খুঁজে পান নি। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ক্রমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদার আদর্শের বিচ্যুতি, প্রেরিত আদেশবাদ এবং গর্হিত সমাজাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। স্বাধীনতা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। নিজের বিচারবুদ্ধিকে তিনি শাস্ত্রের বা লোকাচারের কাছে বাঁধা রাখেন নি। সেকালের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মদের মধ্যে যে সংকীর্ণতা দেখা যেত তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র শিবনাথ শাস্ত্রীর কাছে ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে স্বাদেশিকতার দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৮৭৬)।[২] পরবর্তীকালে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)-এর রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কটকের এক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে পৈতৃক নিবাস শ্রীহট্টে ফিরে গিয়ে সেখানে একটি বিদ্যালয় স্থাপন (১৮৮০) করেন। সেটিই বাংলাদেশে "জাতীয়" নামে আখ্যাত প্রথম বিদ্যালয়। শ্রীহট্টে 'পরিদর্শক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনের মাধ্যমে তাঁর সাংবাদিক জীবনের সূত্রপাত হয় এবং সেখানে বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁর ভাবী দিনের বাগ্মিতা ও প্রখর মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জীবিকাসূত্রে এরপর বাঙালোরে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে তাঁকে দেখা যায়। কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির (পরবর্তীকালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি ও ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি নামে রূপান্তরিত) গ্রন্থাগারিক পদে (১৮৯০-৯২) তিনি কিছুকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিপিনচন্দ্রের প্রতিভা ও খ্যাতি যখন ঊর্ধ্বগামী তখন বাংলার মননজীবনে চলেছিল বিচিত্র ও বহুমুখী অগ্রসৃতি।

বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ মনীষীর সংস্পর্শ লাভ করে তিনি বৈষ্ণব চিন্তায় প্রভাবিত হন। বাংলার নবজাগরণে ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল বটে, কিন্তু ক্রমে তিনি সনাতন হিন্দু ভাবধারার অনুরাগী হয়ে পড়েন। চিত্তরঞ্জন দাশের মতো তিনিও পরিণত বয়সে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্রের 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থে বৈষ্ণব দর্শনের এক অভিনব বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ভারতের অন্তরাত্মা

("Soul of India") মনে করতেন। কৃষ্ণচরিত্রে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয় প্রত্যক্ষ করেছেন।

কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৮৮৭) বিপিনচন্দ্রকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সর্বপ্রথম দেখা যায়। কয়েক বছর আগে প্রবর্তিত অস্ত্র-আইন রদ করা প্রসঙ্গে তিনি ঐ অধিবেশনে এক উত্তেজনাবহুল ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর তৎকালীন মতাদর্শ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন—

> I was a democrat, a democrat of democrats, a radical of radicals ; yet I said that neither my democracy nor my radicalism took away in the least measure from my loyalty to the British Government.[৫]

সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করার আগে তিনি ব্রাহ্মসমাজের একটি বৃত্তি নিয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমে অক্সফোর্ডে এবং পরে সেখান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। ঐ সফরকালে (১৮৯৮-১৯০০) তিনি ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বহু সভায় বক্তৃতা করেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি 'নিউ ইন্ডিয়া' (১৯০১-০৭) পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। জাতীয় জাগরণের গতিধারাকে বেগবান করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এই পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র দেশের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবনতি ও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে বহু মৌলিক ও জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। সেগুলিতে তিনি তীব্র সমালোচনার সঙ্গে বিকল্প ব্যবস্থাদিরও চিত্র তুলে ধরতেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব ঐ সময়ে তাঁর মনে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। তখন থেকে লেখা ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়শীল জাতীয় চেতনা সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এযাবৎকাল তাঁর ক্রিয়াকলাপ রাজনীতির তুলনায় সাংস্কৃতিক বিষয়াদির মধ্যেই অধিকতর নিবদ্ধ ছিল। মনোভাবের দিক থেকে তখনও তিনি মডারেটপন্থী। নৌরজি-গোখলে-মেটা-বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ নেতৃবৃন্দের অনুগামীরূপে তাঁর চোখে ইংরেজরা তখন ছিল হৃদয়বত্তা ও ন্যায়বিচারের দিব্য প্রতিভূ। রাজনৈতিক সমস্যার প্রতিকারে তিনি আবেদন-নিবেদন ও প্রার্থনা-প্রতিবাদকেই মনে করতেন একমাত্র উপায়। কলকাতায় শিবাজি-উৎসব অনুষ্ঠানকালে (১৯০২) বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন—

> We are loyal, because we believe in the workings of the Divine Providence in our national history, both ancient and modern, because we believe that God himself has led the British to this country, to help it in, working out its

salvation, and realise its heaven appointed destiny among the nations of the world.[৬]

চরমপন্থী ও বিপ্লবী চিন্তার পরিচয় বরং এর অনেক আগেই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত অরবিন্দ ঘোষের লেখাগুলিতে (১৮৯৩-৯৪) পাওয়া যায়। ১৯০৩ সালে যখন বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তখন বিপিনচন্দ্র ইংরেজের স্বরূপ উপলব্ধি করেন এবং তাঁর ইংরেজ-ভক্তি টুটে যায়। 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথ ছেড়ে রাজনীতির পথ অনুসরণ করে। ইংরেজ-শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি অর্জনের আহ্বান এবার তাঁর কণ্ঠ ও লেখনীতে ধ্বনিত হতে থাকে। আমলাতন্ত্রের বাধর্ক্য স্বেচ্ছাচারিতা থেকে উদ্ভূত দেশের গণবিক্ষোভে তিনি নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্বদেশ ও বিদেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কংগ্রেসের অনুসৃত এতদিনকার নিরুত্তাপ কর্মপন্থায় লোকে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল— নবীনপন্থীদের মধ্যে একটা জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছিল, যার পিছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আদর্শ এবং মহারাষ্ট্রে টিলকের নেতৃত্বে মুক্তি-আন্দোলনের অনুরূপ আদর্শ ও কর্মপন্থা। বহির্বিশ্বে আবিসিনিয়ায় ইতালির পরাজয় (১৮৯৬), দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২), চীন ও ইরানে গণ-অভ্যুত্থান, জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় (১৯০৫) প্রভৃতি সংবাদ নিত্যই ভারতীয় সংগ্রামীদের মনে ক্রমাগত রাজনীতির নতুন চেতনা উন্মোচিত করতে থাকে।

নিজস্ব পত্রিকা 'নিউ ইন্ডিয়া'র মাধ্যমে ও বক্তৃতামঞ্চে বিপিনচন্দ্র অবিরাম সাম্রাজ্যবাদীদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিতে থাকেন; দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের নবরূপায়ণের প্রস্তাবও করেন। স্বাধীনতা অর্জনের কথা দেশ তখনও ভাবতে প্রস্তুত হয় নি। তিনি বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে সাময়িক উপায় হিসাবেই দেখেন নি, মুক্তিসংগ্রামের অস্ত্রস্বরূপেও প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সেইসঙ্গে ইংরেজের গড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিহারপূর্বক জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তনকেও তিনি কাজে লাগান। বস্তুত গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের কর্মধারা শুরু হওয়ার বহু পূর্বেই অনুরূপ ধরনের আন্দোলনের বীজ বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় ও কর্মসূচিতে পাওয়া যায়—যাকে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ Passive Resistance না প্রচার করেন।

১৯০৫ সালের শেষাশেষি দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় চরমপন্থী মনোভাব প্রবল হয়ে ওঠে এবং স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে জনচেতনায়

উচ্ছ্বাসের বান ডাকে। বিপিনচন্দ্রকে সেই আন্দোলনের সংগঠক ও তাত্ত্বিক পুরোধারূপে দেখা যায়। ১৯০৬ সালের ৬ আগস্ট বিপিনচন্দ্র দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন এবং একসঙ্গে দুটি পত্রিকাই (অন্যটি 'নিউ ইন্ডিয়া') চালিয়ে যেতে থাকেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদকরূপে পরে অনেককে দেখা গেলেও এর সম্পাদনার দায়িত্ব তিনিই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিকতা ও লেখার কাজ অব্যাহত রেখেই এই সময়ে তিনি দেশব্যাপী প্রচারকার্যে বেরিয়ে পড়েন। দাক্ষিণাত্য ও পূর্বভারতে তাঁর এই সফর দেশের সর্বস্তরের মানুষকে স্বদেশী আন্দোলনে ও স্বরাজের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

ইতিমধ্যে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে স্থায়ীভাবে চলে এসে (১৯০৬) জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের অধ্যক্ষপদে এবং 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দিয়েছেন। চরমপন্থায় বিশ্বাসী ও গণ-অভ্যুত্থানের পক্ষপাতী অরবিন্দ বিপিনচন্দ্রের মধ্যে স্বীয় মতাদর্শের মিল খুঁজে পান।

সমকালীন মডারেট রাজনীতিকদের কুক্ষিগত কংগ্রেসী-নেতৃত্বের চরিত্র সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র অবহিত ছিলেন। কংগ্রেসে দেশের সাধারণ মানুষের স্থান ও ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও যথেষ্ট সংশয় পোষণ করতেন। তাঁর তৎকালীন রচনায় এই সংশয়ের আভাস পাওয়া যায়। কংগ্রেসকে কায়েমি স্বার্থের কবল থেকে মুক্ত করে যথার্থ এক গণতান্ত্রিক সংগঠনে পরিণত করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়—

> Is the ideal of the Indian National Congress to be an essentially democratic ideal, or is it to work for the replacement of the present white and foreign bureaucracy by a brown one composed of home-materials…[৭]

'বন্দেমাতরম' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের মতভেদ রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরিচালনা-সংক্রান্ত মতানৈক্য ছাড়াও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে গুপ্ত সমিতির কার্যকলাপ ভীরুতা ও কাপুরুষতাকেই মাত্র প্রশ্রয় দেয়। এইসব ক্রিয়াকলাপে সরকারের নিপীড়নের মাত্রা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে এবং জাতির সংগ্রামী মনোবল তাতে ভেঙে পড়তে পারে।[৮] এইসব কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্'-এর সংস্রব ত্যাগ করেন। পত্রিকাটির সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অরবিন্দের উপর ন্যস্ত হয়। মুরারিপুকুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ধৃত হলে (১৯০৮) তিনি আবার বন্দেমাতরমের সঙ্গে যুক্ত হন। এর ঠিক আগে প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও এই পত্রিকার প্রতি

তাঁর অন্তরের টান কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ছিল। তাই বন্দেমাতরমে প্রকাশিত রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধের জন্যে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় (আগস্ট, ১৯০৭) স্বাক্ষ্যদান করতে স্বীকৃত না হয়ে স্বেচ্ছায় তিনি ছ-মাসের জন্যে কারাবরণ করেছিলেন।

কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) চরমপন্থীদের ভূমিকা কিছুটা সফল হওয়ায় তাঁদের দলীয় শক্তি ও উদ্দীপনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। বিপিনচন্দ্র সারা ভারত পরিভ্রমণ করে তাঁর Passive Resistance-এর আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকেন। "passive" শব্দটিকে তিনি ঠিক "নিষ্ক্রিয়" অর্থে ব্যবহার করেন নি। ইংরেজি "aggressive" শব্দের বিকল্প হিসাবেই ঐ কথাটি প্রয়োগ করেছিলেন। আইন-ভঙ্গের দিকে না গিয়েও দেশের প্রচলিত শাসনব্যবস্থাকে বিকল করার উপায় হিসাবে তিনি Passive Resistence-এর সাহায্যে দেশে একটি সমান্তরাল শাসন-কাঠামো (parallel administrative structure) গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তিনি বলেন—

> The broad application of this method of Passive Resistance has brought out two or three special movements in India··· And by these means, Boycott, National Education and Swadeshi included in the Boycott, and by the organisation of the forces and the resources of the people, and by setting up a scheme of practical self-government running parallel to officialised institutions of self-government in the country—to find a school of civic duties for the people.[৯]

বিপিনচন্দ্রের এই 'parallel self-government' বিষয়ক চিন্তার সঙ্গে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" গঠনের প্রস্তাব এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের "Constituent Assembly" গঠনের প্রস্তাবেরও বেশ মিল দেখা যায়।

ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মীদের তিক্ত ও তীব্র বিতৃষ্ণা থাকলেও তা কখনো জাতিবিদ্বেষের রূপ পরিগ্রহ করে নি, "We have preached isolation from the foreigner it is true, but not hatred of him"।[১০] হিংসাত্মক কার্যকলাপেও তাঁর আদৌ সমর্থন ছিল না। এ-সম্পর্কে তিনি 'বন্দেমাতরম'-এ লেখেন—

> Swaraj has been our proclaimed ideal and the open and lawful methods of Boycott, National Education, National Volunteering, Arbitration Committees and other lawful measures of self-help and self-organisation have been our

professed means for the realisation of this ideal. Bombs and assassinations have had therefore, absolutely no place in our propaganda. Both our instinct and our wisdom equally rebel against these outlandish methods of political warfare.[১১]

বিপিনচন্দ্রের তৎকালীন প্রবন্ধগুলি নানা কারণেই বিশেষ তাৎপর্যবহ। ভারতের জাতীয় সংগ্রাম যে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসমাত্রই নয়, ভারতীয় জনজীবনের পূর্ণাঙ্গ অভ্যুন্নতি ও প্রতিটি মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশই যে তার প্রধান লক্ষ্য—বিপিনচন্দ্র সে-কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন। বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ উভয়েই স্বরাজকে মানবতন্ত্রী মুক্তির দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনকে বিপিনচন্দ্র স্পষ্টত 'Spiritual Movement' নামে অভিহিত করেন।

সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) চরমপন্থী দলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর নরমপন্থীদের আধিপত্য বজায় থাকলেও কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন হীনবল হয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপে দলবলসহ অরবিন্দের গ্রেপ্তার ও টিলকের কারাদণ্ড এবং তৎসহ সরকারি দমননীতির প্রাবল্যে চরমপন্থী দল বেশ কিছুকালের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। ১৯০৮ সালের আগস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র ভারতভূমি ত্যাগ করে দেশান্তর গমনে বাধ্য হন। তাঁর এই বিলাতযাত্রা মূলত রাজনৈতিক নির্বাসন হলেও বিদেশে ভারতের মুক্তি-আন্দোলন সংক্রান্ত প্রচারকার্যেই তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপে তখন কৃষ্ণবর্মা, সাভারকর, মাদাম কামা, লালা হরদয়াল প্রমুখ বিপ্লবী খুবই কর্মতৎপর ছিলেন। তাঁরা আশা করেছিলেন যে বিপিনচন্দ্র তাঁদের সশস্ত্র বিপ্লবপ্রচেষ্টার সহায়ক হবেন। কিন্তু তৎপরিবর্তে বিপিনচন্দ্র সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টার বিরোধিতাই করেন। অবশ্য কর্মধারা বিষয়ে তাঁর মতামত যাই হোক না কেন, তিনি কিন্তু ঐ-সব বিপ্লবীদের দেশভক্তি ও ত্যাগের অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাতে ভোলেন নি।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে বিপিনচন্দ্রের চিন্তায় এক আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। চরম মতের পরিবর্তে ক্রমে তাঁর মন নরমপন্থী হতে শুরু করে। অবশ্য যখন তিনি চরমপন্থী ছিলেন তখনও হিংসাত্মক বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করতেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালেই তিনি 'স্বরাজ' (১৯০৯) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতার জন্যেও তাঁর ডাক আসে। বক্তৃতা ও পত্রিকার মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দার্শনিক আদর্শ ও বিশ্বজনীনতার প্রচারে প্রবৃত্ত হন। তৎকালীন প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও উন্নত জীবনাদর্শ গড়ে তোলার

উদ্দেশ্যে তিনি বিলাতে 'ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট' (১৯১১) নামে আর একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে থাকেন।

এযাবৎকাল বিপিনচন্দ্রের স্বরাজচিন্তার মৌল বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্য থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। এবার সে চিন্তা অভিনব ব্যঞ্জনায় ভিন্ন রূপ নিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ভারতের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা— এ-দুইয়ের মধ্যে তিনি এক সমন্বয়ধর্মী পথের নিশানা দেখাতে শুরু করলেন। বিচ্ছিন্ন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার পরিবর্তে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সমবায়ী সম্পর্কে আবদ্ধ এক নতুন ব্যবস্থার চিত্র তিনি তুলে ধরলেন—

> If God were to appear before me with the gift of absolute but isolated sovereign independence for India in his right hand, and of an equal co-partnership with Great Britain and her colonies in the present Association called the British Empire, in his left hand, I would unhesitatingly say, 'Father' give us the gift in your left hand.[১২]

পূর্বের চিন্তা ও কর্মপন্থা থেকে বিচ্যুতি ঘটা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়েই বলেন যে, তিনি পূর্বে যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অন্তঃসারশূন্যতার কথা বলেছিলেন এবং স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন তা বয়কট বা স্বদেশী আন্দোলনের লক্ষ্যস্বরূপ "Universal Humanity"-র আদর্শেই উদ্ভূত হয়। দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাধারার পারম্পর্য যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি সে-কথার প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন—

> I frankly confess, that this Federal ideal, not only in relation to the different communities and provincialities of India but comprising within itself the different units of the existing British Empire, was not revealed in the earlier years of our Nationalist agitation. The time was not yet ripe for it. To proclaim this ideal in 1905 or 1908 would have been suicidal to the Nationalist cause. Those years were of protest and self-assertion.[১৩]

এই মতপরিবর্তন সম্পর্কে বিপিনচন্দ্রের আর একটি প্রধান যুক্তি ছিল যে, সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে শাসকদের মনোভাবে কঠোরতার মাত্রাই কেবল বৃদ্ধি পায়। 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা একের পর এক সরকারি রোষদৃষ্টিতে পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। অনুশীলন সমিতি এবং অনুরূপ অন্যান্য সংস্থা বে-আইনি ঘোষিত হয় : সরকার ফৌজদারি আইন

সংস্কার করে বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতাদের কারারুদ্ধ করেন (১৯০৮); অতঃপর মর্লে-মিন্টো শাসন ব্যবস্থা (১৯০৯) প্রবর্তিত হয়। ১৯০৯ সালের মাঝামাঝি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁর "উত্তরপাড়া ভাষণ"-এ অরবিন্দ সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির শূন্যতা ও নৈরাশ্যজনক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের (১৯১১) পর বিপিনচন্দ্র কংগ্রেস সংগঠনে চরমপন্থীদের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ প্রত্যক্ষ করেন। সুরাট অধিবেশনের পর কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছিল, কিন্তু ১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত লখনৌ কংগ্রেসে আবার ঐক্য দেখা দেয়। নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ফিরে আসে। টিলক ও অ্যানি বেসান্ট-প্রবর্তিত "হোম-রুল" আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র অংশ গ্রহণ করেন। সারা দেশে তাঁদের প্রচার অভিযান চলতে থাকে। এইসময়ে বিপিনচন্দ্রের গতিবিধির উপর এক সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ১৯১৮ সালে টিলক ও বিপিনচন্দ্র আন্তর্জাতিক হোম-রুল সম্মেলনে যোগদানের জন্যে ইংল্যান্ড অভিমুখে যাত্রা করেন।

বিপিনচন্দ্র উগ্রপন্থী চিন্তাধারা থেকে সরে আসায় পরবর্তীকালে গান্ধীর অসহযোগ-নীতির সঙ্গে তাঁর সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গান্ধীর অহিংস-অসহযোগে তাঁর বিশেষ অসম্মতি না থাকলেও কর্মপদ্ধতি নিয়ে উভয়ের মধ্যে তীব্র মতভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। কাউন্সিল, আদালত, শিক্ষালয় ইত্যাদি সবকিছুই গান্ধী বয়কট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্দ্রের বিবেচনায় তা ক্ষতিকর ও নিরর্থ বলে মনে হয়। মালব্য, চিত্তরঞ্জন, জিন্না প্রমুখ উদীয়মান নেতৃবৃন্দের সমর্থন সত্ত্বেও ভোটে বিপিনচন্দ্রের অনুবর্তীরা পরাজিত হন। ক্ষতিকর বিবেচনায় গান্ধী সমর্থিত খিলাফত-আন্দোলনকেও বিপিনচন্দ্র সমর্থন করতে পারেন নি। খিলাফত-আন্দোলনকে উপলক্ষ করে যে "প্যান-ইসলাম"-এর সূত্রপাত হয় তার সুদূরপ্রসারী অশুভ ফলাফলের বিষয়ে বিপিনচন্দ্র তৎকালেই দেশবাসীর প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন।

বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২১) সভাপতিরূপে বিপিনচন্দ্রকে তাঁর গান্ধীবিরোধী মনোভাবের জন্যে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ গান্ধীর প্রভাব তখন সারা দেশে বিদ্যুৎগতিতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর, ১৯২০) গান্ধী বলেছিলেন যে সদ্যঃপ্রস্তাবিত অসহযোগ আন্দোলনে দেশবাসী কায়মনোবাক্যে যোগদান করলে দিব্য বিধান অনুসারে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ অর্জিত হবে। গান্ধীর এই উক্তির সমালোচনা করে বিপিনচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন যে সেই কার্যক্রমই বর্তমানে বাঞ্ছনীয় যার ভিত্তি হল "লজিক", "ম্যাজিক" নয়। কিন্তু গান্ধীর সঙ্গে

তীব্র রাজনৈতিক মতপার্থক্যের পরিণামস্বরূপ এইসময় থেকেই বিপিনচন্দ্রের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়তে থাকে।

১৯২৮ সালে লখনৌয়ে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে বিপিনচন্দ্রকে প্রকাশ্য রাজনীতির ক্ষেত্রে শেষবারের মতো দেখা যায়। অতঃপর তিনি সক্রিয় রাজনীতি ছেড়ে সাংবাদিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠরোধ করে রাজনীতি থেকে তাঁকে অপসারণ ও কোণঠাসা করে রাখার নানাবিধ চেষ্টা চলতে থাকে। বিরোধীদের এই প্রয়াস সফল হয়। স্বদেশী যুগের অবিসংবাদিত নেতা বিপিনচন্দ্র ক্রমে জনচিত্তের অন্তরালবর্তী হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯৩২ সালে নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যেই নবীন বাংলার এই মনস্বী নেতার জীবন-দীপ সবার অলক্ষ্যে নিভে যায়।

দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

ছাত্রজীবনেই বিপিনচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ব্রাহ্মদের আধ্যাত্মিক আদর্শের পরিবর্তে তাঁদের সামাজিক মনোভাব ও স্বাদেশিকতাবোধ তাঁকে অধিক আকৃষ্ঠ করেছিল। স্বাধীন মানবিকতার সাধনক্ষেত্ররূপে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ও সমাজের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সম্ভাবনা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের মজলিশি ধর্মালোচনা, যুক্তিবর্জিত ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধী মনোভাব, প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদ এবং ঐশ আদেশ সংক্রান্ত প্রত্যয়, গর্হিত সামাজিক আচার প্রভৃতি কারণে বিপিনচন্দ্রের মন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে ক্রমে ভাঙন ধরতে শুরু করলে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত হয় (মে, ১৮৭৮)। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উদ্যোক্তা শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে বিপিনচন্দ্র "স্বাধীনতার সাধনার ও স্বদেশচর্যার"[১৭] আদর্শ খুঁজে পেলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী বিপিনচন্দ্রকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে তখন থেকে ধর্মসাধনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমকে চরিতার্থ করার প্রথম প্রয়াস দেখা দেয়। সমসাময়িককালে বাংলাদেশে পাশ্চমী অজ্ঞাবাদ (agnosticism) ও বস্তুতান্ত্রিকতার যে-প্রভাব পড়েছিল বিপিনচন্দ্র তা থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু যে আবেগ তাঁর মনে অনুক্ষণ বিরাজ করত তাকে ব্রাহ্মধর্মান্দোলনও পরিতৃপ্ত করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে তিনি ক্রমে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বৈষ্ণব ভাবধারায় অনুপ্রেরণা লাভ করেন, বৈষ্ণব দর্শনকে তিনি অভিনব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেশের নবযুগের দার্শনিক ভিত্তিভূমিরূপে ঐ আদর্শকে তুলে ধরেছেন।

বিপিনচন্দ্রের মতে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভুর বৈষ্ণব আদর্শে সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করে। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনার ধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বৈষ্ণব সাধনমার্গ থেকে পৃথক।[১৫] উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার উপর মূলত প্রতিষ্ঠিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন যে পদ্ধতিতে ব্যাখ্যাত হয়েছে—যুক্তি ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার অকাট্যতা লক্ষণীয়। বিপিনচন্দ্র এতদ্বিষয়ক আলোচনায় দেখিয়েছেন যে উপনিষদের ব্রহ্ম, যোগদর্শনের পরমাত্মা এবং ভক্তিবাদের ভগবান তিনটি পৃথক সত্তা নন—একই সত্তার তিনটি অঙ্গবিশেষ।[১৬] বিশ্বচরাচরের উৎপত্তি, অবস্থান ও লয় সম্পর্কিত পরম জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জীব ও জড়ের অসীম মহাসমন্বয় (unity)। এবং পরমাত্মা সেই একই মহাসমন্বয় হলেও, জীবের অন্তর ও বহির্জীবনের যোগসূত্র বজায় রাখেন ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মহাজাগতিক (cosmic) প্রবাহ থেকে ব্যক্তিজীবনও বিচ্ছিন্ন নয়।

প্রশ্ন এখন, কোন্ শক্তিবলে ব্যক্তিচেতনা সমষ্টির সঙ্গে, মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়—জড় ও চেতনেব এবং বিভিন্ন মানুষ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম ও সাহচর্যের যোগসূত্র কোন্ শক্তিবলে স্থাপিত হয়? বাংলার বৈষ্ণববাদী চিন্তা অনুসারে সেই যোগসূত্রের স্থাপনকর্তা হলেন ভগবান। ব্রহ্ম নৈর্ব্যক্তিক, পরমাত্মা ব্যক্তিত্বের ধারক ও বাহক, ভগবান একদিকে মানুষের সঙ্গে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগ রক্ষা করেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কসূত্রও বজায় রাখেন। ভগবান নৈর্ব্যক্তিক নন, কিন্তু পরমপুরুষ হিসাবে বহুবিশ্লিষ্ট ও বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিসমুদয়কে সমন্বিত করেন।[১৭]

বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভগবান নিছক কল্পনা কিংবা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিমাত্র নন, তিনি দেহীর ন্যায় বিরাজমান। এখানে দেহী কথাটির মধ্যে এক দ্বিধ প্রত্যয় বর্তমান। প্রথমাবস্থায় মানুষ পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে; সমগ্র পারিপার্শ্বিককে কেবল জানা ও অনুভব করার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা হয় না ; তদনুযায়ী ক্রিয়াশীলতায় ব্যক্তিত্বের পরিপূর্তি ঘটে। প্রথমে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় পৃথক থাকে, কিন্তু ক্রমে উভয়ের সাযুজ্যে জ্ঞান ও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতা দেখা দেয়। বৈষ্ণব মতে পরম সত্তা একদিকে যেমন মানবিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক নন, তেমনি সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীভূতও নন। ঐক্যানৈক্যই তাঁর প্রকৃতি। বিপিনচন্দ্র এই প্রকৃতিকে হেগেলের দ্বান্দ্বিক (dialectic) প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১৮] সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের এই চিরন্তন প্রক্রিয়া তাঁর মতে ঈশ্বরের লীলা। ঐশী লীলার মধ্যে চলে পুরুষ ও প্রকৃতির নিরন্তর মিলন ও বিচ্ছেদ—শংকরাচার্যের অনুসরণে তাকে কিন্তু মায়ারূপে দেখা হয় নি।[১৯]

বিপিনচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই ভগবান বা

পরমসত্তারূপে কল্পিত। অবতাররূপে তাঁর মানবদেহ ধারণের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। কারণ মানুষেরই মধ্যে তিনি নিত্য বিরাজমান। ভগবান নিরাকার নন, আবার জড়াকারও নন, তিনি চিদাকার; তিনি অতীন্দ্রিয় হলেও চিদিন্দ্রিয়-সম্পন্ন। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত কোটি জীবের সঙ্গে তিনি নিরন্তর লীলা করছেন।[২০] বিপিনচন্দ্র বলেছেন যে দুর্দমনীয় স্বাধীনতার স্পৃহা এবং সাধনার মাধ্যমে দেবতাকে মানুষরূপে কল্পনা ও মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা বাঙালির চিন্তা ও সাধনার ইতিহাসে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন শাস্ত্রকে মান্য করেও তার অভিনব ব্যাখ্যার দ্বারা শাস্ত্রবন্ধনকে বাংলাদেশে শিথিল করা হয়েছে। ধর্ম ও সমাজ, স্মৃতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভারতের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বাংলা-দেশের মনোভাব ছিল উদারনীতি ও সাম্যের পরিপোষক। এই স্বাধীনতার ভাব ও মানবতার আদর্শ মজ্জাগত থাকায় ইংরেজরা ইউরোপ থেকে মুক্তি ও মানবতার বাণী বহন করে আনার ফলে বাঙালির সুপ্ত স্মৃতি আবার জেগে ওঠে। তাঁর মতে উনিশ শতকের নবযুগে বাংলার সনাতন মুক্তি ও মানবতার আদর্শ নবরূপ লাভ করেছিল।[২১]

তিনি দেখিয়েছেন যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত ও সাধনায় তত্ত্বাঙ্গ, ভাবাঙ্গ ও ভজনাঙ্গের মধ্যে এক অসামান্য স্বাধীনতা ও প্রেরণার আদর্শ ছিল। জাতিবর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলকে সমানভাবে নিজ সম্প্রদায়-ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। মহাপ্রভু বাংলাদেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচার করে সমাজ ও শাস্ত্রের শাসনবন্ধন থেকে মুক্তিপ্রয়াসী এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেন।[২২]

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত কৃষ্ণচরিত্রের মতো বিপিনচন্দ্রও নিজস্ব ও স্বতন্ত্র এক কৃষ্ণতত্ত্ব রচনা করেছেন। কৃষ্ণকে তিনিও এক ঐতিহাসিক পুরুষরূপে প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে ঐক্য ও সমন্বয়ের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন অলৌকিক উপাখ্যানগুলির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এদেশে আর্যরা উপনিবেশ স্থাপন করার পর অনার্যদের সঙ্গে যে-সংঘর্ষ দেখা দেয় অনার্য-বংশোদ্ভূত শ্রীকৃষ্ণই সেই সংঘাতের নিষ্পত্তি ও সমন্বয় সাধন করেন।

বিপিনচন্দ্রের বক্তব্য হল যে, কৃষ্ণের বাণীতেই ন্যায়পরায়ণতা ও জাতীয় কর্তব্যের যথার্থ নির্দেশ পাওয়া যায়। কৃষ্ণের নিষ্কাম কর্মের উপদেশ পালনে কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সকলেরই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও মুক্তি সাধিত হবে। কৃষ্ণের বিশ্বজনীন প্রেমের বাণীতে ত্যাগ ও নিষ্কাম কর্মৈষণা নিগূঢ় আনন্দবহ। সেই প্রেমের দৃষ্টিতে সমগ্রের জন্যে অংশের আত্মত্যাগ চিরন্তন মঙ্গলার্থেই প্রয়োজন; পরিণামে সমগ্রের মধ্যেই অংশ নিজেকে খুঁজে পায়। বিপিনচন্দ্রের মতে ভারতের সংখ্যাতীত জাতি, বর্ণ ও ধর্মের মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব বর্তমান—একমাত্র কৃষ্ণের বাণীতেই

তার স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায়; কৃষ্ণ স্বয়ং প্রেম, ঐক্য ও সমন্বয়ের প্রতীকস্বরূপ।[২৩]

ইতিহাসচিন্তা

আরোহী (inductive) বিচারপদ্ধতিতে বিপিনচন্দ্র ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেছেন। জাগতিক বিবর্তনধারায় তিনি দ্বান্দ্বিক (dialectical) প্রক্রিয়া উপলব্ধি করেন। তাঁর ব্যাখ্যানুসারে পরব্রহ্মই সেই জাগতিক বিবর্তনের নিয়ন্তা। তাঁর মতে ইতিহাসের পশ্চাতে ঐশ নির্দেশনা (determinism) বর্তমান। ইতিহাস উদ্দেশ্যহীন, পারম্পর্যরহিত ও বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘটনার সমাহারমাত্র নয়; ইতিহাস হল দিব্য উদ্দেশ্য ও নির্দেশের অভিব্যক্তিস্বরূপ। ইতিহাসের মধ্যে এক মহান অর্থ ও শুভ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে—ভারতের ক্ষেত্রে যা হল আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন ও সত্যশিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা। প্রত্যয়টি হয়তো সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ও নেতৃত্বের আধ্যাত্মিক ভাবভূমি ও চেতনার প্রয়োজনে তিনি উক্ত ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইতিহাসের তিনি ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—

> The Sociological and Psychological group of the sciences have been revealing to us certain universal truths and principles regarding the course of human development in general, in the light of which, we may now build up a more correct history of any people than has hitherto been furnished by the annals of their kings or the journals of their warriors.[২৪]

দিব্য-নির্দেশনাভিত্তিক যে-নিগূঢ় তাৎপর্য ও সুগভীর অর্থপূর্ণতায় ভারতীয়দের জীবনেতিহাস বিধৃত তা আর্যসভ্যতার আদিপর্ব থেকে শুরু করে মুসলমান আধিপত্য, সেন ও পাল নৃপতিদের শৌর্যবীর্য, মারাঠাদের রাজত্ব, সর্বশেষে ইংরেজ আমল অবধি কালানুক্রমে নিহিত। প্রতীচ্যের বিবর্তনতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ না করেই বিপিনচন্দ্র ভারতের ঐতিহাসিক ধারার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যায় তিনি বেদ ও পুরাণের সাহায্য নিয়েছেন। ইতিহাসকে তিনি ঈশ্বরের লীলাভূমি হিসাবে দেখেছেন। কেশবচন্দ্রের 'God-in-History' প্রত্যয় তাঁকে এ-বিষয়ে প্রভাবিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তিনিও শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের অন্তরাত্মা ('Soul of India') বলে মনে করতেন। কৃষ্ণচরিত্রেই ইতিহাস ও বিবর্তনের মূলসূত্রগুলি বিধৃত। কৃষ্ণচরিত্রে ভারতের আত্মা মূর্ত হয়ে

উঠেছে। দর্শনগুরু ও উপদেষ্টারূপে শ্রীকৃষ্ণ জাতীয় ঐক্য তথা নানা মত ও পথের সমন্বিত প্রতীকস্বরূপ।

ইংরেজ দার্শনিক বোসাঙ্কেট (১৮৪৮-১৯২৩)-এর চিন্তা অনুসরণ করে তিনিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানবমনে প্রতিফলিত দিব্য অভীপ্সা ক্রমান্বয়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। তিনি বলেন যে, পরাধীনতা মানবাত্মার পরিপন্থী; ঈশ্বর তাঁর রূপ ও সত্তায় মানুষকে সৃষ্টি করেছেন—সে মানুষ মুক্তি ও নিষ্কলুষতার অধিকারী—পাপে ও পরাধীনতায় সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। ইংরেজ শাসনাশ্রয়ের মোহ এবং সামাজিক ও জাতীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্তির জন্যে দেশবাসীকে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে।

দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় বিপিনচন্দ্র বিশ্ব-ইতিহাসের সম্ভাব্য তিনটি ধারা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেন—

> এক, সারা দুনিয়ায় সাদাকালোর দ্বন্দ্ব ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠবে; দুই, প্যান-ইসলাম জিগিরের প্রাবল্য; তিন, মঙ্গোলীয়—বিশেষ করে চৈনিক জাতির প্রতাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।[২৫]

তাঁর এ-তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অল্পবিস্তর প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিকারস্বরূপ তিনি ভারত ও ব্রিটেনের পারস্পরিক সাহচর্যমূলক সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভব করেন। সাম্রাজ্য শব্দটির পরিবর্তে সমবায়মূলক অংশীদারি (co-partnership) কথাটি তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ইংরেজের অনুকূলে ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেবার কোনো প্রশ্নই তাতে নেই।

ভারতের সনাতন ঐতিহ্যের অনুরাগী হলেও বিপিনচন্দ্র বাস্তব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে নবভারত গঠন পুরানো ধারায় সম্ভব নয়; ভারতীয় মনন ও চিন্তনে বহু নতুন ধারা মিলিত হওয়ায় অবস্থা হয়েছে বিচিত্র ও জটিল এবং নবোদ্ভূত বিভিন্ন ধারা ক্রমে একই প্রবাহে মিলিত হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সমন্বয়ধর্মী আদর্শের (modern ideal) উদয় হচ্ছে বলে তিনি অনুভব করেন। তত্ত্বগতভাবে সেই আদর্শের মূলসূত্র হল ১. যুক্তিবত্তা, ২. বাস্তবতা, ৩. আধ্যাত্মিকতা ও ৪. সার্বজনীনতা। ব্যবহারিক দিক থেকেও তিনি আদর্শটির তিনটি সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন ১. স্বাধীনতা, ২. মৈত্রী ও ৩. মানবতা। ব্যক্তির সম্যক আত্মোপলব্ধি ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে এবং বাস্তব সমাজজীবনের মধ্যে দিয়ে এই আদর্শ যে মানবিক বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে চলেছে তার চরম পরিণতি ঘটবে আধ্যাত্মিকতায় এবং মনুষ্যজীবনে দেবত্বের প্রতিষ্ঠায়।[২৬]

রা ষ্ট্র দ র্শ ন

বিপিনচন্দ্রের মতে 'পলিটিক্স', 'পেট্রিয়টিজম', 'নেশন', 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' ইত্যাদি শব্দগুলি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় অনুপস্থিত ছিল—পাশ্চাত্ত্য রীতি-নীতির অনুধ্যান ও প্রভাবেই এই শব্দগুলি এদেশে প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে 'রাজধর্ম' ও 'নীতি'—এই কথা দুটিই মাত্র পাওয়া যায়; ইংরেজি statecraft-কেই 'নীতি' বলা চলে—শুক্রনীতি, কৌটিল্যনীতি, চাণক্যনীতি—সবই statecraft-এর অন্তর্গত। যে-নিয়মে আভ্যন্তরিক ও পররাষ্ট্রিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত তাকেও নীতি বলা হত। এই প্রত্যয় শুধু এদেশেই নয়, অন্যান্য প্রাচীন সমাজ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ইউরোপীয় নীতিবিদরা রাজনীতিকে ethics বা ধর্মনীতির অঙ্গ বলে মনে করতেন।[২৭] নীতির প্রতিষ্ঠাকল্পে ভারতীয় নীতিবিদরা মোক্ষ অর্থাৎ জীবের মুক্তিকে আদর্শ হিসাবে রেখেছেন। তাঁদের মতে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্যেই সমাজের প্রয়োজন; সমাজশাসনের মূলেও থাকে সেই একই উদ্দেশ্য অর্থাৎ, মানুষের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শুভ শক্তি ও বৃত্তির উন্মেষসাধনপূর্বক তাকে মোক্ষের দিকে চালনা করা। তৎকালে রাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ছিল: ১. কর্মাঙ্গ বা শাসনাঙ্গ এবং ২. বিধানাঙ্গ। জনচেতনার বৃদ্ধির সঙ্গেই ঐ-দুটির স্বাতন্ত্র্য প্রসারিত হয়। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির চরম প্রয়োজন সাংসারিক উন্নতি নয়; জীবের মোক্ষ বা পারমার্থিক মুক্তিই তার লক্ষ্য। হিন্দুরা সকল জাগতিক সম্বন্ধকে উপেক্ষা না করলেও মূলত তাকে অলীক বা মায়িক মনে করতেন। তাঁরা জড়বাদী জগৎ বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা ও পরমার্থের সন্ধানে অধিক মনোযোগ দেন। তাঁর মতে হিন্দুরা প্রধানত অদ্বৈতবাদী—মায়াব প্রভাবে যেখানে ভেদের আধিপত্য সেখানেও তারা অভেদের পন্থা বের করে; ব্যবহারিক জীবনে ভেদের দ্বারা ভেদকে অতিক্রম করার জন্যে নানাবিধ বিধিনিষেধ, যেমন বর্ণাশ্রমব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বর্ণাশ্রম বংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু অতীতকালে সে আশ্রম ও ধর্মে সার্বজনীন মৈত্রী ও সর্বভূতে সমদৃষ্টির মনোভাব ছিল। ঔদার্য এবং নিরাসক্তিতে মণ্ডিত হিন্দুধর্ম প্রকৃতপক্ষে একটি সমাজধর্ম। হিন্দুরা নেশন গড়তে গিয়ে ধর্মের আচ্ছাদন ব্যবহার করে, সেখানে ইউরোপীয়রা করেছে পলিটিক্সের—তাই ইউরোপে ধর্মের উপরে পেট্রিয়টিজম স্থান পেয়েছে।[২৮]

ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র আরও বলেছেন যে, সন্ন্যাসধর্ম ভারতে প্রাধান্য পাওয়ায় সংসারধর্ম হয়েছে খর্ব—সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশও ব্যাহত হয়েছে। বিপিনচন্দ্রের কথায় "বর্ণবিভাগ নিবন্ধন ও আশ্রম ধর্মের প্রাবল্যহেতু হিন্দুসমাজে কখনো য়ুরোপীয় সমাজের মত ব্যক্তিগত স্বত্ব

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিবার অবসর, প্রয়োজন ও প্রয়াস হয় নাই।" পরিবার, গোষ্ঠী ও সবর্ণের মধ্যেই ব্যষ্টির স্বার্থ ছিল বিলীন। পাশ্চাত্ত্যের পরার্থ প্রবৃত্তি যেখানে স্বাদেশিকতায় রূপায়িত সেখানে হিন্দুদের পরার্থ চিন্তা গোত্রবর্ণ অতিক্রম করে সর্বভূতে উপনীত। পাশ্চাত্ত্যে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক পেট্রিয়টিজমের জন্মদান করে, তাদের কাছে রাষ্ট্রই সনাতন বস্তু; ভারতের সনাতন বস্তু ধর্ম। ধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারতে শিখ ও মারাঠা জাতি সংঘবদ্ধ হয়েছিল।[২৯]

বিপিনচন্দ্রের মতে ধর্মের বন্ধন কেবল ধর্মেরই নয়। ধর্মের সঙ্গে, ধর্মের মধ্যে সর্বত্র মানুষের সাংসারিক স্বার্থ ও সুখানুসন্ধান প্রবৃত্তি নিহিত থাকে। হিন্দু, ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্ম কেবল পরমার্থের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় নি; লৌকিক ও সাংসারিক স্বার্থ ও সুখানুসন্ধানের দ্বারাই সেগুলি পরিপুষ্ট হয়েছে। রাষ্ট্র ও নেশন প্রতিষ্ঠায় সূক্ষ্ম ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা সাংসারিক সুখের স্বার্থসন্ধানই ছিল অধিকতর প্রবল। তাই মোগল সাম্রাজ্যের শেষাবস্থায় বারভুঁইয়াদের যে-অভ্যুদয় ঘটে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের কোনো অনৈক্য ছিল না। তেমনি সিপাহি বিদ্রোহের সময় ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে। কাজেই ধর্মের বন্ধন নয়—স্বার্থের বন্ধনেই নেশনের জন্ম। অপর নেশনের সঙ্গে ভেদ আর নিজের নেশনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যথাসম্ভব ঐক্য ও একাত্মতা বজায় রাখা নেশন গঠনের আসল রহস্য। নেশন হতে গেলেই বিশ্বের অন্যান্য মানবসমষ্টি থেকে পৃথক হয়ে থাকতে হয়। বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে মানবেতিহাস ও মানবসমাজের প্রকৃতি ও বিবর্তনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক বিশ্বব্যাপী ও বিশাল সমাজবিজ্ঞান আছে—সেই দৃষ্টিতেই বিশ্বনেশনের সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। বহু শাখা সংবলিত এই বিশ্ব-নেশনের মনোভাব নিয়েই ভারতীয় নেশনের তিনি বিকাশসাধন করতে চেয়েছিলেন।[৩০]

বিপিনচন্দ্র ভারতীয় চিন্তা ও সাধনায় 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' শব্দটির কোনো প্রতিশব্দ নেই বলে মনে করতেন। তাঁর মতে ইন্ডিপেন্ডেন্স ও স্বাধীনতা এক কথা নয়। স্বাধীনতা বা স্বরাজকে তিনি 'অটোনমি' অর্থে দেখতেন। ইন্ডিপেন্ডেন্স অভাবাত্মক, পক্ষান্তরে স্বাধীনতা ভাবাত্মক। ইন্ডিপেন্ডেন্স বা অনধীনতায় স্বরাজ লাভ করা যায় না; ভারতের সনাতন মুক্তির সাধনা কখনও অনধীনতার মাধ্যমে সাধিত হবে না। ভারতীয়েরা একের উপাসক, তারা পৃথিবীকে কোনো দিন ভাগবাটোয়ারায় উদ্যত হয় নি। এই দুষ্প্রবৃত্তির ফলেই জার্মানি প্রভৃতি ইউরোপীয় রাষ্ট্র বিপর্যয় বরণ করেছে।[৩১]

অক্ষয়কুমারের মতো বিপিনচন্দ্রও নেশনকে জৈব (organic) প্রত্যয়ে বিশ্লেষণ

করেন। নেশন তাঁর মতে একটি যান্ত্রিক ক্রিয়ার ফল নয়, পরম্পরবিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ও নয়। জীবসদৃশ নেশন সর্বব্যাপী এক চেতনা ও নীতির সমন্বয়ে আবন্ধ। নেশনেই মানবিক সত্তার পরিপূর্তি ঘটে এবং পরমাত্মা প্রকাশমান হন; ব্যক্তিমানুষের মহত্তর স্বার্থানুকূল্যেই আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে বলে তিনি অনুভব করতেন। ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা ও চেতনায় ভাবী দিনের দিব্য উদ্দেশ্য অভিমুখে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উপাদানে গঠিত জীবসদৃশ নেশন নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। নেশনের জৈব গঠন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> In a nation, the individuals composing it stand in an organic relation to one another and to the whole of which they are limbs and organs. A crowd is a collection of individuals; a nation is an organism, the individuals are its organs. Organs find the fulfilment of their ends, not in themselves but in the collective life of the organism to which they belong. Kill the organism—the organs cease to be and to act···An organism is logically prior to the organs. Organs evolve, organs change, but the organism remains itself all the same. Individuals are born, individuals die, but the nation liveth for ever.[৩২]

জাতীয়তাবাদকেও বিপিনচন্দ্র আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতেন। নিছক রাজনৈতিক স্বাধিকারকেই তিনি পরম বলে মনে করতেন না। তাঁর কথায়—

> আমি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বরাজ চাহি এইজন্য যে এই স্বাধীনতা বা স্বরাজ ব্যতীত পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশ কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। আর আমার নিকটে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ অর্থ প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে-দেবতা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে প্রকট করা।[৩৩]

তাঁর মতে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যার মধ্যে বিকশিত হয়েছে জীব ও শিব যুগপৎ তারই মধ্যে প্রকাশমান। যে ভাগ্যবান এই মানুষের সাক্ষাৎলাভ করে তাকে আর মূর্তি গড়ে উপাসনা করতে হয় না। মনুষ্যত্বের বিকাশ সর্বব্যাপী বা সর্বাত্মক হলে সকলে সকলকে পূজা করবে; সংসারেই হবে স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন—দুঃখদারিদ্র্য ও পরাধীনতা মনুষ্যত্ব বা দেবত্বের অবমাননা ছাড়া আর কিছু নয়। দারিদ্র্য ও অজ্ঞান দূর করে এই মনুষ্যদেবতার প্রতিষ্ঠা চাই।

তাঁর জৈব (organic) রাষ্ট্রতত্ত্বকে তিনি জাতির ন্যায় পরিবার ও গোষ্ঠীর

ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে দেশ এক আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নয়নের পথে চলেছে—তাকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক তৎপরতা বলে মনে করা ভুল। অবশ্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিনি দেশের মুক্তি আন্দোলনকে বিচার করতেন বলে কার্যত তাকে দার্শনিক কচকচানির মধ্যে আবদ্ধ রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। তাছাড়া সনাতন ঐতিহ্য ও জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক নব্যচিন্তা এক পর্যায়ের নয়। তিনি যথেষ্টই বাস্তবানুগ ছিলেন বলে রাজনীতিকে দাবা খেলার সঙ্গে তুলনা করেন। সেজন্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ধরাবাঁধা পথে নির্ধারিত না করে শাসকদের কলাকৌশল অনুসারে তা নিরূপণ করাই ছিল তাঁর অভিমত।[৩৭]

রাজনীতিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখার পিছনে তাঁর চিন্তা দুটি প্রত্যয়ে বিভক্ত। প্রথমত, ব্যক্তি ও সমাজজীবনের সামগ্রিক দিক থেকে তিনি ধর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন, "It judges economics, politics, arts morals, all—from the standpoint of the whole"। ভারতীয় চিন্তায় ধর্মনিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই; রাজনীতি মানবধর্মেরই অঙ্গ ও মোক্ষলাভের অন্যতম মার্গ। জাতীয়তাবাদের এই আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে তিনি একাধারে জাতীয় আবেগ ও বৈশ্বিক চেতনাকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি নৈতিক মূল্যবোধের উৎকর্ষ সাধন করে; ইংরেজের মহানুভবতার মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজ সত্তা ও শক্তির উন্মেষ সাধনপ্রয়াস অধিকতর কাম্য ও কার্যকর বলে তিনি মনে করতেন।[৩৫]

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি সমসাময়িককালে অরবিন্দ ঘোষের চিন্তায় আরও ব্যাপক ও বিস্তৃতরূপে দেখা যায়। উভয়েই তাঁরা নবশক্তিতে ভারতের ধর্মীয় পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে সে-ধর্ম বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের নয়। হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ যুগ যুগ ধরে ভারতীয় ভাবধারার বিবর্তনে যে-উপাদান সংযুক্ত করেছে তারই সমন্বয়ে বিপিনচন্দ্র তাঁর 'Composite Patriotism'-এর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। তাঁর মতে শিবাজি উৎসবের মতো আকবর উৎসব পালন করা হলে দেশভক্তি আরও দৃঢ় ও পূর্ণাঙ্গ হবে।

মানুষের অধিকারকে বিপিনচন্দ্র প্রকৃতিগত বলে মনে করতেন; মৌল অধিকারগুলি নিয়েই মানুষ জন্মায়; যাবতীয় প্রাকৃতিক অধিকার জগদীশ্বরই দিয়ে থাকেন; ঐসব মৌল অধিকার মানুষের একান্তই নিজস্ব, কেউ অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না; অধিকারবলেই মানুষ সংবিধান রচনা করে; অধিকারের উৎস সংবিধান নয়। তিনি বলেন—

There can be no reform, social economic or political

that can be got from outside. You must gradually acquire your rights.[৩৬]

'স্বদেশী' ও 'বয়কট' শব্দ দুটি সম্পর্কেও তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। সমসাময়িক নেতারা ঐ শব্দ দুটিকে ভিন্নরূপে দেখতেন। মালব্যের দৃষ্টিতে স্বদেশী আন্দোলন ছিল দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ। টিলক মনে করতেন ঐ আন্দোলনের সাহায্যে দেশবাসীর আত্মনির্ভরতা, ত্যাগ ও দৃঢ় সংকল্পসৃষ্টির দ্বারা বিত্তবানদের বিদেশী ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে নিবৃত্ত করা সম্ভব। লাজপৎ রায় দেশীয় মূলধনকে এই প্রচেষ্টার রক্ষা করা যাবে বলে ম করতেন। দাদাভাই নৌরজি জনচিত্তের দর্পণে আর্থিক ও শিক্ষার বিষয়ে পুনর্গঠনের সম্ভাবনা অনুভব করতেন।[৩৭]

বিপিনচন্দ্র সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনকে শুধু অর্থ-নৈতিক কৌশল হিসাবে দেখতেন না। তাতে তিনি গূঢ় রাজনৈতিক তাৎপর্য আরোপ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলীয়ান করার জন্যই জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি পন্থার অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬)-এ তিনি এ-বিষয়ে বলেছিলেন—

It is impossible to work out a divorce between politics and economics, politics and industrial advancement in India. Swadeshism must associate itself with politics; and when Swadeshism associates itself with politics it becomes boycott; and this boycott is a movement of passive resistance.[৩৮]

টিলক ও অরবিন্দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে স্বরাজ ভিক্ষার পথে আসবে না। তাই বিক্ষিপ্ত কিছু কল্যাণমূলক কাজ করে শাসকেরা যাতে সংগ্রামী জনচেতনাকে বিভ্রান্ত ও পরনির্ভর করে না তোলে সেজন্যে তিনি সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষার বিষয়েই কেবল সরকারি কার্যকলাপকে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারি প্রভাব থেকে জনমনকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সর্ব বিষয়েই বেসরকারি প্রচেষ্টার প্রয়োজন দর্শিয়েছিলেন।

'স্বরাজ' শব্দটি সখারাম গণেশ দেউস্কর তাঁর বাংলায় লেখা 'দেশের কথা' (১৯০৪) গ্রন্থে ব্যবহার করেন। শব্দটির ব্যবহার বৃদ্ধি পায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মাধ্যমে। তারপর কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬)-এ সভাপতি দাদাভাই নৌরজি কথাটি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। পরে বিভিন্ন নেতা স্বরাজের বিভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। বিপিনচন্দ্র স্বরাজ বলতে জনগণের স্বরাজ এবং তার তাত্ত্বিক পৃষ্ঠপটস্বরূপ

'দিব্য গণতন্ত্র' আদর্শটিকে উপস্থাপিত করেন। এ-সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের কিছুটা উদ্ধৃত করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

> The ideal of Swaraj that has revealed itself to us is the ideal of Divine Democracy. It is the ideal of democracy higher than the fighting, the pushing, the materialistic, I was going to say, the cruel democracies of Europe and America. This is a higher message still. Men and Gods; and the equality of the Indian Democracy is the equality of the divine nature, the divine possibilities and the divine destiny of every individual being.[৩৯]

সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর স্বরাজের মজবুত ইমারতের জন্যে চাই সংযুক্ত ভারতের নিপুণ গাঁথুনি। তাতে ভারতের জনমন ও চেতনা সুস্থ রাজনৈতিক পথে চালিত হবে। এবং ঐতিহ্যগত আদর্শের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে ভারতের মুক্তির সাধনা দিব্য গণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করবে। শ্রীচৈতন্যকে বিপিনচন্দ্র দিব্য গণতন্ত্রের অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং এ-চিন্তার সন্ধান অদ্বৈত বেদান্তেই পাওয়া যায় বলে মনে করতেন; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও সকল প্রাণীর মধ্যে দিব্য সত্তা আছে বলা হয়েছে এবং তদনুযায়ী সকল প্রাণীই শ্রদ্ধা ও মর্যাদায় সমানাধিকারী। দিব্য গণতন্ত্রের প্রত্যয়ে মানুষমাত্রেই একটি ভোটের অধিকারী; আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় প্রত্যয়টি ভারতীয়দের কাছে খুবই সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী।[৪০]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র মনে করতেন যে গোষ্ঠীর যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বার্থের বলিদান অনুচিত বটে, কিন্তু গোষ্ঠীর প্রয়োজনে ব্যক্তির আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধনের প্রশ্ন অসংগত নয়; গোষ্ঠীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটলে ব্যক্তির বিকাশ স্বতঃই দেখা দেবে। উভয়ের মধ্যে তিনি জৈব সমন্বয়সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্যক্তির মতামত ব্যক্ত করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করতেন।

'Imperial Federation'-এর তত্ত্ব(১৯১১) বিপিনচন্দ্রের অপর একটি নিজস্ব নতুন উদ্ভাবনা। আন্তর্জাতিক সংঘ গঠনের একটি ক্ষুদ্র পরিকল্পনা ছিল সেই তত্ত্বের মূল বিষয়। তাতে তিনি এমন এক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন যার অধীনে ব্রিটেন, ভারত ও অন্যান্য স্বয়ংশাসিত স্বাধীন ডোমিনিয়নগুলি পারস্পরিক উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার জন্যে আবদ্ধ থাকবে। একই সংস্থাধীনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত সকলেই পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করবে। সমসাময়িককালে শ্বেতকায় দেশগুলিকে নিয়ে ঐ-ধরনের সংস্থা গঠনের চেষ্টা হয়েছিল—বিপিনচন্দ্র সেই প্রয়াসকেই ভিন্ন রূপে জাতি ও বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্ত করে এক সমবায়ী

সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর সেদিনের চিন্তা যেন আজকের 'কমনওয়েলথ অব নেশনস'-এ রূপায়িত হয়েছে।

তাঁর সেই রাজনৈতিক ফেডারেশনের সঙ্গে তিনি এক আধ্যাত্মিক ফেডারেশনের স্বপ্নও দেখেছিলেন। হিন্দুধর্মকে তিনি নানা মত ও পথের সমন্বয়-স্বরূপ একটি ফেডারেশনের সমতুল্য জ্ঞান করতেন। বিশ্বজনীন ফেডারেশন গঠনকল্পে বিশ্বের সকল জাতি ও তাদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ভারতীয়দের তিনি আহ্বান জানান। তাঁর মতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব নয়।

তাঁর সাম্রাজ্য ও সাম্রাজ্যবাদের সংজ্ঞাও স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। প্রচলিত ধারণা, বিশেষ করে মার্কস বা লেনিনের চিন্তার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—

> …modern imperialism is not a pure falsehood or an absolute wrong. Its falsehoods are mixed up with its truths and its wrongs with its rights…The greatest fascination of imperialism, to the modern mind, is that it makes for the unification of humanity to an extent and upon a measure that is impossible under any other known form of human organization or association.[৪১]

সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে মানবিক মূল্যবত্তা সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করেছে। সাম্রাজ্যবাদের সমসাময়িক সংকীর্ণ ও অত্যাচারী রূপ সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই অবহিত ছিলেন। তিনি সেই সংকীর্ণতা অতিক্রম করে একটি সার্বজনীন রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান লাভ করা যায় বলে মনে করতেন। লীগ অব নেশনস বা ইউনাইটেড নেশনসের চিন্তা তখন মাতৃজঠরে। সাম্রাজ্যকে তিনি একটা ফেডারেশনের দৃষ্টিতে কল্পনা করেন এবং সেই ফেডারেশনের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতি হবে স্বয়ংশাসিত। তাঁর কথায়—

> The empire idea is essentially larger and broader than the nation idea. It aims at the unification of widely separated territories, of widely divergent interests, of widely different cultures, into one organic whole.[৪২]

তাঁর এই চিন্তার পিছনে একটি বিশ্বজনীন ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সমন্বয়ের কল্পনা ছিল। তিনি যে-সাম্রাজ্যের কল্পনা করেন সেখানে বিশেষ কোনো দেশ বা জাতির আধিপত্য অনুপস্থিত। সেখানে সকলেরই স্থান সমান। তাঁর

বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে এই ধারণায় যে, দুনিয়ার কোনো জাতিই অপর হতে বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। সমাজ থেকেও যেমন বিচ্ছিন্নভাবে থাকতে পারে না, তেমনি সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক প্রয়োজন ও সুবিধার দিক থেকে সমুদয় রাষ্ট্রের সুসংবন্ধ সম্পর্ক থাকা চাই। সমাজের মতো সাম্রাজ্যকেও বিপিনচন্দ্র জৈব (organic) বিচারে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশ্বসমন্বয়কারী সংস্থা তথা মানবজাতির ঐক্যবিধানের চিন্তা তাঁর বৈশ্বিক মানবতন্ত্রী চেতনায় গঠিত হয়েছিল।

বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার ক্রমাগত পরিবর্তন এবং ক্ষেত্রবিশেষে পারম্পর্যের অভাব সুপরিস্ফুট। আর সে-বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর পূর্বেকার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালের 'Imperial Federation' তত্ত্বের কোনো বিরোধ আছে বলে তিনি মানতেন না। তাঁর মতে—প্রথমে জাতির ভিতকে শক্ত করতে হবে, তারপর চাই বৈশ্বিক সমন্বয় ও মিলন।

আর্থনীতিক চিন্তা

অর্থনীতি বিষয়ে বিপিনচন্দ্র কোনো তত্ত্ব উদ্ভাবন বা তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবেশ করেন নি। তাঁর আর্থনীতিক চিন্তা ছিল মূলত বিশ্লেষণমুখী। রানাডে, নৌরজি বা রমেশ দত্তর মতো তিনিও সমকালীন বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পৃষ্ঠপটে ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার বিশদ আলোচনা করেন এবং স্বকীয় দৃষ্টিতে এক নতুন দিকের নিশানা দেখান।

ভারতে ইউরোপের অনুকরণে শিল্পোন্নয়নের তিনি বিরোধী ছিলেন। কারণ প্রথমত তাতে মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। মেশিনের ব্যবহার দুই কারণে দরকার হয়—এক, শ্রমের অপচয় নিবারণ, দুই, দ্রুত উৎপাদন। শ্রমের ক্ষেত্রে মেশিনের বহুল ব্যবহার পরিণামে ভারতের বেকার সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। কৃষির ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত শ্রম শিল্পে নিয়োজিত হবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে[২৭]। ভারতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারার দিক থেকে বিচার করে তিনি বলেন যে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনুকরণে ভারতীয় শ্রমজীবী ও কারিগরেরা তাদের পূর্বতন স্বাধিকার হারাবে। অতীতে ভারতের শ্রমজীবীরা নগর ছাড়া অন্যত্র কোথাও সর্বাংশে শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কুশল কারিগর ও শিল্পশ্রমিকেরা কিছু সময় কৃষিকর্মে অতিবাহিত করে স্বয়ংনির্ভর থাকত। তাদের পুঁজিরও সেজন্যে খুব বেশি প্রয়োজন হত না; অর্থনৈতিক স্বাধিকার সেজন্যে তাদের অক্ষুণ্ণ থাকত।

সমবায়ী ব্যবস্থা থাকার ফলে অর্থনৈতিক শোষণ বলে কিছু ছিল না। একাধারেই তারা ছিল শ্রমিক ও মালিক। দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের পরিমাণ ও গতির প্রশ্ন তখনই কার্যকর হয় যখন পণ্যের বহির্বাজার হস্তগত থাকে। ভারতের না আছে পর্যাপ্ত পুঁজি, না আছে বহির্বাজারে আধিপত্য। পরাধীন অবস্থায় দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শাসকদের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূলে জুড়ে রাখা হবে—এই আশঙ্কায় বিপিনচন্দ্র ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ভারতীয় ধারায় গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে ইউরোপের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক ধারার পক্ষে অনুপযোগী।[৯৪]

তিনি মনে করতেন যে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মনুষ্যত্ব উপেক্ষিত। সাধারণ মানুষ সেখানে অবিরত শোষিত ও নিপীড়িত হয়। অবশ্য ভোটাধিকার প্রবর্তনের ফলে তাদের দুর্গতি কিছুটা প্রশমিত হয়েছে; দেখা দিয়েছে শ্রমিক সংগঠন, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি। সংঘবদ্ধভাবে সেখানকার শ্রমিকেরা মালিকদের কাছে ন্যায্য সুযোগসুবিধা আদায়ের অধিকার পেয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষের দ্বন্দ্বের শেষ যে কোথায় তা অপরিজ্ঞাত; পরিণামে হয়তো একটা সমন্বয় অথবা চরম বিনাশ সংঘটিত হবে। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শিল্পোন্নতির অনুকরণ ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে আদৌ কার্যকর হবে না বলে বিপিনচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে ভারতে এই প্রচেষ্টার পিছনে নবজাত দেশীয় পুঁজিবাদী শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তভাবে সক্রিয়। নীতিগতভাবে তাদের সমর্থন করেন এদেশের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁর মতে এই প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। ভারতের নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষির উপর নির্ভরশীল। সময় বিশেষে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে কৃষির ব্যাঘাত ঘটলে তাদের অধিকাংশ অনাহারে দিন কাটায়। সেজন্যে কৃষিকার্যে নিযুক্ত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিল্পোৎপাদনে নিয়োগ করা প্রয়োজন। শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনকে বিপিনচন্দ্র অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তার রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কেও সুস্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি।

নৌরজি, রমেশ দত্ত, গোখলে প্রমুখ ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের মতো তিনিও মনে করতেন যে ইংরেজ শাসনকালে দেশের ধনসম্পদ দ্রুত বিদেশে পরিবাহিত হয়ে চলেছে। ভারতে বৈদেশিক মূলধন অতি বেশি লগ্নী হওয়ায় এখানকার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশ চরম বিনাশের সম্মুখীন। এদেশে ইংরেজের রাজনৈতিক শাসনের পিছনে যে অর্থনৈতিক শোষণের অভিসন্ধি নিহিত সে-সম্পর্কে তাঁর চেতনা ছিল প্রখর। তিনি মনে করতেন যে রাজনৈতিক শাসনের বিরুদ্ধেই এতকাল যাকিছু আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে, অর্থনৈতিক শোষণের

প্রতি তেমন নজর দেওয়া হয় নি।[৪৫] প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পর ব্রিটেনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন—

১. ক্ষয়িষ্ণু রাজকোষকে দেউলিয়া থেকে রক্ষার জন্যে স্বর্ণের যথোচিত রিজার্ভ ব্যতিরেকেই অবাধে নোট ছাড়া হচ্ছে ;
২. মহাযুদ্ধের দায়দেনা ও রাশিয়া ও অন্যান্য স্থানে সামরিক ক্রিয়া-কলাপের ফলে দৈনিক ৪০ লক্ষ পাউন্ড ব্যয় হচ্ছে ;
৩. রাজস্বের স্বাভাবিক আদায় থেকে ঐ ব্যয়নির্বাহ অসম্ভব ;
৪. ইংরেজ রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদরা এই কারণে একটা উপায় উদ্ভাবন করেছেন যাতে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রের সঙ্গে মুনাফার অংশীদারী শর্তে গঠিত সংস্থার মাধ্যমে উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নে উদ্যোগী হতে পারে ;
৫. ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতির অনুকূলে পূর্বতন অবাধ বাণিজ্য-নীতির বর্জন ;
৬. যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধেরই কাজকারবারে কিছু সংখ্যক পুঁজিপতি বিরাট অঙ্কের মুনাফা লুটেছে ;
৭. যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের শিল্পবাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে ;
৮. ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ; তারা শুধু মুনাফারই অংশ চায় না, কলকারখানার পরিচালনাতেও তারা অংশ গ্রহণ করতে চায় ;
৯. ব্রিটেনের ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার পক্ষে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানকার শ্রমিক আন্দোলন।[২৬]

বিপিনচন্দ্র দেখিয়েছেন যে অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্যে ব্রিটেন তার ডোমিনিয়ন ও উপনিবেশগুলির কাঁচা মাল ও সস্তার মজুরির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। এই নতুন অর্থনৈতিক অভিসন্ধিকে নির্বাধে কার্যকর করার জন্যে ভারতে মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৭-১৯) প্রস্তাব উঠেছে। কি ভারত সরকার, কি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উভয়েরই টিকি ইংরেজ পুঁজিপতিদের কাছে বাঁধা। এমতাবস্থায় বিপিনচন্দ্র শত্রুর শত্রু অর্থাৎ ব্রিটিশ শ্রমিক দলের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্কস্থাপনের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাঁর মতে শ্রমিক দল একদিকে নিজ দেশের পুঁজিবাদী মনোভাব সম্পর্কে সচেতন, অন্যদিকে নিপীড়িত ভারতীয়দের প্রতিও সহানুভূতিশীল ; তাই ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীদের বিলাতের শ্রমিক দলের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।[৪৭]

তিনি সেইসঙ্গে একথাও বলেন যে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না, যদি তারা দেখে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ

দেশের পুঁজিবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে নীরব রয়েছে। তাই তিনি ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে সুসংগঠিত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ভারতীয় শ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক আট ঘণ্টা এবং ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের সমতুল্য মজুরির জন্যে আন্দোলন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্যে তিনি আইনানুগ ব্যবস্থারও দাবি করেন। এর ফলে ভারতের সস্তার মজুরির প্রতি ইংরেজের আর আকর্ষণ থাকবে না। বিপিনচন্দ্র এই দৃষ্টিতে ব্রিটেন ও ভারত তথা সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রস্তাব তোলেন।[৭৮]

সস্তার মজুরির পর সস্তার কাঁচা মালের প্রশ্ন। সেদিকে ইংরেজদের প্রলুব্ধ দৃষ্টিকে প্রত্যাহত করার জন্যে তিনি ভারতে লগ্নী মূলধন থেকে প্রাপ্ত মুনাফার সর্বোচ্চ হার বেঁধে দিতে চান। উদ্বৃত্ত মুনাফা রাজকোষে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করলে দেশোন্নয়নে অর্থের ঘাটতি হবে না। তিনি মনে করতেন যে ভারতীয় শ্রমিকদের ইংরেজ শ্রমিকদের সমতুল্য বেতন ও পদমর্যাদা দিলে প্রকারান্তরে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের বিশেষ করে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলির সম্পর্ক উন্নত হবে। ভারতীয় শ্রমিকদের ঐসব দেশে জীবিকার সন্ধানে বসবাস বে-আইনি করার কথা আর উঠবে না। ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি কম বলে ঐসব দেশের পুঁজিপতিরা দেশীয় শ্রমিকের পরিবর্তে ভারতীয় শ্রমিক নিয়োগ করে। ফলে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর মনে ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ভাব দেখা যায়।[৭৯]

শিক্ষা চিন্তা

জীবিকাসূত্রে বিপিনচন্দ্র প্রথমজীবনে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি সাংবাদিক হন। মাঝে কিছুকাল তাঁকে গ্রন্থাগারিকের পদে দেখা যায়। তাঁর লেখা ও বক্তৃতায় শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তার পরিচয় যা পাওয়া যায় তা প্রধানত সমালোচনামূলক। এ-বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনার গভীরে তিনি বিশেষ প্রবেশ করেন নি। জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের অন্যতম সংগঠকরূপে প্রচারকালে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি থেকে তাঁর শিক্ষাদর্শের একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়।

ভারতের সনাতন আদর্শানুসারে তিনি শিক্ষার তত্ত্বগত ভিত্তিস্বরূপ মানুষের জীবনসম্পৃক্ত পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশের প্রয়োজনীয়তা দর্শিয়েছেন। বিষয় পাঁচটি হল: ১. দেহ, ২. অন্তর, ৩. অনুভূতি, ৪. বৈষয়িক কর্ম ও ৫. দিব্য প্রেরণা।[৮০]

মানুষের এই পাঁচটি বিষয়ের চাই সমন্বয়, একটির দ্বারা অন্য কোনোটির অবদমন নয়। এগুলির ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের নিম্নবৃত্তিগুলি উচ্চবৃত্তির

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আত্মিক সত্তার নিরঙ্কুশ মুক্তি ও আধিপত্য দেখা দেয়। উপরোক্ত বিষয় পাঁচটি স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং নিয়মাধীন—যেমন দেহ ও অন্তর শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্বের (psychophysics) অধীন। বিষয় পাঁচটির সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে।[৫১]

মননশীলতা, নৈতিকতা, সৃজনশীলতা ও আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিতে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। জীবন ও জীবিকার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকা চাই। দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় মুখস্থ বিদ্যারই প্রাধান্য বেশি, বোধ ও বুদ্ধিগত বিকাশের সুযোগ অনুপস্থিত। জাতীয় ভাবধারার সঙ্গেও তার আদৌ সংযোগ নেই। মাটির সঙ্গে যোগসূত্রহীন টবে ঝোলানো অর্কিডের মতো এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে; দেশীয় ধারা ও বিষয়ের পরিবর্তে বিদেশী বিষয়েই ঐ ব্যবস্থা নিবদ্ধ। এর কারণ এদেশের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে ইংরেজের উদ্যোগে।[৫২]

ইংরেজ নিজের শাসন ও শোষণের তাগিদেই এদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপায়িত করেছে। তারা শিখিয়েছে "ঘটত্ব ও পটত্ব"—যাতে দেশবাসীর "দাসত্ব" অটুট থাকে। তাই দেশের লোকের চিত্ত "ঘটাকাশ ও পটাকাশেই" আবদ্ধ—ফলে রাজনৈতিক আকাশ কোলাহল থেকে মুক্ত। আধুনিক শিক্ষার আলোক ভারতবাসীরা পাক্ সেটা শাসকদের অভিপ্রায় নয়। কারণ ইউরোপীয় চিন্তা ও জ্ঞানের পরিপূর্ণ আস্বাদ পেলে এখানকার সাধারণ মানুষ পাশ্চাত্ত্যের গণতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা দাবি করবে। শিক্ষাব্যবস্থা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ—যাতে শাসকদের কায়েমি স্বার্থ তারা অক্ষুণ্ণ রাখে। সেই দৃষ্টিতেই ঐ শ্রেণীকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পশ্চিমী ভাবধারায় এবং শাসকদের স্বার্থানুকূলে ঐ শ্রেণীকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা সাধারণ মানুষ ও আমলাতন্ত্রের মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করতে পারে। জনসাধারণের আনুগত্য তারা একদিকে অর্জন করে, অপরদিকে বিদেশী শাসকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তুষ্টিবিধানের মাধ্যমে নিজেদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের সঙ্গে নানা সম্মান ও খেতাবে ভূষিত হয়। ভারত সরকারের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাই এই নীতি অনুসারে পরিকল্পিত ও রূপায়িত।[৫৩]

বিপিনচন্দ্র চাইতেন দেশের ঐতিহ্য, আবেগ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেশেরই প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন। ব্যক্তিমানুষের ক্ষেত্রে যেমন স্বতন্ত্র আচারবিচার, ইচ্ছা, অভিরুচি, কল্পনা ও নানাবিধ প্রবণতা থাকে, তেমনি সংশ্লিষ্ট দেশের জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতাত্ত্বিক গঠন, মানসিক প্রকৃতি ইত্যাদি অতি স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন জাতির মধ্যে তারতম্য থাকে। তাছাড়াও এক জাতি থেকে অপর জাতির সামাজিক,

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গঠন পৃথক হতে পারে। সেজন্যে প্রতি জাতিরই নিজ নিজ ক্ষেত্রে জাতীয় আবেগ, ঐতিহ্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫৪]

বিপিনচন্দ্র মানসিক শিক্ষার সঙ্গেই বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রথমটি ব্যতিরেকে মানুষের সুকুমার বৃত্তি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়বে এবং দ্বিতীয়টির অবহেলায় ব্যক্তি ও জাতির বৈষয়িক অগ্রগতি নিশ্চল হয়ে পড়বে। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের পাঠ্যক্রমের বিবরণ-দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পর্ষদে বয়স ও মানসিক গঠন অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদনে যুক্ত করার নীতি গৃহীত হয়; ক্রমে ভাষা, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের পর একদলকে গবেষণা, অধ্যাপনা ইত্যাদিতে চালিত করা হয় এবং অপর দলকে উৎপাদনের প্রয়োজনে লব্ধ জ্ঞানের প্রযুক্তিকরণে উৎসাহিত করা হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করতেন।

সুরেন্দ্রনাথের মতো বিপিনচন্দ্রেরও এই অভিমত ছিল যে ছাত্রদের রাজনীতি চর্চা অনুচিত নয়। বৈশ্বিক মানবতার সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে শিক্ষায় দেশপ্রেম সঞ্চার করাও একান্ত প্রয়োজন।[৫৫]

উপসংহার

রামমোহনের সময় থেকে বাঙালির মননজীবনে যে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল তাতে হয়তো এখনকার রাজনৈতিক দৃষ্টিতে জাতীয়তাবোধ ছিল না, কিন্তু স্বীয় সমাজমুখী ও ঐহিক জীবনবোধ দেখা দেয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই জাতীয় চেতনার ভূমি উর্বর হতে শুরু করেছিল। দেশ গঠনের তাগিদে প্রাচীন মূল্যবত্তার পুনরুদ্ধার, নতুন সমাজবোধের উন্মেষ এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির নবরূপায়ণের প্রয়োজনে দেশের উজ্জ্বল ঐতিহ্যের প্রতি সন্ধানী দৃষ্টি পড়েছিল। বিপিনচন্দ্রের কথায়—

> আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে জাগিয়া উঠে, তাহারই উপরে সর্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।[৫৬]

স্বদেশাভিমান, স্বাদেশিকতা বা জাতীয় মনোভাব প্রথম দিকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা থেকেই দেখা দিতে শুরু করে। দেশের এই সামাজিক বিবর্তনধারায় বিপিনচন্দ্রের মন গড়ে ওঠে।

রাজনারায়ণ বসুর স্বাদেশিকতার আদর্শ ও নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা তাঁর দেশভক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বাদেশিকতা মিশ্রিত ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ ও সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত হন। যৌবনে 'তত্ত্ববোধিনী' গোষ্ঠীর আদর্শ অপেক্ষা 'বঙ্গদর্শন' লেখকগোষ্ঠী তাঁর স্বদেশচেতনাকে অধিক অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দার্শনিক চিন্তায় তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

'বঙ্গদর্শন'-এর দেশপ্রেমিকতার আদর্শে সংকীর্ণতা ও জাতিবিদ্বেষ ছিল না এবং তাতে জাতির পূর্ণাঙ্গ জাগরণের নির্দেশ তিনি অনুভব করেন। সমাজ, সাহিত্য ও ধর্মের মানবতন্ত্রী নববোধ ক্রমে জাতীয় চেতনার দিকে অগ্রসর হয়—ব্রাহ্মধর্ম ও সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধ ক্রমে ম্লান হয়ে যায় সেই নবচেতনায়—তার পিছনে অর্থনৈতিক কারণই ছিল প্রধান; সেই সঙ্গে দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমোদয়, নবপ্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের ধীরগতিতে সাবালকত্ব অর্জন, শাসকদের উত্তরোত্তর দমননীতি জাতীয় অভিমান ও চেতনায় গতি সঞ্চার করে। আত্মশক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে যাঁরা এগিয়ে আসেন বিপিনচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিপিনচন্দ্রের মুক্তবুদ্ধি ও উদার মননশীলতার মস্ত পরিচয় হল যে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম হয়েও সনাতন হিন্দু আদর্শ ও বৈষ্ণবধর্মের তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শে অবতারবাদ ও কৃষ্ণচরিত্রের তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যুগের উপযোগিতা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে। ব্রাহ্মদের নীতিচ্যুতি ও সনাতনপন্থী হিন্দুদের আপসবিহীন রক্ষণশীলতা থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ভিন্ন পথে পদক্ষেপ করেন।

রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে বিপিনচন্দ্র ছিলেন চরমপন্থী দলের শীর্ষস্থানীয়। ঐ দলের অন্যতম নেতা টিলকের উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনার পশ্চাতে ছিল সনাতন হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ চিন্তা। বিপিনচন্দ্র টিলকের আদর্শকে আধুনিক আবরণ দিতে গিয়ে তার ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গৌণ পর্যায়ে নিয়ে যান; সমসাময়িক যুগের দাবিই হয়তো তাঁকে প্রভাবিত করেছিল—সে দাবি অতীতের দিকে তাকিয়ে পারত্রিক সুখ চায়নি—চেয়েছিল ঐহিক জীবনের উন্নতি। বিপিনচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন শক্তিশালী বিদেশী শাসকদের নির্মূল করতে হলে চাই যুগোপযোগী আদর্শ ও কর্মপন্থা। তাঁর পথ অনুসরণ করে টিলকও ধর্মরক্ষা ও গোরক্ষার পরিবর্তে স্বদেশী ও বয়কটের নীতি গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্র ধর্মীয় আবেগমিশ্রিত উগ্র জাতীয়তাবাদকে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রমে পরিণত করেন। তাই সুরাটে কংগ্রেসের ভাঙনের পর

১৯০৭ সালে তাঁকে চরমপন্থীদের কাছে একটি গঠনমূলক কর্মপন্থা উপস্থাপিত করতে দেখা যায়।[৫৭]

বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের আমেজ বেশি দিন থাকে নি। তার মন্ত্রস্পর্শে দেশবাসীর জীবনে সঞ্চারিত প্রাণের আবেগ ক্রমে শ্রেণী-বিশেষেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে—মননক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেই আবেগ শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সৃজনীশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এর বিস্তৃত কারণ অন্যত্র আলোচিত হয়েছে। মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) ও মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯) মাঝামাঝি কাল একপ্রকার নিস্তেজ পরিবেশের সাক্ষ্যই বহন করে। বিপ্লবীরা কেবল সে সময়ে তলে তলে প্রস্তুতিকার্য চালিয়ে যান। তৃতীয় দশকে গান্ধীর নেতৃত্বে আবার এক অভাবনীয় জাগরণ দেখা দেয়। তখন আন্দোলনের উন্মাদনা যতই ঘটে থাকুক না কেন বাংলার জনচিত্তে স্বদেশী যুগে যে প্রাণের সংযোগ ঘটেছিল অসহযোগ পর্বে তা তেমন পারে নি;[৫৮] বিশেষ করে মুষ্টিমেয় যাঁরা গান্ধী আন্দোলনকে বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছিলেন তাঁদের মনে অসহযোগ আদর্শ কোনো দাগ কাটতে পারে নি। নব অংকুরিত জনচেতনাকে বিদ্যালয়, আদালত, আইন পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানসিক পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁরা চান নি। সেজন্যে নিন্দা ও অপবাদের সঙ্গে সে-সময়ে যে-কজনকে একঘরে করা হয় বিপিনচন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন।

বিপিনচন্দ্র ছিলেন "লজিকে"র পক্ষপাতী', তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীর "ম্যাজিক" বুঝতে পারেন নি। গান্ধীবাদী আন্দোলনের উন্মাদনায় তিনি বুদ্ধিজীবনের অস্বীকৃতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ; তেমনি নির্বিচার গুরুবাদ বা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অন্ধ অনুসরণও তিনি লক্ষ করেছিলেন। ব্যক্তিপূজার বিরোধী বুদ্ধিবাদী বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের সংঘর্ষ ঘটা সেদিন তাই খুবই স্বাভাবিক ছিল। বিপিনচন্দ্র ইংরেজের সঙ্গে স্বেচ্ছায় ও সমসূত্রে গাঁথা এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এই ভেবে যে, বিচ্ছিন্ন স্বাধীনতায় জনমন সংকীর্ণ গলিপথে আবদ্ধ হয়ে পড়বে।[৫৯]

বিপিনচন্দ্রের বহু কিছু দূরদৃষ্টির অন্যতম হল গান্ধীর খিলাফৎ আন্দোলনের পরিণামদর্শিতা। ইসলাম ধর্মের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে মুসলমানদের অন্ধ আধ্যাত্মিক ঐক্যের জিগিরের সঙ্গে রাজনৈতিক একতার কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই দেখা যায় যে তুরস্কের নবজাগরণের ফলে খিলাফৎ প্রশ্ন ধুয়েমুছে গেলেও ভারতে সেই আন্দোলনের জের হিসাবে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ক্রমে ভারতীয় জাতীয়তা ও একতার প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়।[৬০]

উগ্র জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিত্রতা সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র যে হীন সাম্প্রদায়িক ভাবনার ঊর্ধ্বে ছিলেন সেকথা তাঁর "Composite Patriotism"-এর তত্ত্বই প্রমাণ করে। তিনি বুঝেছিলেন যে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খ্রীস্টান প্রভৃতি বহু জাতি ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের যুগযুগান্তরের অবদানে ভারতীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্য পরিপুষ্ট। সুতরাং সকলের সমবায়ে ভারতবর্ষীয় এক মহাজাতির ঐকতান সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করে সকলের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও সাধনার সমন্বয় প্রয়াস এবং সর্বভারতীয় সংস্কৃতির যে-ফেডারেশন স্থাপনের কথা তিনি ভেবেছিলেন তা আজকের পৃথিবীতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ব্যর্থতা প্রকট হওয়ার পর নতুন করে উপযুক্ত বিবেচনার দাবি রাখে। ডেমোক্রেটিক স্বরাজ প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে প্রচলিত গণতন্ত্রে মানুষের উদ্যমশক্তি (initiative) সীমাবদ্ধ; প্রয়োজনবোধে নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অপসারণ (recall) করার অধিকারও অনুপস্থিত। তাই তিনি গণতান্ত্রিক তৃণমূল-ভিত্তিক পিরামিডাকারে বিন্যস্ত শাসন-কাঠামোর সাহায্যে মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ ও সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপনের কথা ভেবেছিলেন।[৬১] তাঁর ইম্পিরিয়াল ফেডারেশন প্রস্তাবটিকে হয়তো সেইসময়ে (১৯১০-১১) গালভরা তত্ত্বকথা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সেটি যে কত সময়োপযোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা পরবর্তীকালে জাপানের আগ্রাসী নীতি, চীনের অভ্যুত্থান, ঐসলামিক দেশগুলির জোটবন্ধনের প্রয়াস ইত্যাদি প্রমাণ করে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের পরিবর্তে সংযুক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর (Federal Self Rule) প্রয়োজন 'লীগ অফ নেশনস' প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতির সমানাধিকার-ভিত্তিক সমন্বয়ের বনিয়াদরূপে তিনি আধ্যাত্মিক মানবতন্ত্রী চিন্তাকে রেখেছিলেন। মানব সভ্যতার বিবর্তনেও তিনি ঐ একই সুরের সন্ধান করেন। জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সবকিছুর মূলে তিনি নারায়ণস্বরূপ মানবতাকে উপলব্ধি করেন।

চরমপন্থী থেকে তিনি ক্রমে নরমপন্থী হয়ে পড়লেন। তাই মানবেন্দ্রনাথ সখেদে বলেন—

> Quarter of a century ago Pal was the leader of the radical left wing of the nationalist movement. At that time he occupied in the country a place analegous to that recently occupied by Gandhi···Pal can be called the father of Indian Jacobinism, though it is long since he has betrayed his child.[৬২]

বিপিনচন্দ্র সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হবার প্রধান কারণ তাঁর পরিণত

জীবনে সংগ্রামবিমুখ মনোভাব। নিজের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তিনি স্পষ্টই বলেন—

বিদ্রোহের দ্বারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজদের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইলেও এ পথে কিছুতেই সত্য গণতন্ত্র স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সে জন্য আবার একদিন ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগকে নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি করিতেই হইবে। এই কারণে আমি সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধী।[৬৩]

সেদিনের কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে বিপিনচন্দ্রের উল্লিখিত উক্তি গ্রহণযোগ্য না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তবে পরিণত জীবনে তিনি বিপিনচন্দ্রের চিন্তাকে প্রকারান্তরে প্রতিধ্বনিত করেন।

দেশবাসীর অপরিণত রাজনৈতিক চেতনা, উচ্ছ্বাস ও আবেগসর্বস্ব আন্দোলনের নিষ্ফলতা প্রভৃতি মিলিয়ে বিপিনচন্দ্র যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেদিক থেকে তাঁর শেষজীবনের সেই মনের গতি ছিল খুবই স্বাভাবিক। তাঁর চরিত্রে একদিকে যেমন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় তেমনি বিরোধী পক্ষের চিন্তাভাবনা ও অবদানের প্রতিও যথোচিত স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধার ভাব লক্ষ করা যায়। এর একটি নজির হল কংগ্রেসের গোড়ার যুগে "ধীরে চল" নীতির তীব্র সমালোচনা করলেও তিনি পূর্বসূরীদের কর্মতৎপরতায় দেশের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি। 'নবযুগের বাংলা' ও 'চরিত চিত্র' গ্রন্থ দুটিতে তাঁর এই বাস্তবানুগ সমাজবোধের পরিচয় ও ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা লক্ষণীয়। আজকালকার রাজনীতিতে এ-ধরনের চরিত্র সত্যই বিরল।

বিপিনচন্দ্রের জীবন ও মননের একটি স্ববিরোধ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার। চিন্তা ও ব্যবহারিক দিক থেকে তিনি যথেষ্টই যুক্তিবাদী ছিলেন। কিন্তু প্রেরণার সন্ধান তাঁর সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ ছিল। নিজেই লিখেছেন—

উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন।[৬৪]

তাঁর এই উপলব্ধি অতীন্দ্রিয় (mystic) অনুভূতি ছাড়া আর কিছু নয়। তবে তিনি তাঁর অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে অন্যান্য অনেক নেতার মতো সমাজ-সাধনায় টেনে আনেন নি। আধ্যাত্মিক ভাবনাকে ব্যবহারিক ও যুক্তিগত দিক থেকে স্থাপনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। মানুষের কল্যাণই ছিল তাঁর আদর্শ—এবং সেজন্যে বাস্তববোধের যে প্রাধান্য থাকা দরকার সে-বিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল না।

তবে তাঁর মননজীবনে নিষ্ঠা, ব্যক্তিপূজা ও অন্ধ আনুগত্যকে স্বীকার না

করা এবং তথ্যনির্ভর চিন্তাকে আশ্রয় করে নির্ভীক মনোভাব ব্যক্ত করার সৎ সাহস প্রতিকূল প্রভাব ও পরিবেশকে বহুলাংশেই কাটিয়ে চলত। ভারতীয় রাজনীতির বৈশিষ্ট্য অন্ধ আবেগ ও উচ্ছ্বাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে না পারায় বিপিনচন্দ্রকে শেষজীবনে কোণঠাসা হতে হয়। তা বলে তিনি কর্মজীবনে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন নি কিংবা সুখের তাগিদে নিজের চিন্তা ও সত্তাকে বিকিয়ে দেন নি। সেজন্যে তিনি অন্তিমজীবনে অশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেশের অনভিপ্রেত গতিকে তুলে ধরার অপরাধে তাঁর উপর কুৎসা বর্ষিত হয়; ভারতীয় রাজনীতির রীতি অনুযায়ী তাঁর কণ্ঠরোধেরও নানা ব্যবস্থা হয়।

উৎস নির্দেশ

১. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* Geneve, 1926. p.195.

২. The Earl of Ronaldshay. *The Heart of Aryavarta. 1928.* p. 89.

৩. 'বিনয়কুমার সরকারের বৈঠকে'। ১ম ভাগ। ১৯৪৪। পৃ. ৩৩১।

৪. বিপিনচন্দ্র পাল। 'সত্তর বৎসর: আত্মজীবনী'। ১৩৩২ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২২৪।

৫. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj : the rise of new patriotism.* 1954. p.124.

৬. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee. *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj*. 1958. p. 12.

৭. *Ibid.* Appendix III.

৮. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ'। ১৯৫৬। পৃ. ৫৭৩।

৯. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj*. p. 217.

১০. H. Mukherjee & U. Mukherjee. *op. cit.* p. 106.

১১. *Ibid.* p. 107.

১২. *Ibid.* p. III.

১৩. *Ibid.* p. 113.

১৪. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। ১৯৬৪। পৃ. ১২৬।

১৫. Bipin Chandra Pal. *Bengal Vaishnavism*. 1962. p. 2.
১৬. *Ibid*. p. 4.
১৭. *Ibid.*
১৮. *Ibid*. p. 7.
১৯. *Ibid*. p. 8.
২০. বিপিনচন্দ্র পাল। 'নবযুগের বাংলা'। ১৯৬৪। পৃ. ১৭।
২১. তদেব। পৃ. ১৮।
২২. তদেব। পৃ. ২৮৯-২৯২।
২৩. Bipin Chandra Pal. *Writings and Speeches*. V. 1. 1958. p. 61.
২৪. P. D. Saggi. *Life and Work of Lal, Bal and Pal.* (Collection of speeches and writings) 1962. p. 280.
২৫. Bipin Chandra Pal. *Soul of India*. 1911. p. vii.
২৬. *Life and Utterances of B. C. Pal*. pp. 27-28.
২৭. বিপিনচন্দ্র পাল। 'রাষ্ট্রনীতি'। ১৩৬৩। পৃ. ১।
২৮. তদেব। পৃ. ২-১২।
২৯. তদেব। পৃ. ৬০-৬১।
৩০. তদেব। পৃ. ৬৪-৭২।
৩১. তদেব। পৃ. ১৬।
৩২. Quoted in : Varma. *Modern Indian Political Thought*. p. 366.
৩৩. বিপিনচন্দ্র পাল। 'রাষ্ট্রনীতি'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২০।
৩৪. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj*. p. 206.
৩৫. Bipin Chandra Pal. *Spirit of Indian Nationalism.* 1910. p. 4.
৩৬. *Life and Utterances of B. C. Pal*. pp. 27-28.
৩৭. B. Pattabhi Sitaramyya. *History of the Indian National Congress* (1885-1935). 1935. p. 84.
৩৮ Quoted in : Varma. *Modern Indian Political Thought.* p. 368.
৩৯. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj*. p. 201.
৪০. Bipin Chandra Pal. *Memories of My Life and Times.* 1935, V. 1, pp. 355-357.

৪১. Bipin Chandra Pal. "Nationalism and Imperialism," in P. D. Saggi. *Life and Work of Lal, Bal and Pal.* 1962. p. 285.

৪২. *Ibid.*

৪৩. Bipin Chandra Pal. *The New Economic Menace to India.* 1920. p. 210.

৪৪. *Ibid.* p. 216

৪৫. *Ibid.* p. 1

৪৬. *Ibid.* pp. 217-219.

৪৭. *Ibid.* pp. 226-227.

৪৮. *Ibid.* pp. 232-235.

৪৯. *Ibid.* pp. 238-240.

৫০. Bipin Chandra Pal. *Soul of India.* p. 201.

৫১. *Ibid.* p. 202.

৫২. Bipin Chandra Pal. *Swadeshi and Swaraj.* p. 256.

৫৩. *Ibid.* pp. 259-262.

৫৪. *Ibid.* p. 253.

৫৫. *Ibid.* p. 271.

৫৬. বিপিনচন্দ্র পাল। 'চরিত-চিত্র'। ১৯৬৮। পৃ. ১২৪।

৫৭. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* p. 197.

৫৮. নির্মলকুমার বসু। "বিপিনচন্দ্র পাল", 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'। কার্তিক-পৌষ, ১৮৮০ শক। পৃ. ১৬৯।

৫৯. তদেব। পৃ. ১৭১।

৬০. তদেব।

৬১. Bipin Chandra Pal. "My Conception of Swaraj," in : P. D. Saggi. *Life and work of Lal, Bal* and Pal. p. 305.

৬২. M. N. Roy. "The Bourgeoisie and National Revolution in India", *International Press Correspondence.* v. 9, n.9. 22 February, 1929. pp. 149-152.

৬৩. বিপিনচন্দ্র পাল। 'আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ।' ১৯২২। পৃ. ৭।

৬৪. বিপিনচন্দ্র পাল। 'জেলের খাতা'। ১৯৫০। পৃ. ৬২।

চিত্তরঞ্জন দাশ ॥ ১৮৭০—১৯২৫

প্রাক-স্বদেশী-যুগের কংগ্রেসী রাজনীতির যে-চরিত্র ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে সংক্ষেপে তা হল রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন নিয়মতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি। বস্তুত স্বদেশী যুগ থেকেই ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনটি ধারা প্রবাহিত হয়। একদিকে উক্ত নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী ধারা, অপরদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানকামী অতি-বামপন্থী ধারা; এবং ঐদুটি থেকে স্বতন্ত্র একটি মধ্যপন্থী ধারা দেখা দেয় যার মধ্যে প্রথমোক্ত ধারার তোষণনীতি যেমন স্থান পায় নি, তেমনি দ্বিতীয় ধারার সশস্ত্র পন্থাও গৃহীত হয় নি। এই মধ্যপন্থীদের অন্যতম শিরোমণি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ।

রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জনের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব একদিকে যেমন বিলম্বিত অপরদিকে তাঁর তিরোধানও তেমনি আকস্মিক ও অসময়োচিত। কাব্য ও সাহিত্য-চর্চার মধ্যে দিয়ে তিনি ক্রমে রাজনৈতিক চিন্তাভাবনায় উপনীত হন—একই আবেগ ও প্রেরণায়—তা হল বাংলার বৈষ্ণব স্বভাবধর্মের পুনরুন্মেষ, তথা স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও মহিমায় বাঙালির প্রতিষ্ঠা সাধন। আদিত্যহৃদয় চিত্তরঞ্জনের সরল সংবেদনশীল মন পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত। পিতা ভুবনমোহনের অতুলনীয় ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ সেবা দধীচি পুত্র চিত্তরঞ্জনের চরিত্রে চরমোৎকর্ষ লাভ করে।

পরিণত বয়সে যে-মানুষ চিন্তা ও কাজে অনন্য প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দেন, ছাত্রজীবনে তিনি তার বিশেষ স্বাক্ষর রাখেন নি। একাধিক প্রচেষ্টায় এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; বি. এ. পরীক্ষাতেও অনার্স লাভে ব্যর্থ হন; আসলে পরীক্ষাগত পড়াশুনায় তাঁর আদৌ রুচি ছিল না। আই. সি. এস. পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে তিনি সহাস্যে বলেছিলেন, "I came out first in the unsuccessful list"।[১] পরীক্ষার ব্যাপারে তাঁর সময় ও মেজাজ ছিল না। বিলাতে ছাত্রাবস্থায় পড়াশুনায় কামাই দিয়ে তিনি দাদাভাই নৌরজির পার্লামেন্টারি নির্বাচনে সহায়তা করেন; প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে সেটাই হয় তাঁর হাতেখড়ি। তার আগে কলকাতার ছাত্রজীবনে তিনি আনন্দমোহন ও সুরেন্দ্রনাথের 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'-এ রাজনীতির আস্বাদ পেয়েছিলেন। উত্তরকালে তাঁর মনে আইরিশ জননেতা চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল (১৮৪৬-৯১)-এর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির প্রভাব দেখা যায়। ব্যারিস্টারি পাশ করে ১৮৯৩ সালে তিনি কলকাতায় আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। আইনে পসার জমাতে না পারায় সাহিত্যকর্মে তাঁর সময় অতিবাহিত হত। 'মালঞ্চ', 'মালা', 'সাগর সঙ্গীত' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর এই সময়ের রচনা। বস্তুত রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন কবি ও সাহিত্যিক চিত্তরঞ্জনের খ্যাতির অন্তরায় হয়ে

দাঁড়ান। 'নারায়ণ' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বহু কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেন। তাঁর কাব্যের প্রকৃতি ছিল বৈষ্ণবধর্মী। তিনি কয়েকটি বৈষ্ণব সংগীতও রচনা করেছিলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল চিত্তরঞ্জন ছিলেন তাঁদের অন্যতম। পাটনায় প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে (১৯১৫) তিনি সভাপতিত্ব করেন।

চিত্তরঞ্জনের জন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে। বৈষ্ণবধর্মী কাব্যচর্চা সূত্রে তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মদের মনোমালিন্য দেখা দেয়। 'মালঞ্চ' কাব্যগ্রন্থে তাঁর কিছুটা নাস্তিকতা ও ভোগবাদী মনোভাব ফুটে ওঠে। ব্রাহ্মদের বহু আচারবিচারই তিনি মানতেন না। গোঁড়া ব্রাহ্মরা তাঁর সংস্রব ত্যাগ করেন। শেষে তিনি সমাজ থেকে নিজের নাম কাটিয়ে নেন। ব্রাহ্মবিরোধী মনোভাবের পিছনে ছিল অরবিন্দের প্রভাব। পরবর্তীকালের চিন্তায় তাঁর শাক্ত, বৈদান্তিক ও বৈষ্ণব ভাবের ত্রিধারা মিলিত হয় বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্রে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম ও সাধনাই প্রাধান্য লাভ করে। বৈষ্ণব সাহিত্যে তিনি নিজের জীবনাদর্শের সন্ধান করেন—যে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একদিন মহাপ্রভু মায়াময় সংসার ছেড়ে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেছিলেন। জীবের দুঃখে কাতর মহাপ্রভুর অনুভূতি চিত্তরঞ্জনের মনে যে আবেগ সঞ্চার করে তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর চিন্তা ও সাধনায়। তাঁর মানসিক গঠনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে তিনি পাবনায় অনুকূল ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

কার্জনের বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) পূর্বতন ভারতীয় রাজনীতির পটভূমি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম দৃশ্যের উন্মোচন ঘটে ১৮৫৮ সালে কোম্পানির ভারত শাসনের অবসানে। ইংরেজের আধিপত্য ও আক্রামক নীতির ফলে নীরবে ও পরোক্ষে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাথমিক পর্ব সমাধা হয়; ভারতীয় সামন্ততন্ত্র শক্তিহীন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার ও শাসন সংস্কার প্রচেষ্টা; সুপ্ত জনশক্তির ক্রমজাগরণ শুরু হয়—জাতীয়তাবাদী চেতনাও ক্রমে দানা বাঁধতে শুরু করে—প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় কংগ্রেস। তৃতীয় দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করেন লর্ড কার্জন। দেশবাসীর মনে বিদেশী শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্তির আবেগ ও উদ্দীপনা অভিব্যক্তি লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলনে অভিযুক্ত রাজনৈতিক কর্মীদের সমর্থনে মামলা এবং বিশেষ করে অরবিন্দের বিরুদ্ধে আলিপুর বোমার মামলা পরিচালনার সাফল্য চিত্তরঞ্জনের আইন ব্যবসায়ের পথ সুগম করে দেয়। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগও তাঁর এইসময় থেকে আবার শুরু হয়। ইতিপূর্বে অনুশীলন

সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল (১৯০২) থেকে তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি হিসাবে সমিতির সঙ্গে বছর পাঁচেক যুক্ত ছিলেন। পরে তার সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন একজন সাধারণ প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। তারপর প্রায় বার বছর তাঁকে প্রকাশ্য রাজনীতিতে অনুপস্থিত দেখা যায়। এই অনুপস্থিতি বিশেষ অর্থবহ ছিল। সমকালীন দুটি প্রধান দল ও নেতাদের সঙ্গে তাঁর পুরোপুরি মনের মিল ছিল না। নরমপন্থীদের আধিপত্যে কংগ্রেসী রাজনীতি ছিল নিয়মতান্ত্রিক সংগীত ও রক্ষণশীল সুরে বাঁধা। স্বদেশী যুগের বয়কট নীতি কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো যায় নি। চরমপন্থী নেতা ও কর্মীদের সংখ্যা ও শক্তি ছিল নগণ্য। পরের বছর সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরমপন্থীদের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচারে চরমপন্থীরা হটে আসেন। সেইসময়ে দেশব্যাপী রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের ফলে সরকারি দমননীতি প্রবল হয়ে ওঠে। চরমপন্থীদের কেউ গেলেন কারাগারে, কেউ নির্বাসনে, আবার কেউ-বা মঠমন্দিরে। চিত্তরঞ্জন 'মডারেট কনভেনসন' বা 'মেটা মজলিশ'-এ যেমন হাজিরা দিতেন না, তেমনি নিরালায় নিশ্চিন্তচিত্তে ধর্মচিন্তায় মগ্ন হন নি। দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাবের তখনও বিস্তর দেরি এবং টিলক, লালা লাজপত ও বিপিনচন্দ্র অনুপস্থিত। চিত্তরঞ্জন সাহিত্যচর্চার ফাঁকে ফাঁকে সমাজসেবায় তৎপর থাকেন, রাজনীতিতে রাখেন সজাগ দৃষ্টি। বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলায় আসামীপক্ষকে সমর্থন এবং 'নারায়ণ' পত্রিকা সম্পাদনায় স্বরাজসাধনার পথ অন্বেষণ করেন।

১৯১৭ সাল থেকে চিত্তরঞ্জনের জীবনধারা সহসা নতুন খাতে বইতে শুরু করে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। সমগ্র জীবনেই তাঁর এই ভাবপ্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)-এর উপর সরকারের অন্তরীণ আদেশ জারি হলে তাঁর সংবেদনশীল মনে নাড়া লাগে। তখন থেকেই তিনি রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করেন। তখন প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) চলেছিল। ভারতের জাতীয় চেতনাও পরতে পরতে উন্মোচিত হচ্ছিল, মুক্তি আন্দোলনের মত ও পথ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও ক্রমশ নতুনতর রূপ পরিগ্রহ করে। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ফিরোজ শাহ মেটা ও গোখলের জীবনাবসান এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সরকারি প্রশাসনে যোগদানের ফলে ঐ-দলের আধিপত্য হ্রাস পায়। সুরেন্দ্রনাথই তখন মডারেটদের সর্বশেষ ও একমাত্র প্রতিনিধি। কিন্তু তখন তাঁর মনে রাজনীতির সাংগঠনিক তৎপরতা অপেক্ষা মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারের (১৯১৯) প্রতি অধিক নিবিষ্ট। এই অবস্থায় জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব অনেকাংশে চিত্তরঞ্জনের উপর এসে পড়ে।

চিত্তরঞ্জনের রাষ্ট্রচিন্তার পূর্ণ আভাস ভবানীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৭) প্রদত্ত তাঁর সভাপতির ভাষণ থেকে সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। সেই ভাষণে তিনি গতানুগতিক রাজনৈতিক সমস্যায় আবদ্ধ না থেকে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বিশেষত পল্লীসমাজের নবরূপায়ণকল্পে একটি আদর্শ চিত্র উপস্থাপিত করেন। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা প্রসূত বিশ্ব মহাযুদ্ধের পাশব রূপ প্রত্যক্ষ করে তিনি আধুনিক বাণিজ্যশিল্পপ্রবণ বস্তুতান্ত্রিক জীবন সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেন। ভারতের নিজ অন্তরে নিহিত ধারায় তার ভাবী সমাজের রূপের সন্ধানে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। সেই দৃষ্টিতে তিনি বলেন যে, আবহমানকাল যাবৎ ভারতীয় সমাজ পল্লীকেন্দ্রিক— সেজন্যে এদেশের পুনর্গঠনের প্রয়াস পল্লীভিত্তিক হওয়া উচিত। একথাও তিনি বলেন যে, দর্শন ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় ভারত একদিন বিশ্ববাসীকে আলোক প্রদর্শন করেছিল; সেই ভারতই আবার বিশ্বের দিশাহারা মানুষকে আলোকিত পথে নিয়ে যাবে।

মন্টেগু কমিশনের কাছে দেশের শাসন সংস্কার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নতুন কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন। তিনি চেয়েছিলেন অর্থ ও প্রশাসনে পরিপূর্ণ স্বায়ত্তাধিকার। রেলপথ, নৌ ও স্থলবাহিনীর ক্ষমতাই কেবল ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন।

অতঃপর তিনি সারা দেশ পরিক্রমা করে নিজ আদর্শের প্রচারে তৎপর হন। দক্ষিণপন্থীদের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। তখনও এদেশের রাজনীতিতে গান্ধীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিশ্বমহাযুদ্ধের সমাপ্তির পরেও ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহীদের দমনের ব্যবস্থাস্বরূপ ভারতরক্ষা আইনকে বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন সেই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। সরকার রাজদ্রোহের আনুপূর্বিক গতিপ্রকৃতি নিরূপণের জন্যে জাস্টিস রৌলাটকে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরই সুপারিশ অনুযায়ী পরে দুটি বিল বিধিবদ্ধ হয়। একটির সাহায্যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বিনা বিচারে আটক রাখার অধিকার দেওয়া হয় এবং অপরটির দ্বারা ভারতীয় ফৌজদারি আইনকে আরও কঠোর করে তোলা হয়। ১৯১৮ সালের দ্বিতীয়ার্ধে রৌলাট বিলের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন পরিচালিত হয় তার পিছনে চিত্তরঞ্জন সক্রিয় নেতৃত্বের সঙ্গে অর্থবলও যুগিয়েছিলেন। সেই বছর ডিসেম্বরে মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দিল্লী কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন।

১৯১৯ সালের প্রারম্ভে রৌলাট বিল আইনে পরিণত হলে দেশব্যাপী এক গণঅভ্যুত্থান দেখা দেয়। মার্চ মাসে গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ নীতি ও আন্দোলন

প্রবর্তন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি ঐপন্থা ইতিপূর্বে পরীক্ষা করেছিলেন। এপ্রিলে জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত হত্যাকাণ্ড ঘটে। এ-বিষয়ে নিযুক্ত কংগ্রেসের এক তদন্ত কমিটিতে সদস্য হিসাবে চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। ডিসেম্বরে মন্টফোর্ড শাসন সংস্কার বিল বিধিবদ্ধ হয়। সেই মাসেই মোতিলাল নেহরুর (১৮৬১-১৯৩১) সভাপতিত্বে অমৃতসর কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন "Total Obstruction"-এর পন্থা সুপারিশ করেন এবং কংগ্রেস অধিবেশনে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ভারত সচিবকে (মন্টেগু) ধন্যবাদ প্রদান-প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। সেই সময়ে গান্ধী ও মদনমোহন মালব্য মন্টফোর্ড শাসনসংস্কার আইন (১৯১৯) মেনে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাতে সায় দেন নি। কিন্তু তাঁর বক্তব্য অগ্রাহ্য হয়।

কৌতুকপ্রদ যে অমৃতসর কংগ্রেসের পর কয়েক মাসের মধ্যে গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন উভয়েরই মনোভাব সম্পূর্ণ ঘুরে যায়। গান্ধী অসহযোগ কর্মপন্থা তুলে ধরেন। অন্যদিকে চিত্তরঞ্জন, জিন্না প্রমুখ নেতারা সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

১৯২০ সালে গান্ধী খিলাফত আন্দোলন শুরু করেন। সেপ্টেম্বরে লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে "সহযোগিতা বর্জন নীতি" গৃহীত হয়। সেই অধিবেশনে গান্ধীর প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, সালিসি আদালত প্রতিষ্ঠা ও কাউন্সিল বর্জননীতি চিত্তরঞ্জন মেনে নিতে পারেন নি। গান্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তী নাগপুর কংগ্রেসে (১৯২০) প্রস্তাবটি নাকচের উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন সদলবলে রওনা হন। কিন্তু শেষে তিনি গান্ধীর কর্মপন্থা মেনে নেন। তখন থেকে তিনি তাঁর আইন ব্যবসায়ে বিপুল অর্থাগমের পথ পরিত্যাগ করেন। নাগপুর অধিবেশনের পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। কাউন্সিল বয়কটের সঙ্গেই আদালত ও স্কুলকলেজ বর্জন শুরু হয়। সারা ভারতে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুযায়ী 'কাশী বিদ্যাপীঠ', 'গুজরাট বিদ্যাপীঠ', 'মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ', 'আলিগড় মুসলিম বিদ্যাপীঠ' এবং কলকাতায় 'ন্যাশন্যাল কলেজ' স্থাপিত হয়।

১৯২১ সালে সারা দেশ অসহযোগ আন্দোলনে উদ্দাম হয়ে ওঠে। নেতৃস্থানীয় সকলের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনও ছ-মাসের জন্যে কারারুদ্ধ হন। ঐ বছর আহমেদাবাদ কংগ্রেসে তাঁর সভাপতিত্ব করার কথা ছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে সরোজিনী নাইডু চিত্তরঞ্জনের ভাষণ পাঠ করেন। এর কিছুকাল পরে অসহযোগ আন্দোলন বিপথগামী হয়ে পড়ায় এবং বিশেষ করে চৌরীচৌরা হত্যাকাণ্ডের (১৯২২) ফলে গান্ধী বার্দৌলি সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে

নেন ; তাতে তাঁর হতাশার সৃষ্টি হয়। চিত্তরঞ্জন গান্ধীর প্রত্যাগতিতে সায় দিতে পারেন নি।

১৯২২ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভানেত্রী বাসন্তী দেবী 'কাউন্সিল-প্রবেশ প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। লোকে বুঝতে পারে প্রকারান্তরে সেটা চিত্তরঞ্জনেরই প্রস্তাব। চারিদিকে তার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি দেখা দেয়। চিত্তরঞ্জন তখন কারাগারে। কারামুক্তির পর নিজ আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দৈনিক 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। সেই বছরেই তিনি গয়া কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন। কাউন্সিল প্রবেশনীতির পশ্চাতে তাঁর মনোভাব তিনি সেখানে স্পষ্টই ব্যক্ত করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিভিন্ন বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জনের সাম্যবাদী কথা-বার্তার বিবরণ সরকারি গোপন প্রতিবেদনে দেখা যায়। একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজন হল "not for the classes, but for the masses." কংগ্রেসের আন্দোলনে তিনি শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রস্তাব করেন। অন্য একটি প্রতিবেদনে যুক্তপ্রদেশ প্রাদেশিক সম্মেলনে তাঁর কর্মপন্থায় "no intention of playing into the hands of the bourgeoisie"—এই উক্তির সূত্রে তাঁর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যোগাযোগের কথা বলা হয়।[২] নানা সময়ে চিত্তরঞ্জনের এই ধরনের উক্তি এবং গান্ধীর সঙ্গে গোড়ার দিকে মতপার্থক্য মানবেন্দ্রনাথকে চিত্তরঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেই কারণে মানবেন্দ্রনাথ চিঠিপত্র ও দূত মারফৎ চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আপসপন্থী মনোভাবে মানবেন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয়। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) সভাপতি চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব গান্ধীর অনুগামীদের বিরোধিতায় নাকচ হয়ে যায়। গান্ধী তখন কারারুদ্ধ ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের কাউন্সিল প্রবেশপন্থার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী। একটি ধ্বংসাত্মক, অর্থাৎ কাউন্সিলে প্রবেশ করে বাধা (obstruction) দিয়ে তাকে বিকল করে দেওয়া ; এবং অপর পন্থাটি ছিল গঠনমূলক অর্থাৎ পল্লী সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের পুনর্বিন্যাস সাধন। আয়াল্যান্ডে 'সিন ফিন' আন্দোলনের আদর্শে এই কর্মপন্থা রচিত হয়। কাউন্সিলে প্রবেশ করার বিষয়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল পূর্ব অনুসৃত নীতির পরিবর্তন চাইলেন। রাজাগোপালাচারী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পূর্ণ অসহযোগ ও বয়কট নীতিতে অটল রইলেন।

গয়া কংগ্রেসে ব্যর্থকাম চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল, লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতারা 'কংগ্রেস-খিলাফত-স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি দল গঠন করেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে সাধারণ নির্বাচনে (১৯২৩) অংশ গ্রহণের

সিদ্ধান্ত হয়। চিত্তরঞ্জন এবং মোতিলাল নেহরু যথাক্রমে দলের সভাপতি ও কর্মসচিব হন। স্বরাজ্য দল পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও নতুন শাসন ব্যবস্থায় দ্বৈত শাসনের (diarchy) প্রতিবাদে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে নি। কাউন্সিলে প্রাধান্য লাভ করে চিত্তরঞ্জন বাংলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী সম্প্রীতি সাধনকল্পে মুসলমান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি কার্যকর চুক্তিপত্র রচনা করেন। তার বিষয়গুলি ছিল নিম্নরূপ—

১ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় হিন্দু-মুসলমান নির্বাচন লোকসংখ্যানুপাতে হইবে। কিছুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন।

২. ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদিতে ৬০ ও ৪০ অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবে, অর্থাৎ যেখানে মুসলমানের সংখ্যা বেশী সেখানে শতকরা ৬০ জন মুসলমান এবং হিন্দুর সংখ্যা বেশী হইলে শতকরা ৬০ জন হিন্দু নির্বাচিত হইবেন।

৩. বাঙ্গালার মুসলমানগণ লোকসংখ্যানুপাতে চাকুরী পাইবেন।

৪. আইনের দ্বারা ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয় বন্ধ হইবে না। যে-সম্প্রদায়ের ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোন কিছু নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হইবে, সে-সম্প্রদায়ের শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন লোক অনুমোদন করিলে তবে উহা হইতে পারিবে।

৫. ক. ধর্মের জন্য যদি গোহত্যার প্রয়োজন হয়, তবে হিন্দুগণ উহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিবেন না। আর মুসলমানগণও হিন্দুর প্রাণে ব্যথা লাগে এমন ভাবে অথবা এমন স্থানে গোবধ করিবেন না। খ. নামাজ পড়িবার সময়ে মসজিদের সম্মুখে সঙ্গীত হইতে পারিবে না।[৬]

চিত্তরঞ্জনের এই চুক্তিপত্র ঐসময়ে হিন্দুদের মনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। বস্তুত তিনি এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবেই অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন যে মুসলমান সম্প্রদায় সর্বদিক থেকে হিন্দুদের মতো সমান যোগ্যতা অর্জন করলে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন স্বতঃই চলে যাবে।

কোকনদ কংগ্রেসে (১৯২৩) স্বরাজ্য দলের কর্মসূচি অনুমোদন লাভ করে; কিন্তু চিত্তরঞ্জনের উল্লিখিত চুক্তিপত্র সম্পর্কে প্রচণ্ড বিতণ্ডার সূত্রপাত হয়। বিষয়টি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কতদূর উপযোগী তা বিবেচনা ও সকলের অভিমত জানার জন্যে একটি উপসমিতি গঠিত হয়।[৭] চিত্তরঞ্জনের উক্ত কর্মপন্থা শেষাবধি অনুমোদিত হয় নি। পরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনে (১৯২৬) চুক্তিটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশে এবং অন্যত্রও স্বরাজ্যদল কাউন্সিলে সরকারপক্ষের যাবতীয় প্রস্তাব

প্রতিরোধনীতিস্বরূপ নাকচ করতে শুরু করে। ইতিমধ্যে সংশোধিত মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী নির্বাচনে স্বরাজ্যদল কলকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য পৌরসভার ক্ষমতা দখল করে। চিত্তরঞ্জন কলকাতার প্রথম মেয়র (১৯২৪) নির্বাচিত হন। সুভাষচন্দ্র হন চীফ এক্‌জিকিউটিভ অফিসার। তার কয়েক মাস পরে কলকাতায় নিখিল ভারত স্বরাজ্য দলের অধিবেশন হয়। এই সময়ে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার প্রথম বেঙ্গল অর্ডিনান্স জারি করে স্বরাজ্য দলের সত্তর জন নেতা ও কর্মীকে কারারুদ্ধ করেন। চিত্তরঞ্জন তখন সিমলায় ছিলেন। তিনি অবিলম্বে ফিরে আসেন। গান্ধী ও মোতিলাল নেহরুও কলকাতায় উপনীত হন। স্বরাজ্য দলের শক্তি ও নৈপুণ্য এবং কর্মপন্থার সাফল্যে গান্ধী চমৎকৃত হন। কংগ্রেস ও স্বরাজ্য দলের নেতারা কলকাতায় একটি বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে অসহযোগ আন্দোলন তখনকার মত স্থগিত রেখে গঠনমূলক কর্মসূচির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে। অতঃপর বোম্বাইতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেলগাঁও কংগ্রেসে (১৯২৪) গান্ধী ও চিত্তরঞ্জনের মধ্যে মতপার্থক্য অপসৃত হয়। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫) চিত্তরঞ্জন সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন সরাসরি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের পক্ষে যৌক্তিকতা দেখান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই স্বরাজ তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হয় নি। ইংল্যান্ডে লেবার পার্টি তখন ক্ষমতাসীন। ফরিদপুর সম্মেলনে গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। তিনি চিত্তরঞ্জনকে পুরোপুরি সমর্থন করেন এবং সবাইকে স্বরাজ্য দলে যোগ দেবার পরামর্শ দেন। ঐবছরেই জুন মাসে চিত্তরঞ্জনের জীবনাবসান হয়।

দর্শনচিন্তার পরিপ্রেক্ষিত

পৈতৃক সূত্রে চিত্তরঞ্জন ব্রাহ্ম ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মে মন ভরেনি বলে তিনি বৈষ্ণব ভাবাদর্শে আকৃষ্ট হন। বৈষ্ণব চিন্তার প্রভাবে তিনি জগৎকে ঈশ্বরের লীলাস্থান বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জীব ও জড়ের মধ্যেই প্রকাশমান এবং ইতিহাস সেই পরমেশ্বরেরই অভিব্যক্তি। স্বভাবতই জগতের সামগ্রিক অস্তিত্ব ঐ সুরে অনুরণিত ; জগৎ ও জীবের সর্ববিধ বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মধ্যে ঈশ্বরের লীলা পরিদৃশ্যমান। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন—

> The truth of all truth is that the outer Leela of God reveals itself in history. Individual, Society, Nation, Humanity are the different aspects of that very Leela.[৫]

বৈষ্ণব চিন্তানুসারে ইতিহাসে পরিব্যাপ্ত ঐশ সত্তাই চিত্তরঞ্জনের মুক্তিতত্ত্বের উৎস ; মানুষ নির্বিশেষে সবাই এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বা ঐশ লীলার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর স্বরাজচিন্তাও পরোক্ষে এই তত্ত্বের উপর রচিত।

তাঁর দৃষ্টিতে কালাকাশ পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি এবং জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, একটির পরিবর্তে অপরটির উপলব্ধি সম্ভব নয়। তিনি একথাও মনে করতেন যে, যুক্তির ছকে সত্যকে যাচাই করা যায় না। একমাত্র উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই সত্যকে জানা যায়। সত্যই ঈশ্বরের স্বরূপ, সেজন্যে ঈশ্বরও অনির্বচনীয়। ঈশ্বর যেমন মানুষের মধ্যে প্রকাশমান, তেমনি ব্যক্তি, জাতি ও মানবতা পরস্পরের পরিপূরক রূপে অভিব্যক্তি লাভ করে। গয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

> I look upon the attainment of freedom and Swaraj the only way of fulfilling, oneself as individuals, as nations. I look upon all national activities as the real foundation of the service of that greater humanity which again is the revelation of God to man.[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দের প্রভাবে তিনিও ভারতীয় জাতীয়তার দিব্য প্রভাব উপলব্ধি করেন। তাঁর মতে জাতীয়তা এমন একটি ক্রমবিকশিত রূপ যাকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন পরমেশ্বর। জাতির স্বার্থে আত্মোৎসর্গ প্রকারান্তরে মানবতারই সেবা এবং মানবসেবাই ঈশ্বরের উপাসনা। মানবতার আদর্শকে চরিতার্থ করতে হলে চাই জাতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ। ব্যক্তি ও জাতির কল্যাণেই মানবতার সার্থক সমুন্নতি ঘটে।

রা ষ্ট্র দ র্শ ন

রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়ে চিত্তরঞ্জন সুসংবদ্ধ কোনো তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন নি। বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে সে-সম্পর্কে তাঁর চিন্তার বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের আদর্শে তিনি প্রভাবিত হন। অবরোহী (deductive) প্রণালী ছিল তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তের পদ্ধতি। তাঁর মতে সমাজ ও জীবনের প্রতিটি দিক সম্পৃক্ত, এবং সেই বোধের অভাবকে তিনি পশ্চিমী প্রভাবের কুফল বলে মনে করতেন। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯১৭) তিনি বলেন—

> To look upon life not as a comprehensive whole but as divided among many compartments was no part of our national culture and civilization···Will anyone tell me that

this portion of our national life is the subject of Politics, that other portion is the subject of Economics, while a third portion is the subject of Sociology? Must we divide life bit by bit like this?[৭]

চব্বিশ পরগনা জেলা সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি এই কথারই পুনরুক্তি করেন—

ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোনটা যে আগে ও কোনটা যে পশ্চাতে তাহা বলা দুরূহ।[৮]

আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি বিভিন্ন কথার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) সভাপতির ভাষণে তিনি স্বাধীনতা (freedom) শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলেন যে প্রথমত, স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে তার কোনো বাধা থাকবে না; তার একটা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাই, এবং যে-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পশ্চাতে জনসমর্থন থাকে তার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার অর্থ একথাও নয় যে তাতে অধীনতা বলে কিছু থাকবে না। সমাজে বসবাস ও নিরাপত্তার সুযোগ গ্রহণ মানেই অধীনতা। যে-অধীনতা মানুষ স্বেচ্ছায় মেনে নেয় তার সঙ্গে স্বাধীনতার কোনো অসংগতি নেই। উভয় ক্ষেত্রে জনসমর্থনই একমাত্র মাপকাঠি। বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মর্ম হল—

...as that state, that condition, which makes it possible for a nation to realize its own individuality and to evolve its own destiny.[৯]

ভারতের ক্ষেত্রে ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে চাই পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথের পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিকে আহ্বান জানানোর তিনি বিরোধী ছিলেন,[১০] কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত সুদৃঢ় না হলে অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা যায় না। পাশ্চাত্ত্যের রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আধিপত্যকে তিনি সমান চোখে দেখতেন, কারণ দেশের নিজস্ব ধারায় তার বিকাশ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা অর্জনের পথ তিনটি: ১. সশস্ত্র প্রতিরোধ; ২. আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা; ৩. অহিংস অসহযোগ পন্থা। নীতিগতভাবে তিনি প্রথমটিকে বর্জনীয় মনে করতেন।

গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রত্যয়গুলি বিশ্লেষণ করে বলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিরই ক্রমবিকাশ ঘটে চলে; ব্যক্তি থেকেই সুসংহত রাষ্ট্রের উৎপত্তি—তার নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ অব্যাহত থাকে। সার্বভৌমতা কথাটিকে তিনি

আপেক্ষিক বলে মনে করতেন। ব্যক্তির সার্বভৌমতা তার নিজেরই উপর বর্তায় এবং স্বরাজসাধনায় ব্যক্তির নানামুখী শক্তি ও সৃজনসত্তা পরিপুষ্ট হয়। ব্যক্তি হতেই সুসংবদ্ধ প্রতিবেশিকতা গড়ে ওঠে—যার পরিণতি হল সুসংহত রাষ্ট্র—তারপর আসে বিশ্বরাষ্ট্রের আদর্শ। এই সুসংবদ্ধ প্রতিবেশিকতা কেবল এক পাড়ায় দৈহিক অবস্থান থেকেই উদ্ভূত হয় না—তার জন্যে চাই প্রতিবেশিসুলভ চেতনা। প্রতিবেশী জীবনচেতনায় সঞ্জাত শক্তির সমন্বয়ে জাতীয়জীবন রূপ লাভ করে—সেখানেই শুরু হয় গণতন্ত্রের কাজ। সমাজ ও রাষ্ট্রের এই গতি ও প্রকৃতিকে তিনি যূথবদ্ধ চেতনার ("collective will") ফল বলে মনে করতেন। সেই দৃষ্টিতে বর্তমান গণতন্ত্রের প্রকৃতি হল জুড়ে জুড়ে একটা সর্বাঙ্গনগ্রাহী চেতনার সৃষ্টি করা। তাতে ভিন্ন চেতনার সংঘাত ঘটে—সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তার নিষ্পত্তি হয়। চিত্তরঞ্জনের নব্যগণতন্ত্রের আদর্শ হল এভাবে জোড়াতালি না দিয়ে, প্রতিবেশিক সম্পর্কের মধ্যে একটা মৌল সুরের সন্ধান করা, যেটা পরিণামে যৌথ চেতনাকে সার্থক ও সফল করে তুলবে। এ প্রক্রিয়া গণিতের যোগবিয়োগ নয়—এ-প্রক্রিয়ার নবজাগ্রত প্রতিবেশিক চেতনার সত্তা ও সম্ভাবনা বিকশিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। একই প্রণালীতে জাতীয় চেতনা সুসংবদ্ধ রূপ পরিগ্রহ করে। এইভাবে বিশ্বরাষ্ট্র রূপায়িত হয়। এই দার্শনিক বিশ্লেষণের মর্ম হল—"ব্যক্তির শক্তি ও সত্তার মুক্তি সাধন"।

গয়া কংগ্রেসের ভাষণেই চিত্তরঞ্জন ইউরোপীয় উদারতন্ত্রের অবক্ষয় ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অসারতার কথা উল্লেখ করেন। গণতন্ত্রের আদর্শ রূপ সম্পর্কে বলেন—

> The foundation of real democracy must be laid in small centres—not gradual decentralisation which implies a previous centralisation—but a gradual integration of the practically autonomous small centres into one living harmonious whole. What is wanted is a human state, not a mechanical contrivance.[১১]

চিত্তরঞ্জনের বিশ্বজনীন চিন্তা নিছক আদর্শপ্রবণ কবিকল্পনা ছিল না। অবশ্য তাঁর আগে অনেকেই বিশ্বসংঘ বা পার্লামেন্ট অফ নেশনস ইত্যাদির কথা ভেবেছেন। বস্তুতে পূর্বসূরীদের প্রভাবেই সারা দুনিয়ার মানুষকে নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলার চিন্তা তাঁর দেখা দেয়। ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন—

> ...if at some dim and distant day, the Federation of Humanity is established in this world, that will be because

the different nations of the earth will each have reached the full development of its distinctive peculiarities; and it is my firm and deliberate belief that when things have reached that state, kings and kingdoms will be no more necessary for the good of the world than nations and nationalities।[১২]

১৯১৭ সালে বরিশালে প্রদত্ত এক ভাষণে তিনি তাঁর federation of humanity চিন্তাকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। চারটি পর্যায়ে বিন্যস্ত ঐ চিন্তার রূপরেখা হল—

১. প্রাদেশিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা; ২. একটি নেশন হিসাবে ভারতীয়দের স্বীকৃতি অর্জন; ৩. (ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় ফেডারাল সরকার গঠন—যেখানে ভারত, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ প্রতিনিধি প্রেরণ করবে; ৪. সকল নেশনকে নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন।

বিশ্ব ফেডারেশনের পূর্ব পর্যায়ে একটি এশিয়াটিক ফেডারেশন স্থাপনের চিন্তা তার মনে দেখা দিয়েছিল। গয়া কংগ্রেসেই তিনি ভাবনাটিকে ব্যক্ত করেন। কিছুকাল যাবৎ "প্যান ইসলাম" আদর্শে মুসলমান রাষ্ট্রগুলির যে জোটবদ্ধতার চেষ্টা চলেছিল তাই থেকেই তাঁর মনে সেই চিন্তা আসে। "প্যান ইসলাম"-এর জিগির ছিল সংকীর্ণ। তিনি তাকে বৃহত্তর আদর্শের ব্যঞ্জনায় এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের একটি সংগঠন রূপে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। জানা যায় যে চিত্তরঞ্জন তাঁর এক বন্ধুর মারফৎ রবীন্দ্রনাথকে ভারতে একটি এশিয়া সম্মেলন আহ্বানের অনুরোধ জানান।[১৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঐ ধরনের প্যান-এশিয়াটিক মিলনের বিরোধী ছিলেন।

সর্বেশ্বরবাদী চিত্তরঞ্জন অধিকার (rights) সম্পর্কিত প্রত্যয়ে গ্রীনের মতো ভাববাদী মত পোষণ করতেন। অধ্যাত্মমুখী মন তাঁর ভক্তিরসে আপ্লুত ছিল। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরই মানুষকে অধিকার দিয়েছেন—অধিকারের স্রষ্টা মানুষ নয়। ঈশ্বরদত্ত অধিকারগুলি নিয়েই সমাজসংস্থা (institution) সমূহ কাজ করে। আইনানুগ বিধিব্যবস্থা "simply recognize rights which exist" বলে তিনি মনে করতেন।

চিত্তরঞ্জনের জীবনীকার পৃথ্বীশচন্দ্র রায় তাঁকে সোসালিস্ট হিসাবে অভিহিত করেছেন এবং মানবকল্যাণচিন্তা ও তত্ত্বগত দিক থেকে চিত্তরঞ্জন মার্কসবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বলে জীবনীকার অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৪] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে আহমেদাবাদ কংগ্রেসের প্রাক্কালে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশন্যালের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য মানবেন্দ্রনাথ রায়

মস্কোয় অবস্থান করছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে দেখেন যে দেশবন্ধু ও গান্ধী একমত নন। দেশবন্ধুর সংগ্রামী চেতনা ও তৎপরতাকে সঠিক পথনির্দেশ দেবার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ আহমেদাবাদ কংগ্রেসে (১৯২১) একটি কার্যসূচি প্রেরণ করেন। লেনিন ও স্টালিন কার্যসূচিটি সংশোধন করে দেন। মানবেন্দ্রনাথের দৌত্যকর্মে মস্কো থেকে নলিনী গুপ্তকে ভারতে পাঠানো হয়। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মকথায় লিখেছেন যে হজরত মোহানি সেই কর্মসূচি অনুযায়ী আহমেদাবাদ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি প্রস্তাবাকারে উত্থাপন করেন। গয়া কংগ্রেসের প্রাক্কালেও মানবেন্দ্রনাথ দেশবন্ধুর নিকট অনুরূপ এক কর্মসূচি ও একটি দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটি সরকার হস্তগত করেন। রয়টার সেই সময়ে ঐ পত্রটিকে কেন্দ্র করে মানবেন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর গোপন ষড়যন্ত্র হিসাবে সারা বিশ্বে তা ফলাও করে প্রচার করে।[১৫]

মার্কসবাদী কার্যপ্রণালীতে চিত্তরঞ্জনের সমর্থন ছিল না। তিনি রুশ বিপ্লবের চরমপন্থী হিংসাত্মক কার্যকলাপে সায় দিতে পারেন নি। তিনি অনুভব করেন যে তলস্তয়, পুশকিন, ক্রপটকিন জীবিত থাকলে হয়তো বৈপ্লবিক শক্তির দাপটে দেশে মার্কসবাদকে চাপিয়ে দেবার তাঁরা বিরোধিতা করতেন। চিত্তরঞ্জনের কথায়—

> The recent revolution in Russia is a very interesting study. The shape which it has now assumed is due to the attempt to force Marxian doctrines and dogmas on the unwilling genius of Russia. Violence will again fail. If I have read the situation accurately I expect a counter-revolution. The soul of Russia must struggle to free herself from the Socialism of Karl Marx.[১৬]

জাতীয়তাবাদকে চিত্তরঞ্জন আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখতেন। জাতীয়তা মানবাত্মারই এক ক্রমবিবর্তিত রূপ, যাকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর। জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ মানবতার মঙ্গলবিধানে পরিণতি লাভ করে এবং মানুষের সেবাই হল ঈশ্বরোপাসনা। তাঁর আবেগময় অন্তরে সদাই যেন "আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপরিপূর্তির" সুর ধ্বনিত হত। তাই তিনি জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে চাইতেন মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সুযোগ। গয়া কংগ্রেস ভাষণে তিনি জাতীয় আন্দোলনের এক দার্শনিক চিত্রপট তুলে ধরেন—

> From the national point of view the method of Non-co-operation means the attempt of the nation to concentrate upon

its own energy and to stand on its own strength. From the ethical point of view, Non-co-operation means the method of self purification, the withdrawal from that which is injurious to the development of the nation, and therefore to the good of humanity. From the spiritual point of view, Swaraj means that isolation which in the language of sadhana is called 'pratyahara'—an isolation and withdrawal which is necessary in order to bring out from our hidden depths the soul of the nation in all her glory.[১৭]

জাতীয়তাবাদের এই বেদান্তিক ব্যাখ্যায় পূর্বসূরী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তক গান্ধীরও দৃষ্টি তখন এত গভীর ও অন্তর্মুখী ছিল না। দেশবন্ধুর জাতীয়তা চিন্তায় আক্রামক মনোভাব ও আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আহমেদাবাদ ভাষণে তিনি বলেন যে, কাননে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো প্রতিটি নেশন নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী অভীষ্ট লক্ষ্যপথ রচনা করে—পরিণামে যাতে সবাই একটি পূর্ণাঙ্গ মানবজীবন ও সংস্কৃতির পরিপূরক হয়; মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিটি নেশনের যে-বৈশিষ্ট্য বিরাজ করবে তা হল তার শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন বিকাশ। তাঁর মতে—

The essence of the doctrine of nationalism…is not an aggressive assertion of its individuality, distinct and separate from the other nations, but it is a yearning for self fulfilment, self determination and self realization as a part of the scheme of universal humanity.[১৮]

ইউরোপের বেনিয়া মনোভাবাপন্ন জঙ্গি জাতীয়তাবাদকে তিনি সভ্যতার পরিপন্থী বলে মনে করতেন। তিনি যে-জাতীয়তাবাদের কল্পনা করেন তা বিশ্বশান্তির সহায়ক; তার মূলসূত্র হল প্রতিটি নেশনের স্বীয় বিকাশ, আত্ম-প্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। ভারতের সমকালীন রাষ্ট্র-নায়কদের মতো চিত্তরঞ্জনও ম্যাৎসিনির জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রভাবিত হন।

১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত কলকাতা কংগ্রেসে সভাপতি দাদাভাই নৌরজি "স্বরাজ" শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর শব্দটি দেশবাসীর কাছে অতি পরিচিত ও প্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। বিপিনচন্দ্র, টিলক, গান্ধী প্রমুখ অনেক নেতাই শব্দটির ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—সেকথা আগেই এ-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। স্বরাজ বলতে সাধারণতঃ self government বলে

মনে করা হত এবং স্বাধীনতা অর্থে বিদেশী শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি বলে মনে করা হত। চিত্তরঞ্জন শব্দটির একটি ব্যাপক ও গভীর তাৎপর্য দর্শিয়েছেন। গয়া ভাষণে তিনি বলেন—

> Swaraj is indefinable, and is not to be confused with any particular system of government. There is all the difference in the world between Swarajya and Samrajya. Swaraj is the natural expression of the national mind. The full outward expression of that mind covers and must necessarily cover, the whole life history of a nation···The question of nationalism, therefore, looked at from another point of view, is the same question as that of Swaraj.[১৯]

ঐ ভাষণেই তিনি স্বরাজসম্মত আদর্শ সরকারের একটি চিত্র তুলে ধরেন। জনসাধারণের অবগতি ও সমর্থনের জন্যে আদর্শ রাষ্ট্রকাঠামোর চিত্র দর্শানোর প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। অনুরূপ চিন্তা ও প্রচেষ্টা পরবর্তীকালে একমাত্র মানবেন্দ্রনাথের মধ্যেই দেখা যায়; তিনিও স্বাধীন ভারতের একটি খসড়া সংবিধান (১৯৪৪) প্রচার করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন পরিকল্পিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সর্বনিম্নে ভারতের গ্রামীণ সংগঠনের মতো স্থানীয় সংস্থাব কথা বলা হয়, যেগুলির সমন্বয়ে পিরামিডাকারে একটি সর্বভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হবে; ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকবে না। প্রচলিত পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সঙ্গেও তার বিস্তর পার্থক্য ছিল। তিনি বলেন—

> No system of Government which is not for the people and by the people can ever be regarded as the true foundation of Swaraj. I am firmly convinced that a parliamentary government is not a government by the people and for the people. Many of us believe that the middle class must win Swaraj for the masses. I do not believe in the possibility of any class movement being ever converted into a movement for Swaraj···How will it profit India, if in place of the white bureaucracy that now rules over her, there is substituted an Indian bureaucracy of the middle classes ?[২০]

চিত্তরঞ্জন এ-কথাই মনে করেছিলেন যে শ্রেণী-বিশেষের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন পরিণামে সেই শ্রেণীরই কুক্ষিগত হয়ে দাঁড়ায়। বুর্জোয়া সরকার এইভাবেই যে গড়ে ওঠে সেকথা তিনি অব্যর্থ ভাষায় প্রকাশ করেন।

পরাধীনতার অবসানেই যে স্বরাজ আসবে তা তিনি মনে করতেন না। তিনি স্বরাজের সংজ্ঞায় নতুন তাৎপর্য দান করেন। গয়া কংগ্রেসের পর স্বরাজ্য দলের কলকাতায় অনুষ্ঠিত (আগস্ট, ১৯২৪) প্রথম সাধারণ সভায় তিনি সেই অভিমতই ব্যক্ত করেন এবং ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯২৫) তিনি তাঁর মনোভাবকে আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন—

> কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজ লাভ হইবে না। স্বরাজের আদর্শ আরও মহত্তর। ইংরাজ চলিয়া গেলে অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতেও বা পারি, তথাপি কেবল তাহাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যাহা বুঝি তাহার প্রতিষ্ঠা হয় না। পক্ষান্তরে ইংরাজ থাকিয়াও যদি জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশলাভে কোন বাধা না জন্মে, তবে ইংরাজ থাকুক, তাহাতে আপত্তি কি? স্বরাজ আর স্বায়ত্ত-শাসন এক নহে। আমার স্বরাজের আদর্শের সহিত শাসন প্রণালী—তাহা ঘরেরই হউক অথবা পরেরই হউক—কোন রূপেই সংশ্লিষ্ট নয়। তবে যে স্বায়ত্তশাসন আত্মকল্যাণের জন্য বিধিবিধান, তাহা কতকটা স্বরাজের আদর্শের নিকটবর্তী। জাতীয় সর্বাঙ্গীন বিকাশলাভের অবাধ প্রয়াসই খাঁটি স্বরাজসাধনা।[২১]

চিত্তরঞ্জনের ফরিদপুর ভাষণকে লোকে ভুল বুঝেছিল। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'ফিউচার অফ্ ইন্ডিয়ান পলিটিকস' (১৯২৬) গ্রন্থে তার তীব্র সমালোচনা করেন।[২২] বস্তুত চিত্তরঞ্জন চেয়েছিলেন দেশবাসীর "আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপরিপূর্তি"। যদি এই লক্ষ্যবিষয়গুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই অর্জন করা যায় তাহলে ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করবে; কিন্তু যদি ইংরেজ ভারতের বিনাশ সাধনে তৎপর থাকে তাহলে ভারত সাম্রাজ্যের বাইরে থাকবে। এ-ধরনের প্রস্তাব বহুপূর্বে বিপিনচন্দ্রের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছিল। চিত্তরঞ্জন আমলাতন্ত্রের হৃদয়ের পরিবর্তন ও শাসনরীতির সংশোধন কামনা করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ণ স্বরাজদানে সম্মত হতে অনুরোধ জানান। কিন্তু ইংরেজ তাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি দেশবাসীকে দ্বিগুণ উদ্দীপনায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানান। তিনি "ট্যাক্স বন্ধ কর" আন্দোলনের কথাও চিন্তা করেন। মোটের উপর ফরিদপুর সম্মেলনে তিনি সরকারের সঙ্গে যে-সহযোগিতার প্রস্তাব করেছিলেন তাতে দেশের আত্মমর্যাদার প্রশ্ন আদৌ উপেক্ষিত হয় নি।

স্বাধীনতা অর্জনকল্পে হিংসাত্মক বৈপ্লবিক পদ্ধতি বা সন্ত্রাসবাদী পথকে তিনি অনুমোদন করেন নি। ১৯২৪ সালে দেশে যখন হিংসার বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় তখন তিনি তার নিষ্কুণ্ঠ নিন্দা করেন। তবে বিবেক ও বাস্তববোধ থাকায় তিনি আদর্শনিষ্ঠ উদ্দাম তারুণ্যের হিংসাত্মক কার্যকলাপের পিছনে দেশপ্রেম

ও হৃদয়াবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি। স্বরাজ্য দল অনুসৃত রাজনৈতিক কর্মপন্থা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিশ্লেষণ করে সংবাদপত্রে (মার্চ, ১৯২৫) বিবৃতি দিয়ে রাজনৈতিক হত্যা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন। সেইসঙ্গে সরকারকেও তিনি হুঁশিয়ার করে দেন এই বলে যে সরকারের চণ্ডনীতির ফলেই সন্ত্রাসবাদ বিস্তার লাভ করেছে।

আর্থনীতিক চিন্তা

চিত্তরঞ্জনের চিন্তা শুধু যে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই আবদ্ধ ছিল তা নয়। অর্থনৈতিক বিষয়েও তিনি সমধিক সজাগ ছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা তাঁকে সমাজতন্ত্রী আখ্যা দেয়; অন্যদিকে সমাজতন্ত্রীরা তাঁকে বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রবক্তা বলে মনে করত।

তাঁর স্বরাজ সাধনার মধ্যে শুধু রাজনৈতিক গণতন্ত্র নয়, অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শও নিহিত। মার্কসবাদী সোশ্যালিজমের প্রয়োগ-পদ্ধতি তাঁর ঐ মতবাদের প্রতি আস্থা ভঞ্জন করে দেয়। প্রায় সকল বক্তৃতাতেই তিনি দেশের আর্থিক দুর্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রতিযোগিতামূলক ইউরোপীয় অর্থনীতির "ইনডাসট্রিয়ালিজম"-এর তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।[১৭] ভারতের নিজস্ব মৌলিক ধারায় দেশের গ্রামীণ ও কৃষিনির্ভর জীবনের পুনর্গঠনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন। বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্যে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

তিনি যে বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থার কল্পনা করেছিলেন তার প্রাথমিক ভিত্তি সুসংগঠিত পল্লীসমাজ; গ্রামীণ অধিবাসীদের শিক্ষা ও চেতনার সঙ্গে তিনি চাইতেন আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা, পঞ্চায়েতী পরিশাসন ও সমবায়ী প্রণালীতে পল্লীসমাজে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। কৃষির উন্নয়ন ও কুটিরশিল্পের বিস্তারে তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি ভারতের প্রাচীন ধাঁচে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন—সেজন্যে চাইতেন কিছুটা বিলাসিতা বর্জন ও আত্মসংযমের প্রয়াস। বিদেশী বস্তু যথাসাধ্য ব্যবহার না করাই ছিল তাঁর অভিমত—সেজন্যে তিনি নিজে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে তৎপর হয়েছিলেন। শ্রেণীস্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্র-কাঠামোকে তিনি সমর্থন করতেন না। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি "co-operation and integration"-এর ভিত্তিতে দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের কথা চিন্তা করেন।

পাশ্চিমী ধারায় দেশের শিল্পোন্নয়ন পছন্দ না করলেও স্বদেশী ব্যবসায়ে

তিনি আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে একেবারে বর্জন করতে চান নি। লাভজনক ব্যবসায়ে সুলভ মূলধন বিনিয়োগে তিনি সকলকে উৎসাহিত করতেন। দেশের কৃষক অভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দান করেন। লাহোরে অনুষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (১৯২৩) অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি কারখানা শ্রমিকদের জন্যে আইনানুগ বিধিব্যবস্থা ও তাদের ইউনিয়ন গঠন প্রচেষ্টার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। সেই অধিবেশনেই তিনি বলেছিলেন যে স্বরাজের সুফল যদি মধ্যবিত্তরা একচেটিয়া করে নেয় তাহলে তিনি চাষীমজুরের স্বার্থেই লড়বেন। গয়া ভাষণেও তিনি চাষীমজুরের সংগঠন প্রভৃতির বিষয়কে যথোচিত গুরুত্ব দান করেছিলেন।

উপসংহার

মৌলানা আজাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে চিত্তরঞ্জনের অকালমৃত্যু না হলে এদেশের রূপ হয়তো অন্যরকম হত; হয়তো দেশবিভাগের প্রয়োজন দেখা দিত না।[২] বাস্তবিকই চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতির উগ্র বাম ও অতি দক্ষিণ কোনো দলেই না ভিড়ে চিত্তরঞ্জন স্বতন্ত্র এক তৃতীয় পথ রচনা করেছিলেন। রাজনীতির মধ্যে তিনি অলৌকিকত্ব ও সাম্প্রদায়িকতাকে যেমন টেনে আনেন নি, অন্যদিকে তেমনি নির্বিবেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে সায় দেন নি, রক্তঝরা বিপ্লবের পথও অনুসরণ করেন নি। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধাচারণকেও জাতিবিদ্বেষে পরিণত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। অন্ধবিশ্বাসে কোনো কিছুকে যেমন তিনি আঁকড়ে থাকতেন না, তেমনি স্বভাবসুলভ ভাবাবেগের বশে তিনি বিনা বিচারে কোনো কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতেন না। রাজনীতির অলিগলি সম্পর্কে তিনি যথেষ্টই সচেতন ছিলেন; কার্যকারিতার তাড়নায় কর্মপন্থা রচনা করলেও নীতিবোধকে তিনি বিসর্জন দেন নি। বৈষ্ণবচিন্তার প্রভাবে তিনি মূলত মানবপ্রেমিক ছিলেন; মানুষের কল্যাণচিন্তায় তিনি তাই নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি মূলত বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রের অনুবর্তী ছিলেন। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে অসহযোগ আন্দোলন, কাউন্সিল বয়কটনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর গান্ধীর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে; কিন্তু পরিশেষে তিনি গান্ধীর আদর্শ ও কর্মপন্থা বহুলাংশে মেনে নেন। অন্যদিকে গান্ধীও চিত্তরঞ্জনেব স্বরাজ্য দলীয় মতাদর্শ গ্রহণ করেন।

চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক সত্তায় দুটি ধারার সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। একটি

হল নিপুণ আইনজ্ঞ এক আধুনিক রাজনীতিকের এবং অন্যটি হল একনিষ্ঠ স্বরাজ সাধক এক রোমান্টিক অধিনায়কের। তাঁর উচ্ছ্বাসপ্রবণ মনের পশ্চাতে সদাই যেন "আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মপরিপূর্তির" সুর অনুরণিত হত। স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ভিন্ন হলেও স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ছিল। স্বরাজকে তিনি কেবল রাজনৈতিক দৃষ্টিতেই দেখেন নি। মননশীল ও আত্মিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে তিনি স্বরাজের চিত্র কল্পনা করেন।

গয়া কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর সভাপতির অভিভাষণ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে বিশেষ মূল্যবান। সেই ভাষণে তিনি এক অভিনব রাষ্ট্রদর্শনের ইঙ্গিত করেন, যাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তার বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায়। বৈষ্ণব চিন্তার প্রভাবে তিনি জগৎকে ঈশ্বরের লীলাস্থান বলে মনে করতেন; ঐ প্রভাবকে হেগেলীয় প্রত্যয়ে এই বলে প্রসারিত করেন যে ইতিহাস ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। অন্তর্নিহিত নিগূঢ় সত্তায় ইতিহাস তাঁর কাছে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ইতিহাসচিন্তায় তিনি মাৎসিনির আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদী দর্শনের সংমিশ্রণ ঘটান; মাৎসিনির দৃষ্টিতে মানবতার আদর্শকে চরিতার্থ করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতির পূর্ণ বিকাশ, নাগরিক চেতনার পুনরুজ্জীবনকল্পে প্রয়োজন সুস্থ প্রতিবেশিসুলভ মনোভাবের উন্নয়ন। রাষ্ট্রপরিচালনায় নাগরিকদের অংশ গ্রহণের প্রাথমিক ক্ষেত্র হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও তার পরিবেশ। মানবগোষ্ঠীর মঙ্গল বিধান জাতির যে-মৌল উপাদান সেই ব্যষ্টির উপর বর্তায়। সমকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত থেকেই তিনি তাঁর ক্রমবিন্যস্ত বিশ্ব-মহাজাতি সংঘের পরিকল্পনা রচনা করেন। একটি সুস্পষ্ট ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি "এশিয়াটিক ফেডারেশন" এবং "ফেডারেশন অফ হিউম্যানিটিজ"-এর তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন; সে ভাবনা সেদিন নিঃসন্দেহে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল।

ভারতের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনকল্পে গণতান্ত্রিক তৃণমূলস্বরূপ দেশব্যাপী গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে তোলার প্রস্তাব তাঁর অনুরূপ দূরদৃষ্টি ও চিন্তার গভীরতা প্রমাণ করে। কেন্দ্রাভিগ রাষ্ট্রকাঠামো তাঁর মতে যান্ত্রিক নিষ্প্রাণতায় পরিণত হয়। ভিত থেকে অট্টালিকা নির্মাণের মতো বিকেন্দ্রিত প্রশাসন-ব্যবস্থাও অনুরূপ পদ্ধতিতে গঠিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। দেশময় ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট প্রশাসনিক অধিকারগুলির সমন্বয়ে একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠবে— এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। গয়া কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন প্রস্তাবটিকে সবিস্তারে উপস্থাপিত করেছিলেন। তাতে গ্রাম ও জেলাভিত্তিক প্রতিনিধি সভার এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; সেটাই ছিল তাঁর কাছে গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থাকে সক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁর অভিমত। সম্প্রতিকালে

দেশে যে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণের প্রচেষ্টা চলেছে তার ভাবনা চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক গয়া ভাষণে পাওয়া যায়। তার আগে অবশ্য বিপিনচন্দ্র পালই এবিষয়ে চিন্তার প্রথম সূত্রপাত করেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের চিন্তাভাবনা শুধু যে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই আবদ্ধ ছিল তা নয়। অর্থনৈতিক বিষয়েও তিনি সমধিক সজাগ ছিলেন। গয়া কংগ্রেসেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে স্বরাজ সর্বজনের, মুষ্টিমেয় মানুষের জন্যে নয়। দেশের সর্বাত্মক অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিন্তাও তাঁর মধ্যে যথেষ্ট দেখা যায়। অবহেলিত অনুন্নত মানুষের নিজ অধিকার অর্জনের জন্যে তিনি তাদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে চেষ্টা করেন। সমাজতন্ত্রের আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সেজন্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও অহিংস নীতিকে বর্জন করেন নি।

হিন্দুমুসলমানের সম্প্রীতি ছিল তাঁর অহোরাত্রের চিন্তা। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্যে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। ঐক্য ও সহযোগিতার তাগিদে রচিত তাঁর কর্মপন্থা "দাশ ফরমুলা" নামে পরিচিত। ঐ কর্মপন্থার জন্যে তাঁকে যথেষ্ট অপ্রিয়ভাজন হতে হয়।

বাঙালির নিঃস্ব মনন ও দৈন্যজীবনদশার জন্যে তিনি পশ্চিমী নকলনবিশিকে অভিযুক্ত করেন। তিনি চাইতেন ভারতের প্রাচীন আদর্শের নবরূপায়ণ এবং সেই অনুযায়ী রাষ্ট্রতত্ত্ব অর্থতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা নিঃস্বার্থ হৃদয় চিত্তরঞ্জনের চিত্ত ছিল অদম্য। প্রাজ্ঞরাজনীতিকের দূরদৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তাশক্তি তাঁকে বৈশিষ্ট্য দান করে। তাঁর বিভিন্ন রচনা ও ভাষণে দেশবিদেশের রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ থেকে চিত্তরঞ্জনের যুক্তিনিষ্ঠ রাষ্ট্রচিন্তার এবং তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উৎস নির্দেশ

১. সুকুমাররঞ্জন দাশ। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৬। পৃ. ৩০।

২. P. C. Bamford. *Histories of the Non-co-operation and Khilafat Movements*. 1925. p. 82.

৩. সুকুমাররঞ্জন দাশ। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৬। পৃ. ২০২-২০৩।

৪. Subhas Chandra Bose. *The Indian Struggle : 1920-42*. 1964. p. 92.

৫. H. N. Mitra (ed). *The Indian Annual Register*. 1923. p. 833.

৬. *Ibid*. p. 839.

৭. *Deshbandhu Chittaranjan*: Brief Survey of Life and Work, Provincial Speeches, Congress Speeches. Published by Rajen Sen and B. K. Sen. 1926. Vol. 1. p. 3.

৮. সুধাকৃষ্ণ বাগচী। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৩। পৃ. ১০১-১০২।

৯. H. N. Mitra (ed.) *The Indian Annual Register*. 1921. p. 27. (Appendix).

১০. *Ibid*. p. 28.

১১. *Ibid*. 1923. p. 831.

১২. *Deshbandhu Chittaranjan*. Published by Sen and Sen. 1926. Vol. 1. p. 23.

১৩. Prithwis Chandra Ray. *Life and Times of C. R. Das*. London. 1927. p. 230.

১৪. *Ibid*.

১৫. M. N. Roy. *Memoirs*. 1964. p. 545.

১৬. H. N. Mitra (ed.) *The Indian Annual Register*. 1923. p. 825.

১৭. *Ibid*. p. 823.

১৮. *Ibid*. 1922. p. 39. (Appendix).

১৯. *Ibid*. 1923. p. 823.

২০. *Ibid*. p. 830.

২১. সুকুমাররঞ্জন দাশ। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন'। ১৯৩৬। পৃ. ২৩০-২৩১।

২২. M. N. Roy. *The Future of Indian politics*. London. 1926. p. 72.

২৩. *Deshbandhu Chittaranjan*. Published by Sen and Sen. 1926. Vol. 1. pp. 1-83.

২৪. Maulana Abul Kalam Azad. *India Wins Freedom*. 1959. p. 21.

আবদুল রসুল ॥ ১৮৭২—১৯১৭

একথা আগেই আলোচিত হয়েছে যে বাঙালি মুসলমান সমাজে নবজাগরণের ধারা প্রবাহিত হয় বিলম্বে ও ধীর গতিতে এবং হিন্দুধারা থেকে স্বতন্ত্র খাতে। তাহলেও সমসাময়িককালে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে কিছুটা সম্প্রীতি বিরাজ করত এবং "ধর্ম্ম লইয়া মারামারি কাটাকাটি হইত না"—সেকথা বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়। কিন্তু বাঙালি মুসলিম মানসে নিজেদের ধর্মগত স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিভেদবুদ্ধি নানাকারণে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। নিজেদের ধর্মীয় সত্তার ভিত্তিতে মুসলমানদের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের প্রথম প্রবক্তা আবদুল লতিফের ভূমিকা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

লতিফের সমকালে রেভারেন্ড জেমস লঙ দীর্ঘকাল যাবৎ অনেক তথ্য সংগ্রহ করে মুসলমানদের শিক্ষা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার একটি চিত্র তুলে ধরেন, এবং নানা নিবন্ধে তিনি যেসব উন্নয়নব্যবস্থার সুপারিশ করেন সেসব সেদিনের আশরাফ মুসলমান সমাজকে আকৃষ্ট করে। তেমনি উইলিয়াম হান্টারের 'দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (১৮৭১) গ্রন্থে বাঙালি মুসলিম সমাজের হীনাবস্থার যে অনুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল তা সমকালীন শিক্ষিত মুসলিম মানসকে স্বতন্ত্র সাজাত্যবোধে উদ্দীপিত করে। ১৮৭১ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম আদম শুমারির প্রতিবেদনও জাতিগত ভেদাভেদের অন্যতম উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তার বছর দশেক পরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্যান ইসলামী মতাদর্শের প্রবক্তা জামালউদ্দিন আফগানী কলকাতায় উপনীত হন। তাঁর ইংরেজবিরোধী প্রচার সেদিন নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি বটে, তবে তাঁর প্রচারের ফলে সাধারণ শিক্ষিত মুসলিম মানসে সর্বদেশীয় মুসলমানদের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ ও তাদের উৎপত্তির একই উৎসের চেতনা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে খুঁচিয়ে তোলে।[১] আমির আলি বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেগুলির প্রধান কাজ ছিল "মুসলমান হিন্দু থেকে স্বতন্ত্র"—এই দৃষ্টিভঙ্গি সযত্নে প্রচার করা।

ইসলামধর্মী বাঙালি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসও পরোক্ষে কম ইন্ধন যোগায় নি। বেশির ভাগ হিন্দুর কাছে জাতীয়তাবাদ ছিল হিন্দুধর্মীয়দের নিজস্ব পুনর্জাগরণ। রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ে বক্তৃতা এই মানসিকতার প্রধান উৎস। তাঁর অনুগামী নবগোপাল মিত্র হিন্দুমেলার প্রবর্তন করেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকেরা নিজেদের পত্রপত্রিকায় হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিমবিদ্বেষের

সমালোচনা করেন এবং সম্প্রদায়গত স্বার্থ ও ধর্মীয় আত্মস্বাতন্ত্র্য বিস্তারে তাঁদের সেদিন সক্রিয় হয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক।

আইনসভায় যথোপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ছাড়াও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধির ব্যাপারে আরও একটি বিষয় বড় হয়ে দাঁড়ায়, সেটি হল সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে পারস্পরিক রেশারেশি। উভয় কারণে সাধারণভাবে মুসলমানেরা সদ্যগঠিত কংগ্রেসকে নিজেদের সংগঠন বলে মেনে নিতে পারে নি; কংগ্রেসকে তারা দেখত ভয় ও সন্দেহের চোখে। তাছাড়া কংগ্রেস নিত্যই থাকত ইংরেজ সরকারের সমালোচনায় মুখর, যেটা মুসলমানেরা আদৌ পছন্দ করত না। তাদের কাছে কংগ্রেসের প্রতিপত্তি তথা সরকারের কাছ থেকে সুবিধাদি আদায়ের অর্থ ছিল চাকরিসহ সর্ববিধ বিষয়ে হিন্দুদের প্রাধান্য।

হিন্দু-মুসলিম বিভেদ সৃষ্টির যাবতীয় কার্যকলাপ সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকালীন সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের একটি ক্ষীণ ধারা সাবলীল গতিতে প্রবহমান ছিল। বাঙালি কবি ও ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অন্যতম প্রতিভূ। সৈয়দ আহমদ ও আমির আলির প্রচার ও বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৯২ সাল অবধি কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের হার ছিল প্রায় এক ষষ্ঠাংশ, অবশ্য তাতে বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যঞ্জনায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মুসলমানদের ক্রমেই দূরে সরিয়ে দেয়। মহারাষ্ট্রে গণপতি উৎসব এবং উত্তর ভারতে গো-হত্যা নিবারণী আন্দোলন ও উর্দু-হিন্দী বিতর্ক, অন্যদিকে বিশেষ করে বঙ্গদেশে বিপ্লবীদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীকে প্রেরণার উৎস হিসাবে স্থাপনা এবং নানাবিধ ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার স্বভাবতই মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারে আঘাত করে। তাই উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বলিষ্ঠ রূপ নিতে পারে নি। মুসলিম রাজনৈতিক আবেগ ও প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায় অতীতের পাঠান মোগল আমলের ভারত কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান প্রধান দেশগুলি। তাদের রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মচাঞ্চল্য কালক্রমে ভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে দানা বাঁধে।

উনিশ শতকের শেষ দশক এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলিম সমাজ যখন স্পষ্টতই ধর্মের আবেগে বিচ্ছিন্নতা, ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি আনুগত্য এবং হিন্দুদের প্রতি ঈর্ষা, ভীতি ও বিদ্বেষের মিশ্রিত মনোভাব নিয়ে ভিন্ন পথে এগিয়ে চলে সেই সময়ে বঙ্গভঙ্গের জল্পনা-কল্পনা চলেছিল, এবং পরিশেষে সেটি রূপায়ণের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। মুসলমান সমাজের বৃহদাংশ সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে সমগ্র হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের একটি ছোট ভগ্নাংশ বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে।

বঙ্গব্যবচ্ছেদবিরোধী স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মধ্যে যেসব নেতৃস্থানীয় মুসলমানের মধ্যে ঐক্যবোধ ও যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রবল আবেগ ও উদাম দেখা যায় তাঁদের মধ্যে আবুল কাশেম, আবদুল হালিম গজনভি, দীন মোহম্মদ, দেদার বক্স, লিয়াকত হোসেন, আবদুল গফুর, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং সর্বোপরি আবদুল রসুলের ভূমিকা স্মরণীয়।[২]

রসুলের জন্ম কুমিল্লার গুণ্যক গ্রামের এক জমিদার পরিবারে। পিতা মোলবী গোলাম রসুলের অকাল মৃত্যুর ফলে আবদুলের বাল্যজীবন কাটে মাতুলালয়ে, মৈমনসিংয়ের এক গ্রামে। ঢাকায় সরকারি স্কুলে এনট্রান্স পরীক্ষার পরে তাঁকে লিভারপুলে পাঠানো হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করে ব্যারিস্টারি পড়া শুরু করেন। ইংল্যান্ডে থাকতে তিনি অরবিন্দ ঘোষের সান্নিধ্যে এসে দেশপ্রেম ও জাতীয় আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হন।[৩] ১৮৯৯ সালে কলকাতায় ফিরে এসে রসুল হাইকোর্টে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। সেইসময়ে হিন্দু সমাজ সংস্কারকদের অনুকরণে রসুল মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত যখন ঘোষিত হয় (১৯ জুলাই, ১৯০৫) তখন রসুলকে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠতে ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেখা যায়। সাধারণভাবে মুসলমানেরা বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিল। সেই দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী চেতনার সঞ্চার এবং স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের যুক্ত করার অদম্য প্রয়াস রসুলের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এবং নির্ভীক মনের পরিচয় দেয়।

স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের পিছনে দেশবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশের লোককে শিল্পবাণিজ্য গড়ার দিকে উৎসাহদানের সঙ্গে নিজেও অশ্বিনী দত্তর সঙ্গে একটি কোঅপারেটিভ নেভিগেশন কোম্পানি খুলেছিলেন। তাতে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, সূর্যকান্ত আচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রমুখ জমিদারেরা যুক্ত হন।

বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলনে কলকাতার ছাত্রসমাজ প্রবল উদ্দীপনায় যুক্ত হয়েছিল। ছাত্রদের নিবৃত্ত করার তাগিদে কার্লাইল সার্কুলার নামে অভিহিত এক সরকারি আদেশনামায় (২২ অক্টোবর, ১৯০৫) স্কুল ও কলেজগুলিকে এই বলে শাসানো হয় যে ছাত্রদের রাজনীতি থেকে নিবৃত্ত না করা হলে সরকারি অনুদান ও বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করাই শুধু নয়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের চাকরির সুযোগসুবিধাও বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার প্রতিবাদে হাজার খানেক ছাত্র ২৬ অক্টোবর তারিখে ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমিক ক্লাবপ্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছিল। সভায় বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সরকারি শিক্ষার বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন। সেদিনের সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন আবদুল রসুল; সেদিনের প্রস্তাব অচিরেই রূপায়িত হয় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গোড়াপত্তনে।[৪] পরিষদের ৯২ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুসলমান। পরবর্তীকালে রসুল কিছুকাল পরিষদের সেক্রেটারি (১৯১৩-১৬) হন। ছাত্র আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে তাঁকে আগেই দেখা গিয়েছিল। সেই বছরে, অর্থাৎ ১৯০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রসুলের নেতৃত্বে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা শোভাযাত্রা করে রাজাবাজারে এক জনসভায় যোগ দেয়। সেদিনের সভায় রসুলের উদাত্ত ভাষণ আপার সার্কুলার রোড ভাষণ বা রাজাবাজার ভাষণ নামে খ্যাত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের দুটি অধিবেশনে রসুল সভাপতিত্ব করেছিলেন। প্রথমটি ১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে বরিশাল শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সদ্যগঠিত পূর্ববঙ্গ প্রদেশের গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারের নির্দেশে পুলিশ শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে দেয়, সম্মেলনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নিগৃহীত হন। সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে জবরদস্তি মোটা পরিমাণ জরিমানা আদায় করা হয়।[৫]

প্রাদেশিক সম্মেলনের দ্বিতীয় যে অধিবেশনে রসুল সভাপতিত্ব করেন সেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরে (১৯১২)। তখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেছে। এদুটি ছাড়াও রসুলের নিজের পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯১৪) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন রসুল স্বয়ং। প্রাদেশিক সম্মেলন তিনটিতে তাঁর ভাষণ এবং অন্যান্য সভাসমিতিতে তিনি যেসব ছোটবড় ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলির ভিত্তিতে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্গবিভাগ কায়েম হবার কিছুকাল পরে ঢাকায় সারা ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল (১৯০৬)। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লা-আল্লাহ্। তাঁর মুখ্য সহকারির ভুমিকায় ছিলেন আবুল কাশেম ফজলুল হক, যিনি কয়েক দশক পরে কৃষক প্রজা দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৩৭) এবং লীগের লাহোর সম্মেলনে (১৯৪০) পাকিস্তান দাবির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অন্যদিকে লীগ প্রতিষ্ঠাতা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা-আল্লাহ্র ভ্রাতা খাজা আতিকুল্লা কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে (১৯০৬) বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনেন।

স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্বে আসীন আবুল কাশেম, গজনভী, রসুল

প্রমুখ মুসলমান সমাজের মুখপাত্ররা মুসলিম লীগের পালটা সংগঠন হিসাবে বেঙ্গল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন (৩ নভেম্বর ১৯০৫)। পরে রসুল সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ইন্ডিয়ান মুসলমান অ্যাসোসিয়েশন নামে সেটিকে মুসলমানদের একটি জাতীয় দল হিসাবে দাঁড় করান। বলা বাহুল্য উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলিম লীগের সম্ভাব্য প্রাধান্যকে খর্ব করা। দলের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি হয়েছিলেন যথাক্রমে মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদ এবং তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতা মহম্মদ আলি জিন্না। দিল্লীর সৈয়দ হায়দার রেজা ও রসুল নিজে নবগঠিত দলের সচিব পদ গ্রহণ করেন। দলটির অস্তিত্ব বেশিকাল স্থায়ী হয় নি।[৬]

সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হিসাবে যদিও রসুল পরিচিতি অর্জন করেন, কিন্তু নিজের যুক্তিবোধ অনুসারে তিনি কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে চিহ্নিত হন। বহরমপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৭) রসুল সরকারি খেতাব বয়কটের যে প্রস্তাব তোলেন সেটা ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বিশেষ অধ্যাপকের পদ রসুলকে দিতে চাইলে সরকারের শিক্ষা সচিব সেটা নাকচ করে দেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে গৃহীত হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্পাদনে রসুল ও জিন্না জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন। স্বল্পায়ু জীবনের শেষ দিকে রসুল টিলকের হোমরুল আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হন।

রা ষ্ট্র চি ন্তা র প রি প্রে ক্ষি ত

রসুল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে চাইতেন সংসদীয় গণতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন। তিনি উপলব্ধি করেন যে এশিয়ার মানুষ ইউরোপীয়দের মতো স্বেচ্ছাতন্ত্রী সরকার আর মেনে নেবে না। ভারতের সমকালীন সরকারকে তিনি "benevolent despotism"-এর আখ্যা দিয়ে বলেন যে যদিও বিবর্তনের ধারায় একসময়ে হিতবাদী স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল অনিবার্য, কিন্তু আজ আর সে পরিস্থিতি নেই। ইংরেজরাই নাগরিকদের স্বাধিকার ও সুযোগসুবিধার মূল্যবোধ আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাই যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা সেটা আমরা ইংরেজদের কাছ থেকেই জেনেছি। তাই এশিয়াবাসীদের স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা নেই বলে যে বাঁধা বুলি আওড়ানো হয় সেটা আজ নিঃসার প্রমাণিত হয়েছে। বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক উইলিয়াম টমাস স্টেড-এর একটি উক্তির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে জাপান, চীন, পারস্য

ও তুরস্কে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় সরকার ক্রমে গড়ে উঠছে ; অনুরূপ শাসন-ব্যবস্থা ভারত ও মিশরে প্রবর্তন না করা যুক্তিহীন। বরিশালে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে (১৯০৬) রসুল সভাপতির ভাষণে ভারতে অবিলম্বে পর্যায়ক্রমে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি করেন।[৭]

দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক মানসিকতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে শিক্ষিত অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনকে তাচ্ছিল্য করেন, তাঁরাই আবার আন্দোলনে যোগ দেন যখন লাভের প্রাপ্তিযোগ ঘটে। অথচ অর্জিত যাবতীয় লাভের পিছনে থেকেছে বহু রাজনৈতিক কর্মীর নিঃস্বার্থ শ্রম ও আত্মত্যাগ। অনেকে আবার ব্যক্তিগত উন্নতির আশায় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন, আর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেলে সহকর্মীদের ছেড়ে চলে যান। এধরনের লোককে রসুল এড়িয়ে চলার উপদেশ দেন, তিনি মনে করতেন যে—

> to be successful in politics as in other spheres of life, one must be honest and sincere.[৮]

রাজনৈতিক আন্দোলনকে যারা ভয়ের চোখে দেখে ও বিপজ্জনক বলে মনে করে তাদের উদ্দেশে তিনি বরিশাল ভাষণে বলেছিলেন—"We cannot do without politics, our very existence depends upon politics." রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্জন না হলে দেশবাসীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জীবিকা ইত্যাদির উন্নয়নসাধন দুরূহ বলে তিনি মনে করতেন। তবে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন।[৯]

রসুলের দৃষ্টিতে মানুষের যাবতীয় অসন্তোষ ও ক্ষোভের মস্ত বড় কারণ হল বিচারব্যবস্থার বৈষম্য। বৈষম্যের কারণ হিসাবে তিনি দেখেছিলেন একই লোকের অধীনে প্রশাসন ও বিচারক্ষমতা ন্যস্ত, একই ব্যক্তি অভিযোগকারী, আবার বিচারকও বটে ; ফলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন। অন্যদেশে ব্যবস্থাটি নিন্দিত, অথচ ভারতে সেটা দিব্যি বহাল রয়েছে। বিচারব্যবস্থাকে প্রশাসন থেকে পৃথক করার জন্যে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার একটি প্রস্তাব রসুলের কুমিল্লা প্রাদেশিক সম্মেলনের (১৯১৪) ভাষণে পাওয়া যায়। সর্ববিধ প্রাদেশিক বিষয়ে শক্তিশালী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার উপযোগী সংগঠন হিসাবে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে রসুল নবোদ্যমে পুনর্গঠিত করারও একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।[১০]

ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থাকে রসুল সমর্থন করেন নি। কারণ তাতে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক প্রীতি ও একাত্মবোধ

বিঘ্নিত হবে বলে তাঁর আশঙ্কা ছিল। তবে সেইসঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে সংখ্যালঘুদের সর্বস্তরে প্রতিনিধিত্ব থাকাটা অবশ্যই প্রয়োজন।

মুসলমানদের উদ্দেশে রসুল তাঁর বরিশাল ভাষণে বলেন যে রাজনীতি থেকে নিজেদের দূরে রেখে তারা মস্ত ভুল করেছে। তাদের রাজনৈতিক অনাসক্তির জন্যে দায়ী বিগত দিনের মুসলমান নেতারা। সরকারের নেকনজর ও প্রসাদপ্রাপ্তির আশায় বিগত দিনের নেতারা মুসলিম জনমনে এই চিন্তা সঞ্চারিত করেছিলেন যে বিধিদত্ত ও ন্যায়সঙ্গত সরকারের পরিপন্থী রাজনীতি মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সরকার যা কিছু নির্দেশ দেয় তা মাথা পেতে মেনে নেওয়াই তাঁরা সমীচীন বলে মনে করতেন। কারণ তাঁদের চোখে সরকারের বিরুদ্ধাচারণের অর্থ ছিল সরকারি চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। তাই রসুল অনুতাপ করেন যে সাধারণ মুসলমান একটু বুদ্ধি খেলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলে নেতৃবর্গের ভ্রান্তি ও চিন্তার অসারতা ধরে ফেলতে পারত।[১১]

রসুল অদ্ব্যর্থ ভাষায় বলেন যে নেতৃবর্গ অথবা সরকার যাই বলুক না কেন হিন্দু ও মুসলমান মূলত অভিন্ন। জাতে কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে উভয়ে একই নৌকার যাত্রী। তাঁর মতে সরকারি চাকরির মোহে মুসলমান সমাজ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতায় বিমুখ থেকেছে, তাতে ক্ষতি বই লাভ কিছু হয় নি। কার্যত সরকার হিন্দু মেধা ও প্রতিভাকে তারিফ করে, আর মুসলমানদের ভীরুতাকে ঘৃণার চোখে দেখে, কাজে লাগায় তাদের ভেদবুদ্ধিকে। পরিতাপের সঙ্গে রসুল মন্তব্য করেন যে সরকার লাভের দিকটা তুলে ধরে মুসলমানদের নাচায়, ক্ষতির দিকটা দেখায় না।

সদ্যসম্পন্ন বঙ্গ-বিভাগ প্রসঙ্গে রসুল মন্তব্য করেন যে তাতে সামান্য কিছু লাভ হতে পারে, কিন্তু পরিণামে মুসলিম সমাজ প্রতারিত হবে। রসুল দেখাতে চেষ্টা করেন যে মুসলিম জনগণ যদি নেতাদের আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না করে স্বাধীন বুদ্ধির প্রয়োগ করে তাহলে তারা দেখবে যে স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদেরই লাভ হয়েছে বেশি। নজির হিসাবে রসুল দেখান যে স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমান তাঁতি বেশি উপকৃত হয়েছে। শিক্ষায় অনুন্নত থাকায় মুসলমানদের কায়িক শ্রম ও স্বাধীন জীবিকার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই বলে তিনি মনে করতেন। কিন্তু নেতাদের দৃষ্টিবিভ্রমের জন্যে সাধারণ মুসলমান চলেছে বিপথে। রসুল তাই মুসলিম সমাজের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন যে একই মাতৃভূমির কল্যাণের জন্যে মুসলমানদের উচিত রাজনীতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য পরিহার করে হিন্দুদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। তাঁর কথায়—

Unless you are ready to migrate in a body to Arabia,

Persia or Turkey, your political interests will ever be the same as those of the people of other denominations in Bengal.[১২]

উল্লিখিত আবেদনে রস্‌ুল এই মর্মে বলেন যে আমরা আজ হিন্দ্‌ুদের থেকে প্‌ৃথক হয়ে বিদেশী শাসকদের পথ সুগম করে দিচ্ছি, যাতে তারা আমাদের অনৈক্যের স্‌ুযোগ নিয়ে এদেশে তাদের শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখতে পারে।

রস্‌ুল তাঁর বিখ্যাত রাজাবাজার ভাষণে ইতিহাসের নজির টেনে য্‌ুক্তিপ্রদর্শন করেন যে ইংল্যান্ডে কোনো রাজনৈতিক বিষয় যেমন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিতে আলোচিত হয় না, এদেশেও তেমনি কোনো রাজনৈতিক বিষয়ের পক্ষাপক্ষে লোকে যোগ দেবে নাগরিক হিসাবে, ধর্মীয় সম্প্রদায়ভিত্তিতে নয়। ইংল্যান্ডে একসময়ে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের পারস্পরিক সম্পর্ক এদেশের হিন্দ্‌ু-ম্‌ুসলিম বিরোধবিদ্বেষের চেয়েও বেশি তিক্ত ছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের সে-পরিস্থিতি আজ আর নেই, তাদের শ্‌ুভব্‌ুদ্ধি এখন প্রবল। সেই নিরিখে রস্‌ুল প্রশ্ন তোলেন: আমরা হিন্দ্‌ু-ম্‌ুসলমানেরা কেন অন্‌ুর্‌ূপ ঐক্যবদ্ধ হতে পারছি না? উত্তরে নিজেই নির্দেশ করেন যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকতে পারে, কর্মপন্থাও ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মাতৃভ্‌ূমির কল্যাণের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।[১৩]

রস্‌ুল লক্ষ করেছিলেন যে বঙ্গের তৎকালীন ইসলামধর্মী বাঙালিরা নিজেদের বাঙালি বলে মনে করে না। তারা বাঙালি হিসাবে দেখে কেবল হিন্দ্‌ুদের আর নিজেদের তারা কেবল ম্‌ুসলমান বলে পরিচয় দেয়। তিনি বলেন যে এই মনোভাব নিঃসন্দেহে অজ্ঞতাপ্রস্‌ূত। কারণ বাঙালি ম্‌ুসলমানেরা যে-মাটিতে ভ্‌ূমিষ্ঠ ও লালিত হয়েছে সেদিকে দ্‌ৃক্‌পাত না করে তারা কেবল ধর্মটাকেই বড় করে দেখেছে। তারা যে দেশেই জন্মাক বা যে-ভাষাতেই কথা বল্‌ুক না কেন তারা মনে করে যে দ্‌ুনিয়ার ম্‌ুসলমানেরা হল একটা "নেশন", রস্‌ুলের দ্‌ৃষ্টিতে সেটা বাতুলতামাত্র। কেন-না তাহলে একজন ইংরেজ অন্য এক ফরাসি মান্‌ুষকে স্বজাতিভুক্ত বলে মনে করতে পারে, যেহেতু উভয়েই খ্‌ৃষ্টান। রাজাবাজার ভাষণে রস্‌ুল তাই স্পষ্টই বলেন—

We both Hindus and Mohamedans here belong to the same mother-country Bengal. We are all Bengalees, though our different religions make us Hindu, Mahomedan or Christian.[১৪]

বঙ্গবিভাগ রদ হয়ে যাবার পরে ১৯১২ সালে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে রস্‌ুল উল্লেখ করেন যে বছর ছয়েকের জন্যে বঙ্গব্যবচ্ছেদের দর্‌ুন একদিকে হিন্দ্‌ু ও ম্‌ুসলমানের মধ্যে একটি স্থায়ী বৈরিতার

ভাব দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে লাভের পরিবর্তে সমূহ ক্ষতি হয়েছে মুসলমান সমাজের। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান একই নেশনের অন্তর্গত। সিয়া-সুন্নি, ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট ও এমন কি ভাইয়ে-ভাইয়ে যেমন ঝগড়াবিবাদ বাধে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেও অনুরূপ বিবাদ-বিরোধ অস্বাভাবিক নয়। দুতরফেই বিরোধ বাঁধানোর অপকর্মে কিছু মানুষ লিপ্ত থাকে, যাদের রসুল "narodlike outsiders" বলে অভিহিত করেন। তবে হিন্দুরা যেহেতু সবদিক থেকে উন্নত, তাই তাদেরই উপর বর্তায় ভ্রাতৃপ্রতিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের মুখ্য দায়িত্ব।[১৫]

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের কুমিল্লা অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে রসুল তাঁর পূর্বকথিত বক্তব্যের জের টেনে বলেন যে মুসলমান নেতারা স্বধর্মীয়দের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে প্রতিনিবৃত্ত না করলে, যথাসময়ে রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার সুযোগ পেত মুসলমান সমাজ; তাতে আদর্শ ও পদ্ধতিগত দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদাভেদ থাকত না। মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়তা ঘোচাবার জন্যে মুসলিম লীগের সৃষ্টি হয়েছে। রসুলের দৃষ্টিতে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, যেটা পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সহজেই দূর করা যেত।

আর্থনীতিক চিন্তা

রসুলের বরিশাল ভাষণে তাঁর আর্থনীতিক চিন্তার গভীরতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে দেশের ভালমন্দ বিচারের মৌরসিস্বত্ব বিদেশী শাসকদের মুঠোয় থাকতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ এগোবে কি পেছোবে সেটা দেশবাসীরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পারে। অর্থাৎ কোনু জিনিস ব্যবহার করা হবে কি হবে না সেটা নির্ধারণের অধিকার দেশবাসীর একান্তই নিজস্ব। তাঁর স্থিরপ্রত্যয় ছিল যে দেশকে সেবা করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ হল দেশের মৃতপ্রায় শিল্পবাণিজ্যকে চাঙ্গা করে তোলা এবং সেইসঙ্গে যেসব ব্যবসাবাণিজ্যের হাল সাবলীল সেগুলিকে আরও গতিশীল করে তোলা, যাতে নতুন নতুন শিল্প ও কাজকারবার গড়ে তুলে বিদেশী পণ্যের ব্যবহার বর্জন করা যায়। এই কর্মপদ্ধতিকে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সারবত্তা হিসাবে উপস্থাপিত করে বলেন—"Its primary object is to promote the industrial development of the country."[১৬]

শিল্পে দেশের পশ্চাৎপদতার কারণ দর্শিয়ে রসুল বলেন যে ভারতের

সুতিবস্ত্র একসময়ে বিদেশে বিপুল পরিমাণে রপ্তানী করা হত; ভারতের মসলিন বস্ত্র পরিধান ইউরোপে একদিন গর্বের বিষয় ছিল। কিন্তু নিজেদের উদাসীন অবহেলায় আমরা সেসব ঐতিহ্য হারিয়েছি। কারণ নব্যশিক্ষায় বিলাতি সামগ্রীর প্রতি আমাদের মোহ দেশের নিজস্ব শিল্পকে বাজার থেকে হটিয়ে বিদেশী পণ্যের চাহিদা ও আমদানিকে বাড়িয়ে তুলেছে।[১৭]

রসুল লক্ষ করেন যে দেশের লোক তাদের ভুল যখন বুঝতে পারে, স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা তখন ক্রমেই বাড়তে শুরু করে। উদ্দেশ্য স্বদেশী শিল্পের উন্নতি। বিদেশী সরকার নিজেদের স্বার্থহানিতে ভারতের স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যকে বিষনজরে দেখছে। তিনি অনুতাপ করেন যে ইংরেজরা নিজেদের দেশে উদারনৈতিক রীতিনীতি অক্ষুণ্ন রেখে এদেশে রাজনৈতিক বিরোধিতাকে বেআইনী বলে আদেশ জারি করছে, যাতে বিলাতের বাণিজ্যিক উন্নতি অব্যাহত থাকে। তাঁর মতে যেহেতু আইনের সাহায্যে আমরা বিদেশী পণ্যের আমদানি রুখতে অক্ষম, অতএব বয়কটই আমাদের আত্মরক্ষার মোক্ষম হাতিয়ার। তাতে একদিকে দেশের শিল্পবাণিজ্য গড়ে উঠবে, অন্যদিকে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে।[১৮]

দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের তাগিদে রসুল স্বদেশী আন্দোলনকে একটি জরুরি বিষয় হিসাবে দেখার সুপারিশ করেন। তাঁর কথায়—"Our daily bread is dependent upon the Swadeshi movement." তিনি শঙ্কিতচিত্তে লক্ষ করেন যে ভাবাবেগে চালিত বাঙালিদের কাছে বঙ্গবিভাগ রদ হয়ে যাবার পরে স্বদেশী আন্দোলনের দীর্ঘসূত্রী ও নিরুত্তাপ গঠনমূলক কাজে আর লোকের তেমন উৎসাহ নেই। তাই তিনি মন্তব্য করেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে লোকের আর্থিক জীবনের প্রশ্নকে পৃথকভাবে দেখলে মস্ত ভুল হবে। বিদেশী পণ্যের উপর নির্ভর করে কোনো জাতি বড় হতে পারে না। বঙ্গবিভাগের ছ'বছরে উদ্দীপিত বাঙালিরা স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের যে প্রসার ঘটিয়েছে তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যে তিনি বিশেষ আবেদন রাখেন।

রসুল প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে শিক্ষিত বাঙালি সরকারি চাকরির মোহে সদাই আচ্ছন্ন। আর এই লালসাই বাঙালির আর্থিক দুর্গতির সবচেয়ে বড় কারণ। অথচ দেশের অন্যান্য প্রদেশে লোকের শিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্যম থাকায় তারা উন্নতির পথে স্বচ্ছন্দ গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে। তিনি অনুশোচনা করেন যে স্বজনপোষণের কৌশল ও প্রভাব খাটিয়ে বাঙালি আজ কেরানীর জাতে পর্যবসিত।[১৯]

দেশের প্রয়োজন ও প্রকৃত সমস্যার দিকে তাকিয়ে রসুল চাইতেন উচ্চশিক্ষায় অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্যের পরিবর্তে প্রাথমিক শিক্ষায় যথোচিত পরিমাণ ব্যয়বরাদ্দ। তিনি দেখেছিলেন যে উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরাই কেবল শিক্ষার যাবতীয় সুবিধা ভোগ করে। তাঁর চট্টগ্রাম ভাষণে তিনি সখেদে বলেছিলেন—

> ...it is neither wise, nor fair, nor just to spend a large amount of public money for the education of the favoured few, especially when the mass of the people are denied the blessings of elementary education.

তিনি তাই নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার খাতে অধিক সরকারি অনুদান বরাদ্দের দাবি করেন।[২০]

কেন্দ্রীয় আইন সভায় গোপালকৃষ্ণ গোখলের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত খসড়া বিলের (১৯১১) কথা উল্লেখ করে রসুল বলেন যে, মৌখিক সহানুভূতির উচ্ছ্বাস দেখিয়ে সরকার অর্থাভাবের অজুহাতে বিলটিকে নাকচ করে দেয়। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, এই যুক্তিতে যে পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা তা চাইছে। রসুল মনে করতেন যে দারিদ্র্যের ফলে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের পক্ষে এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ সম্ভব নয়। মুসলমানদের নাম করে একটি ব্যয়বহুল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন রসুলের দৃষ্টিতে ছিল অর্থহীন এবং শৌখীন বিলাসের নামান্তরমাত্র।

যে-টাকায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে থাকে তাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লোকের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন অধিক ও জরুরি বলে রসুল তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। পরিণামে তাতে বেকার সমস্যার সুরাহা হবে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কুমিল্লা প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করতেন যে—

> ...illiteracy and ignorance go hand in hand with fanaticism and are always dangerous to State[২১]

প্রাদেশিক সম্মেলনের চট্টগ্রাম অধিবেশনে (১৯১২) দ্বিতীয়বার সভাপতির ভাষণে রসুল উল্লেখ করেন যে ভারতের মতো পৃথিবীর আর কোথাও এত কৃষিনির্ভর মানুষ নেই, অথচ এদেশে কৃষি সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত; ভূমির উর্বরতা সত্ত্বেও খরা ও দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মরে। সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসুল তাই সুপারিশ করেন

যে শিল্পোন্নয়নকে অক্ষুণ্ন রেখে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষির উন্নয়ন যাতে হয় সে-বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হোক। তিনি অনুভব করেন যে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জমিতে কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সমীচীন। তাছাড়া সরকারি কৃষি গবেষণাগারে লব্ধ ফল ও তথ্যাদি কৃষকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা চাই।[২২]

কুমিল্লা অধিবেশনে (১৯১৪) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে রসুলের ভাষণে কিছু নতুন উপলব্ধি লক্ষ করা যায়। তিনি স্বীকার করেন যে ভারতীয় কৃষকদের পুরুষ পরম্পরায় গঠিত অভ্যস্ত জীবন থেকে মান্ধাতা আমলের কর্মপদ্ধতি ছাড়ানো সহজ নয়। তবুও সরকারের উচিত যেখানে সম্ভব সেখানে কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখানো। অবশ্য লোকেরও পুরোপুরি সরকারি উদ্যমের ভরসায় থাকলে চলবে না। রসুল চাইতেন শিক্ষিত যুবকেরা কৃষিকর্মে প্রবেশ করুক, তাতে কর্মসংস্থান ও কৃষির উন্নয়ন একযোগে সহজ হবে।

স্বদেশী আন্দোলনের গোড়া থেকেই রসুল অনুভব করতেন যে শিক্ষার সর্বব্যাপী বিস্তারের উপর জাতীয় আন্দোলনের সার্থকতা নির্ভর করে। তাই তিনি বলেন যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে একদিকে মানবিক বিদ্যার প্রসার এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ হলে লোকের দেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার মনোবৃত্তি বিকশিত হয়ে উঠবে। লোকের মনে স্বদেশী ভাবাদর্শ সঞ্চারের উপযোগী যে প্রয়াস ও প্রচারের অভিযান চলেছে, তার আর তত প্রয়োজন হবে না যখন লোকে শিক্ষার আলোকে দেশের হীনাবস্থা ও দুর্গতি উপলব্ধি করবে।

বঙ্গবিভাগ রদ হয়ে যাবার বছর দুয়েক পরে রসুলের কুমিল্লা ভাষণে উল্লিখিত মনোভঙ্গিসূত্রে নতুন অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন যে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রসারসূত্রে দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বেড়েছে। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলনে ভাঁটার টান পড়েছে বঙ্গবিভাগ রদ হয়ে যাবার ফলে। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল যে স্বদেশী আন্দোলন নতুন উদ্যমে পরিচালিত না হলে স্বদেশী শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হবে। কারিগরি শিক্ষার প্রতিও লোকের আকর্ষণ কমে যাবে। স্বদেশী আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ায় রসুল আক্ষেপ করেন।[২৩]

উপসংহার

কি চিন্তায়, কি আন্দোলনে, সংকীর্ণ সাজাত্যবোধ ও ধর্মীয় বিভেদে আধুনিক ভারতীয় রাজনীতি গোড়া থেকেই আবিল থেকেছে। সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাজনৈতিক ভাষ্যকার ও নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের মানসিকতায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিবাদ সুপরিসর স্থান পায় নি। আবদুল রসুল ছিলেন মুষ্টিমেয় সেইসব নেতৃবর্গের অন্যতম, যাঁরা বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজনীতিকে কথায় ও কাজে যুক্তিবহ ও সর্ববিধ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখতে প্রয়াসী হন। রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগকে টেনে আনাতো দূরের কথা, সাধারণ লোকের, বিশেষ করে সমকালীন মুসলিম মানসে ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি ও অনৈক্যের বিরুদ্ধে তিনি নিরন্তর মুখর থাকতেন। সেদিক থেকে তাঁর দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও নির্ভীক মনোভাবের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সমসাময়িক মুসলমান সমাজের বৃহদাংশের ভিন্ন গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারায় স্বভাবতই তিনি তাদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হন। সেজন্যে কিন্তু তিনি কারো প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন না। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাকামী ধারার জনক আলিগড়ের সার সৈয়দ আহমদের প্রতিও তিনি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে সুশোভন সম্মান প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হতেন না।

সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী তথা সমকালীন মডারেট রাজনীতির সমর্থক হিসাবে পরিচিত হলেও রসুল কার্যবিশেষে চরমপন্থীদের সংগে হাত মেলাতে দ্বিধাবোধ করতেন না। স্বল্পায়ু জীবনের শেষদিকে তিনি টিলকের হোমরুল আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তবে নিয়মানুগ আন্দোলনেই তিনি বিশ্বাস করতেন। স্বায়ত্তশাসনের পথে তিনি চাইতেন সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন। বিচারব্যবস্থা ও সরকারি প্রশাসনের পৃথকীকরণের দাবি তাঁর কণ্ঠে নিয়তই ধ্বনিত হত।

ইংল্যান্ডের গণতন্ত্রী পরিবেশে শিক্ষিত রসুল জেনেছিলেন যে রাজনৈতিক আন্দোলন করা নাগরিকমাত্রেরই একটি মৌলিক অধিকার। তাই রাজনীতি সম্পর্কে স্বদেশবাসীর ভীতি কাটিয়ে তুলতে তিনি তৎপর হন। তিনি যথার্থই বুঝতেন যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই নানাবিধ অভাবঅভিযোগের প্রতিকার হয় এবং সরকারের কাছ থেকে ন্যায্য সুবিধাদি আদায় করা একমাত্র সেই পথেই সম্ভব। তবে রাজনৈতিক আন্দোলনকে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থের পথ হিসাবে কেউ যাতে সেটাকে ব্যবহার না করে সেবিষয়ে তাঁর সেদিনের সতর্কবাণী আজও মূল্যবান।

রাজনৈতিক আন্দোলনে নিস্পৃহ মনোভাবের দরুন মুসলিম সমাজ পেছিয়ে যায় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। সেজন্যে তিনি বিগতকালের মুসলিম নেতাদের দায়ী করেন। সমকালীন মুসলিম মানসে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও বিভেদনীতির

সমালোচনা করে তিনি বলেন যে পরিণামে উক্ত মানসিকতা তাদের পক্ষে সবিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ভারতভূমি বিভাগের পরে যেন বেশি অনুভব করা যায়। স্বধর্মীয়দের উদ্দেশে তাঁর সুস্পষ্ট উপদেশ ছিল যে একই দেশের অধিবাসী হবার ফলে মুসলমানদের উচিত হিন্দুদের সংগে ঐক্য ও সৌহার্দ্য বজায় রাখা। নইলে বিভেদের সুযোগে বিদেশী শাসকদের শোষণব্যবস্থা কায়েম হয়ে থাকবে। হিন্দুদের কাছেও তাঁর প্রত্যাশা ছিল তারা যেন অনুন্নত মুসলমান সমাজের প্রতি প্রীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল হয়। উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আবেদন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

রসুল ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর আইনের বিরোধিতা করেছিলেন। দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে তিনি ইংল্যাণ্ডের মধ্যযুগীয় ধর্মবিরোধের সংগে তুলনা করেন। তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিককালে উন্নত চিন্তা-ভাবনা ও নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব ঘটায় ধর্মীয় বিরোধ অর্থহীন। মানুষের পারস্পরিক বিবাদবিসংবাদ নানা কারণে ঘটতে পারে, কিন্তু সেটাকে ধর্মীয় ব্যঞ্জনা দেওয়া অনুচিত। বঙ্গবিভাগের পরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রসুল এক মানসিক ব্যবধান লক্ষ করেন। তাতে মুসলমানদেরই বেশি ক্ষতি হয় বলে তাঁর ধারণা ছিল। মুসলিম লীগ সৃষ্টির পিছনে যথার্থ কোনো কারণ তিনি খুঁজে পান নি। তবে লীগের বিরুদ্ধে তাঁর পালটা দল গড়ে তোলার উদাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অর্থনৈতিক চিন্তায় রসুলের বাস্তব দৃষ্টি ও গভীরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরেজকে জব্দ করা শক্ত, কিন্তু ইংরেজের পণ্য ব্যবহার না করে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করলে একদিকে ইংরেজের অর্থনৈতিক শোষণকে প্রত্যাহত করা যাবে এবং অন্যদিকে দেশের কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির সংগে বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় হবে বলে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। বংগভংগ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশী শিল্পের প্রসার ও বয়কট আন্দোলনের ফলে দেশের দ্বিমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাব্য উজ্জ্বল দিকটিকে তিনি তুলে ধরেন। তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতা করলেও তার সুফল বর্তেছে মুসলমান তাঁতি ও চাষীদের উপর। রসুল আক্ষেপ করেন যে শিল্পবাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুমুসলিম নির্বিশেষে বাঙালিরা চাকরির মোহে আচ্ছন্ন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে উচ্চশিক্ষার পিছনে বিপুল অর্থব্যয় রসুলের চোখে বিসদৃশ ঠেকে। বস্তুত দেশবাসীর বৃহদাংশ যেখানে ন্যূনতম শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সেখানে উচ্চশিক্ষার খাতে মোটা ব্যয়বরাদ্দ গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকেই পঙ্গু করে রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসূত্রে সেদিন

রসুল যেকথা উপলব্ধি করেছিলেন সেকথা আজও বিবেচনার দাবি রাখে। রসুল যথার্থই বুঝেছিলেন যে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা যুক্তিহীন অন্ধ আবেগপ্রবণতার উৎস এবং পরিণামে সেটা রাষ্ট্রের পক্ষেও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন প্রসঙ্গে রসুল অনুভব করেন যে দেশ কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও এদেশে কৃষিকর্মের আধুনিকীকরণের চিন্তা উপেক্ষিত। দেশের মাটি উর্বর, তবুও লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মরে। কৃষির উন্নয়নের জন্যে তিনি ব্যাপক কৃষিশিক্ষার সুপারিশ করেন। তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব হল শিক্ষার প্রাথমিক স্তরেই তিনি চেয়েছিলেন কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা। অনুরূপ দৃষ্টিতে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কেও তিনি যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব তোলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে মানবিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার পরিণামে দেশবাসীর শিল্পবাণিজ্যের উদ্যম ও দেশপ্রেমকে উৎসাহিত করবে বলে তাঁর বিশেষ আশা ছিল। সেজন্যে তিনি চেয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনকে অব্যাহত রাখতে। কিন্তু জীবদ্দশাতেই তিনি দেখে যান যে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে যাবার পরে বয়কট আন্দোলন তথা স্বদেশী শিল্পের উদ্যোগ এবং কারিগরি শিক্ষার প্রতিও লোকের আগ্রহে ভাঁটা পড়েছে।

রসুলের জীবন ও সাধনার বৃত্তান্ত সহজলভ্য নয়। সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষণ থেকে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার সন্ধান পাওয়া যায় বেশি। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে প্রকাশিত 'মুসলমান' পত্রিকার মালিকানায় তিনি একজন অংশীদার ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় তাঁর নিবন্ধাদি প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সে-পত্রিকা দুষ্প্রাপ্য। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াও শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর বিদ্যাবত্তা, বাস্তবদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার সঙ্গতি আজও আছে যথেষ্ট। যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেটা এখনও অনুকরণীয়।

উৎস নির্দেশ

১. অমলেন্দু দে। 'বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ'। ১৯৭৪। পৃ. ১৬৬-৭, ২০৭।

২. Sumit Sarkar. *The Swadeshi Movement in Bengal: 1903-1908.* New Delhi, 1977. p. 79.

৩. ধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার। 'ভারতের স্বরাজ সাধক'। খ. ১। পৃ. ১১০। *Indian Nation Builders.* Madras. part I. p. 378.

৪. *Amrita Bazar Patrika.* 25 October, 1905.

৫. কৃষ্ণকুমার মিত্র। 'আত্মচরিত'। ১৯৩৭। পৃ. ২৭২-৩।
৬. Sarkar. *op. cit.* pp. 429-30, 440.
৭. *Bengalee.* 7 April, 1912.
৮. *Ibid.*
৯. *Ibid.*
১০. *Bengalee.* 12 April, 1914.
Amrita Bazar Patrika. 12 April, 1914.
১১. Yatindrakumar Ghosh. (Comp.) *Bengal Provincial Conference ; 1906 : Barisal Session.* 1978. p. 61.
১২. *Ibid.* p. 66.
১৩. *New India.* 30 September, 1905. p. 524.
১৪. S. C. Roy. *The Story of my Times.* 1934. p. 148.
১৫. *Bengalee.* 7 April, 1912.
১৬. *Bengalee.* 12 April, 1914.
১৭. Ghosh. *op. cit.* p. 47.
১৮. *Ibid.* p. 53.
১৯. *Ibid.* p. 58.
২০. *Bengalee.* 7 April, 1912.
২১. *Bengalee.* 12 April, 1914.
২২. *Ibid.*
২৩. Ghosh. *op cit.* pp. 53-58.

নির্ঘণ্ট

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র